দরবেশ দরবার

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রী দরবেশজী শতবার্ষিকী উপলক্ষে

দেবী সরোজবালা শতবার্ষিকী কমিটির নিবেদন

প্রথম প্রকাশ : অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৭ সাল

প্রকাশক : শ্রীনির্মলেন্দু সেন।
সভাপতি—দেবী সরোজবালা শতবার্ষিকী কমিটি।
৫৭, ডাঃ নীলমণি সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫০

স্বত্বাধিকারী : শ্রীনির্মলেন্দু সেন।

মুদ্রাকর : শ্রীযুগলকিশোর রায়, শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

নিবেদন

ভূমিকাতে 'সংগ্রাহক' দরবেশ দরবার রচনার কাহিনী বিবৃত করেছেন —আমরা জানাচ্ছি গ্রন্থ-প্রকাশের কাহিনী। [illegible] সালে "দরবেশ দর্শন" প্রকাশিত হওয়ার পর কলকাতার বিভিন্ন গোঁসাইগণ-সম্মেলনীতে যখন দরবেশ দরবার বিভিন্ন কিস্তিতে পঠিত হচ্ছিল তখন প্রায় সকলে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন।

ইতিমধ্যে "দেবী সরোজবালা শতবার্ষিকী কমিটি" গঠিত হওয়ার পর সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত গোঁসাইগণ সম্মেলনীতে দরবেশ দরবারের লেখকের নিকট এই গ্রন্থ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করার জন্য আবেদন জানাই।

এরপর 'দরবেশজী শতবার্ষিকী কমিটির' সম্পাদক শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, যাঁর দরবেশ দরবার প্রকাশ করার কথা ছিল, তিনি আমাদের আগ্রহ দেখে এই বই প্রকাশ করার সুযোগ আমাদের দেন ও সংগ্রাহকও তাঁর পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করে আমাদের হাতে সমর্পণ করেন।

একজন স্বাভাবিক মানুষ হয়েও সদগুরুর আশ্রয় পেয়ে এবং এই সাধনপন্থায় চলে কী ভাবে দরবেশজী নিজেও বহু তৃষিত আত্মার দিশারী হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন তাই লেখক এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন। আর সদগুরু দরবেশজীর আসল পরিচয়ই হল তিনি সদগুরু সাধন ধারার মূর্তিমান বিগ্রহ। সংগ্রাহক তাঁর বইতে এই তত্ত্বটিই বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। কাজে কাজেই দরবেশ দরবারকে আমরা সদগুরু সাধনের টীকা বলেও পরিচয় দিতে পারি।

এই মহামূল্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আজ আমরা গর্বিত। খুব শীঘ্রই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে বলে আমরা আশা করি। যাঁদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আর্থিক সহায়তায় আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারলাম তাঁদের সকলের কাছেই আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীশ্রীদরবেশজী ও শ্রীশ্রীমা নিত্য জয়যুক্ত হউন।

কাশীনাথ সিংহ
সম্পাদক
দেবী সরোজবালা শতবার্ষিকী কমিটি

৫৭, ডাঃ নীলমণি সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫০

ভূমিকা

স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশজীর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে যাঁর সঙ্গে জীবনে আমার প্রথম পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে তিনি স্বর্গত নরেশ চন্দ্র সেন। নরেশের ব্রহ্মচারী বেশ, তাঁর সদাচার সম্মত আহার বিহার এবং সর্বোপরি তাঁর সাধন চেষ্টা ও গুরুনিষ্ঠা তাঁর গুরুদেব দরবেশজীর প্রতি আমাকে বাল্যেই কৌতুহলী করে তোলে।

যৌবনের প্রারম্ভে কলকাতায় এসে এই নরেশেরই সান্নিধ্যে থাকার ফলে ক্রমে ক্রমে কলকাতা-বাসী দরবেশজীর অনেক শিষ্যের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়। কেন জানি না, আমার সেই অল্প বয়স ও চাপল্য সত্বেও তাঁরা প্রথম থেকেই আমাকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখে তাঁদের দুর্লভ সঙ্গের অংশীদার করে নেন। দরবেশজীর শিষ্য-শিষ্যাদের বিস্ময়কর গুরু-প্রেম এবং দরবেশজীর বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনায় তাঁদের তন্ময়তা আমাকে মুগ্ধ করে ফেলে। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও আমার প্রতি তাঁদের অকৃপণ ও অকপট স্নেহের প্রভাবে ক্রমশ আমি তাঁদের ভালবাসতে শিখলাম। তাঁদের মুখে দরবেশজীর জীবনের ও আচরণের নানা কাহিনী শুনে শুনে আমিও যেন দরবেশজীর প্রতি আকৃষ্ট হলাম।

সাত বছর কলকাতা কাটিয়ে চাকুরীর সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলায় আমায় প্রায় বারো বছর ঘুরে বেড়াতে হয়। তখন দরবেশজীর প্রসঙ্গে আমার এমন নেশা দাঁড়িয়ে গেছে যে যেখানেই গিয়েছি বা থেকেছি সেখানেই কখনো খোঁজ খবর করে কখনো বা অযাচিত ভাবে দরবেশজীর নতুন নতুন শিষ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমার কলকাতায় সংগৃহীত দরবেশজীর বিচিত্র লীলা কাহিনী যেমন এঁদের শোনাতাম, এঁদের কাছ থেকে তেমনি নতুন নতুন কথা ও

কাহিনীতে আমার স্মৃতির ভাঁড়ার ভরে উঠতে লাগল। পিছনে ফেলে আসা বছরগুলির কথা স্মরণ করে আজ আমার সেই অভাবনীয় সৌভাগ্য নিজের কাছেই আশ্চর্য মনে হয়।

দরবেশজীর শিষ্য-শিষ্যাদের ভালবাসতে শিখে একদিন দেখি দরবেশজীকেও যেন আমি ভালবাসতে শুরু করেছি। তখন থেকে দরবেশজীর নিজের রচনা এবং তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশিত যে অল্প স্বল্প প্রবন্ধ বা আলোচনা রয়েছে সেই সব পড়তে আরম্ভ করি। চাকুরীর গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরতে ঘুরতে আবার যখন প্রায় স্থায়ী ভাবে কলকাতা ফিরে এলাম তখন আমি প্রায় কথক ঠাকুরের ভূমিকায় আসরে নেমে গেছি। দরবেশজীর শিষ্য-শিষ্যা ও অনুরাগীদের কাছে দরবেশজীর গল্প ও তাঁর মাহাত্ম্য আলোচনা করা আমার কাছে যেমন উপাদেয় বোধ হত, তাঁদের সস্নেহ প্রশ্রয়-ও আমায় সাহস যোগাত। কয়েক বছর আগে শ্রীশ্রীদরবেশজী শতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয় এবং ঐ কমিটির সম্পাদক শ্রীশিশিব সেনগুপ্তের সুপারিশ অনুসারে কমিটির সভাপতি শ্রীঅম্বুজাক্ষ ঘোষ আমাকে দরবেশজী সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য প্ররোচিত করেন। এই উৎসাহ দানের ফলেই বর্তমান গ্রন্থের রচনা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে শতবার্ষিকী কমিটি 'দরবেশ দর্শন' নামে দরবেশজীর যে পত্র সংকলন প্রকাশ করেছেন, সে গ্রন্থ আমার কাজ অনেক সহজ করে তোলে।

কোন পরিকল্পনা বা বাঁধা ছক তৈরী করে নিয়ে আমি লেখা শুরু করিনি। দরবেশজীর জীবনের এক একটা ঘটনা বা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে যে সমস্ত সংশয় বা প্রশ্ন আমার সামনে এসেছে তার সমাধান খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় অজ্ঞাতসারে বা কখনো অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে গোঁসাইজী প্রবর্তিত ও দরবেশজী কথিত সাধন-প্রণালী ও সাধন তত্ত্বের মুখোমুখি হতে হয়েছে। গ্রন্থ রচনা শুরু করার আগে কখনোই আমার এ ধরণের অনধিকার চর্চা করার প্রবৃত্তি ছিল না। অথচ ক্রমশ আমার একটা ধারণা হয়ে গেল যে দরবেশজীর

জীবন জানতে হলে বা বুঝতে হলে ঐ সব তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ অপরিহার্য। আমার প্রাথমিক সঙ্কোচ তাই দুঃসাহসে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

আমি তত্ত্বজ্ঞানী বা তত্ত্বদর্শী নই। নিজেকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলতেও আমার বাধে কারণ তত্ত্বের চাইতে তথ্যই আমাকে আকৃষ্ট করে বেশি। তাই শুরুতেই বলে নেওয়া ভাল যে নিছক বিচার ও মহাজন বাক্যের সাহায্যে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত এ বইতে করা হয়েছে তাকে অবশ্য-গ্রাহ্য বলে ভাবার কোন কারণ নেই। কোন কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত কারোর সহজ সংস্কারে আঘাত দিয়ে যদি তাঁর মর্মপীড়ার কারণ ঘটায় তবে তিনি যেন দরবেশজীর মহিমার অযোগ্য এই কথককে ক্ষমা করেন।

এই বইয়ে প্রসঙ্গক্রমে বহু গ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরাগী পাঠকদের প্রতি পদে হোঁচট খেতে না হয় এ জন্য প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাদ-টীকায় উৎস গ্রন্থের উল্লেখ ইচ্ছে করেই করা হয়নি। ব্যবহৃত সমস্ত গ্রন্থের একটি তালিকা বইয়ের শেষে দেয়া হয়েছে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতির যথাযথ সূত্র একটি পৃথক নির্দেশিকায় উল্লিখিত হয়েছে। কৌতুহলী ও আগ্রহবান পাঠকদের এতে খুব অসুবিধা হবে না বলেই মনে হয়।

দীর্ঘ ক'বছর ধরে বইটির লেখা যেমন এগিয়েছে তেমনি কলকাতায় দরবেশজীর অনুরাগীদের বিভিন্ন আসরে তা পাঠ করে শোনানোর সুযোগ হয়েছে। এই সমস্ত ভক্ত শ্রোতাদের নিরবিচ্ছিন্ন উৎসাহ না পেলে আলস্য ও জড়তা কাটিয়ে উঠে এ বই আমার পক্ষে শেষ পর্যন্ত লিখে ফেলা সম্ভব হত না—এ কথা আমি মনে প্রাণে জানি। এই শ্রোতৃ মণ্ডলীকে সহস্র-প্রণাম জানাই।

'দরবেশ দর্শনের' সংকলকের মত আমিও এ বইয়ের লেখক হিসাবে নিজেকে উহ্য রাখাই সাব্যস্ত করলাম। দরবেশজীর লীলা আস্বাদনই যেখানে লক্ষ্য—লিপিকারের পরিচয় সেখানে নিতান্ত গৌণ ব্যাপার। ভোজের উপকরণ যদি তৃপ্তিকর হয় তবে পরিবেশনকারীর

পরিচয় জানার প্রয়োজন থাকে না বললেই চলে। তবে পরিবেশনের ত্রুটির জন্য পরিবেশকের খোঁজ পড়তে পারে তিরস্কারের জন্য, কিন্তু দরবেশজীর অনুরাগী ভক্তেরা ক্ষমাশীল জেনেই আত্মগোপনে আমার কোন দ্বিধা নেই।

আর একটি কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন আছে। আমার স্মৃতি থেকে যে সব ঘটনার কথা বই-এ লিখেছি তার বক্তাগণ কোথাও কোথাও তাঁদের বর্ণনা ও আমার লেখার মধ্যে হেরফের দেখতে পারেন। শোনা কথা লিখতে গেলে এ ধরণের তারতম্য খুবই স্বাভাবিক। তবে একই ঘটনার বর্ণনা দ্বিতীয়বার মুখে প্রকাশ করতে গিয়ে বক্তা নিজেও খুঁটিনাটি ব্যাপারে গোলমাল করে ফেলেন, এ তো হামেশাই লক্ষ করেছি। সুতরাং স্মৃতি সকলেরই অল্পবিস্তর দুর্বল। সেজন্য আমার উল্লেখিত শোনা কাহিনীর মধ্যে এ রকমের ত্রুটি অমার্জনীয় বলে মনে হয় না। বিবৃত ঘটনার ও কথোপকথনের লেখকের খানিকটা স্বাধীনতার প্রশ্রয় নিয়েই এগোতে হয়—ঘটনার সার্বিক তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হল কিনা এ বিষয়ে সজাগ থাকলেই চলে। সত্য ও যথাযথ তথ্য সর্বদা সমার্থক নয়, দরবেশজী এই কথাই বলেছেন।

সংগ্রাহক

উপক্রমণিকা

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।

'তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা,
কোন্ খানে রাখব প্রণাম ?'

দরবেশ মানে বহুরূপী। দরবেশজী কে ছিলেন এ প্রশ্নের-ও অনেক উত্তর দেয়া যায়। উত্তরজীবনে যিনি স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ তাঁর সংসারী নাম কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ফরিদপুর জেলায় খালিয়া গ্রামের একধারে জমিদার ও তান্ত্রিক সাধক কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র বলে এই মর জগতে তাঁর প্রথম পরিচয়। তাঁর দ্বিতীয় প্রধান পরিচয় তিনি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য। মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি গোস্বামী প্রভুর কৃপা লাভ করেন। এরই কিছুদিন পরে তাঁর আর একটি রূপের উন্মোচন হল, সরোজবালা দেবীর প্রেমিক স্বামী হয়ে তাঁর মধুর গার্হস্থ্য জীবনের শুরু হল। এরপর বেশ দীর্ঘ দিন তাঁর সাধনার সংসার আর সংসারের সাধন। বরিশালে তিনি নিপুণ ব্যবসায়ী, সফল কারবারী অন্যদিকে নিরলস সাধক, একনিষ্ঠ তপস্বী। ১৩০৫ সালের ১০ বৈশাখে পুরীধামে গোঁসাইজী কিরণকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'তুমি ফকীর হবে কিন্তু বড় মানুষের মত চাল বজায় থাকবে। তখন যদি অনাসক্তের মত চলতে পার, তবেই পাড়ি দিলে; আর ভাবনা থাকবে না।' কিরণচন্দ্র সন্ন্যাস নিয়ে ফকীর হলেন ১৩১৮ সালের মাকরী সপ্তমীতে, প্রয়াগধামে। ক্রমে তিনি আবার নতুন রূপে প্রকাশ পেলেন সদ্‌গুরু মূর্তিতে, বহু তৃষিত আত্মার দিশারী হয়ে।

দরবেশজীর শিষ্য-শিষ্যাদের কাছেও তিনি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। কেউ তাঁকে জানেন গুরুজী বলে, যে গুরু তাকে হাত ধরে ধর্মের পথে ভগবানের রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। কেউ বা তাকে বাবা বলে ডাকেন, শিশু সন্তানের মত তাঁর মধ্যে আশ্রয় খোঁজেন। এমনও আছেন যাঁরা প্রকাশ্যে না হলেও নিভৃতে তাঁর সঙ্গে আরও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পাতিয়ে আরাম পান। অনেকেই তাঁকে ঠাকুর বলে জানেন, প্রভু বলে মানেন। সাবধানী ভক্ত বলবেন, এই রকম বিবিধ ভাবে গুরুকে আস্বাদন তো নতুন কথা নয়, এই সমস্ত ভাব তো পরস্পর বিরোধী নয়। যাঁকে কেন্দ্র করে এই বিভিন্ন ভাবের তরঙ্গ বয়ে যায় তাঁর দিক দিয়ে স্ববিরোধিতার প্রশ্ন ওঠে না, ঠিকই। কিন্তু প্রত্যেক সাধকের ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখতে গেলে দ্বন্দ্বের কারণ ঘটে বৈ কি। স্বামী অসীমানন্দজী ও দরবেশজীর ব্যবহারিক সম্পর্কের কথা ধরা যাক। ধানবাদে দরবেশজী এসেছেন। পুরুলিয়া থেকে তাঁর শিষ্য চিত্তসন্তোষ মিত্র, অন্নদা চক্রবর্তীকে, গার্হস্থ্যাশ্রমের অসীমানন্দকে, দরবেশজীর কাছে নিয়ে এসেছেন, গোস্বামী প্রভুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে পুরুলিয়ায় উৎসব করার কী ব্যবস্থা করা যায় তার আলোচনার জন্য। দরবেশজী অন্নদাকে প্রথম আলাপে 'আপনি' বলে সম্বোধন করলেন। কিন্তু অন্নদা তাঁর প্রথম সম্বোধনেই দরবেশজীকে 'তুমি' বলে ডাকলেন। অসীমানন্দ বলেছেন যে দরবেশজীকে তাঁর এমন আপন বোধ হল যে 'আপনি' বলার কথা তাঁর মনেও এলো না। সহজ সরল ভাবের এ অতি স্বাভাবিক প্রকাশ। অথচ দরবেশজীর অনেক শিষ্যই অসীমানন্দের এই 'তুমি' সম্বোধন সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা এ নিয়ে অসীমানন্দের উপর বিরক্ত হয়েছেন, দরবেশজীর কাছে নালিশও করেছেন। দরবেশজী নালিশের উত্তরে বলেছিলেন, বেশতো, তোমাদের যদি অন্নদার 'তুমি' বলা ভাল না লাগে তবে অন্নদা যখন আমার সঙ্গে কথা বলবে, তোমরা তখন সেখানে থেকো না। এই উত্তরে নালিশ বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু মনের ক্ষোভ হয়ত মেটে নি।

যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর তম ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দরবেশজী একবার করেছিলেন মেদিনীপুর জেলার কান্তোড় গ্রামে। কান্তোড় গ্রামটি দুর্গম, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে দরবেশজী যখন সেখানে কয়েকবার গিয়েছেন তখন গ্রামটি দুর্গমতর ছিল। এখানে দরবেশজী একটি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। একবার দরবেশজীর আগমনের পর স্থানীয় একটি বৈষ্ণব ঐ শ্লোকটির অর্থ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। দরবেশজী বললেন, 'বিভিন্ন ভাবের তারতম্য তখন পর্যন্তই মনে আসে যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারক 'তটস্থ' অর্থাৎ তটে বা পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিচারক নিজে ভাবুক হয়ে ভাবের সাগরে নেমে পড়লে আর তারতম্য বোধ থাকে না অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবের তরঙ্গের কোনটা বড় কোনটা ছোট এ বিচারই আসে না।' তটস্থ থাকাতেই এই ভাল মন্দ, ছোট বড় বিচার। থাক না বিচার, এই বিচার আছে বলেই তো দরবেশের বহু রূপের আস্বাদন, তাঁকে বহু রূপে আস্বাদন। আর কে না জানে যে অনন্ত ভাবের রাজ্যে কোন একটা ভাবই চিরদিনের নয়। আজকের যে দাস সে কালকের সখা ও তার পর দিনের দয়িত। নিতান্ত ব্যবহারিক দিক থেকেও দরবেশজী ও তাঁর কৃপাশ্রিত জনদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখলে এই বহু রূপের অন্য রকম প্রকাশ চোখে পড়ে। দরবেশজী নিজে গোঁসাইজীর শিষ্য আবার তিনি দুই হাজারের কিছু বেশি নরনারীর গুরু। ধর্মের যে কোন প্রচলিত পন্থায় যিনি চলতে চান ও গুরু-করণের প্রয়োজন অনুভব করেন তাঁর অবশ্যই ভগবান সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট বা অস্পষ্ট সংস্কার থাকে। দরবেশজীর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে এই ব্যবহারিক সম্পর্ক ও সংস্কার আশ্রয় করে বিভিন্ন প্রত্যয় গড়ে ওঠে এবং এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতে তিনটি মোটামুটি ভাগে তাঁদের শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। প্রথম দল মনে করেন, ভগবান একটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু;

গুরু দরবেশজীর প্রদর্শিত পথে দরবেশজীর গুরু গোঁসাইজীর কৃপায় ঐ ভগবানকে লাভ করার জন্যই সাধন ভজন। দ্বিতীয় দল বলেন, গোঁসাইজীই ভগবান কিম্বা ভগবানের গোঁসাইজী-রূপই আরাধ্য; গুরু দরবেশজী সেই আরাধ্যের কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন অথবা হাত ধরে নিয়ে যাবেন। তৃতীয় শ্রেণীর অন্য দল ভাবেন যে দরবেশজী স্বয়ংই ভগবান কিংবা গোঁসাইজী-রূপী ভগবানের তিনি অভিন্ন, সুতরাং দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোন সত্তার আরাধনা নিরর্থক। তটস্থ হয়ে বিচার করতে গেলে এই তিন রকম বিশ্বাসের বা ভাবের ছোট-বড় পার্থক্য হয়ত করা যায় কিন্তু তট ছেড়ে অনুভবের গহনে অবগাহন করলে আর কোন ভেদাভেদ থাকে না।

ভগবানের কথা যখন উঠেছে তখন গোঁসাইজী প্রবর্তিত সাধন পন্থায় ভগবানের স্থান কোথায় এ আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে হয়। গোঁসাইজী বলতেন, 'যা সত্য তা-ই ব্রাহ্ম ধর্ম।' সত্য বলে উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত ভগবান বিষয়ে যা কিছু সংস্কার বা ধারণা তা সবই অসত্য কল্পনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। গোঁসাইজীর আর একটি আবশ্যিক উপদেশ, নিজেকে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করো না। সম্প্রদায় কি? ভগবান সম্বন্ধে যে কোন ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে ভগবানের কোন না কোন প্রচলিত বা অপ্রচলিত রূপের কল্পনা। এমন কি যাঁরা নিরাকারবাদী তাঁরাও অবচেতনে কোন জ্যোতি বা রূপের মুগ্ধ পূজারী। এই বিভিন্ন রূপের এবং সেই রূপাশ্রিত বিবিধ গুণের আরোপ করে উপাসক তাঁর ভগবানকে গড়ে তোলেন। একই রূপের উপাসক মণ্ডলীকে ঘিরে যে এক একটি দল গড়ে ওঠে তাদের-ই সম্প্রদায় বলে বলা হয়। গোঁসাইজীর উপদেশের তাৎপর্য হল যে ভগবান বলে প্রচলিত কোন একটি রূপ বা সংস্কারকে অন্ধ বিশ্বাসে যেন গ্রহণ না করা হয়। সত্য যা, তা সাধকের কাছে স্বতঃ-ই প্রতিভাত হবে। যতদিন তা না হয় ততদিন উপলব্ধ নয় অথচ পরিচিত যে কোন মূর্তি বা রূপ আশ্রয় করা বা অবলম্বন করা কল্পনার বা অসত্যের রাজ্যে বাস করা, নিজেকে

সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে আবদ্ধ করে সত্যের স্বাভাবিক স্রোতকে ব্যাহত করা। গোঁসাইজীর সাধনে তাই ভগবান বলে কোন নির্দিষ্ট সংস্কারকে স্বীকার করে নেবার প্রয়োজন হয় না, বরং ও-রকম সংস্কার থাকলে সাধকের অসুবিধা হতে পারে। গোঁসাইজী পরিষ্কার বলেছেন, 'আমাদের এই সাধন সম্পূর্ণ গুরুকৃপা সাপেক্ষ। নাস্তিকেও এই সাধন করতে পারে।'

দরবেশজী বলতেন এবং একাধিক চিঠিতে লিখেওছেন যে তাঁর পরিবেশিত সাধনের উদ্দেশ্য পরাশান্তি লাভ, তিনি এ কথা বলেন নি যে ভগবানকে লাভ করা বা জানার উদ্দেশ্যেই সাধন ভজন করা। একটু চমকপ্রদ শোনালেও একথা বলা চলে যে গোঁসাইজীর সাধনে ভগবানকে বিশ্বাস করা তো দরকারই হয় না, ভগবানকে না মানলেও চলে। গয়ার অ্যাডভোকেট অম্বুজাক্ষ ঘোষের কথাই আলোচনা করা যাক। তিনি যে পরিবেশে মানুষ সেখানে ভগবানকে মানা তো দূরের কথা সে সম্বন্ধে কোন কৌতুহল হবার মত সংস্কারও তাঁর হয়ত ছিল না, অথচ তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু নিরঞ্জন বসু, যিনি উত্তর জীবনে সন্ন্যাস নিয়ে নিখিলানন্দ সরস্বতী হয়েছিলেন, এবং তাঁর বাল্যবন্ধু কুমুদিনী ঘোষ এই দুজনের পাল্লায় পড়ে তিনি দরবেশজীর সংস্পর্শে আসেন। নিরঞ্জন ও কুমুদিনী উভয়েই দরবেশজীর শিষ্য ছিলেন, এঁদের বারংবার অনুরোধে অনেকটা দায়ে-পড়া ভাবে অম্বুজাক্ষ দরবেশজীর কাছে সাধন প্রার্থনা করেন এবং অনুমতি পান। সাধনের ঠিক অব্যবহিত পরে অম্বুজাক্ষকে দরবেশজী বললেন, 'ভগবান নেই, এই বিশ্বাস রেখেই সাধন করো।' অম্বুজাক্ষ অবাক হলেন বটে, আবার নিশ্চিন্তও বোধ করলেন হয়তো, জোর করে তাঁর মাথায় ভগবানকে চাপিয়ে দেয়া হল না বলে।

গোঁসাইজীর সাধন পন্থায় পথিকের ভগবানকে প্রথমে বিশ্বাস করে নিয়ে বা মেনে নিয়ে পথ চলা শুরু করতে হয় না বটে কিন্তু চলতে চলতে বা চলার শেষে (যদি শেষ বলে কিছু থাকে) তাঁরা অনেক

সত্যের সাক্ষাত অবশ্যই পান। সেই উপলব্ধ সত্যই তাঁদের ভগবান বা ইষ্ট। এই সাধনে ভগবানকে ধরে নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে চলার নির্দেশ নেই বরং ভগবান বা ইষ্টকে নিজে এগিয়ে এসে সাধকের কাছে ধরা দেবার আয়োজন আছে। ভগবানকে লাভ করা বা পাওয়ার জন্য এ সাধন নয় কারণ সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত জনেরা ভগবানকে পেয়েই আছেন, সেই পাওয়াটা কী বা কেমন তা বোঝার জন্যই যা সাধনের প্রয়োজন। গোঁসাইজী যে বলেছেন, 'সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না, গুরু করেন' তার সম্যক তাৎপর্য এখানে। ব্রহ্মবিদ্ যেমন ব্রহ্মৈব ভবতি, ভগবানবিদ্-ও তেমন ভগবান হয়ে যান। শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণ লীলামৃতের ভাষায় এ সাধনে উপাস্য ও উপাসকে কোন ভেদ থাকে না, কাজেই ভগবানকে তৃতীয় পুরুষ ধরে নিলেও গোঁসাইজী ও ভগবানে কোন ভেদ নেই, তেমনি দরবেশজী ও গোঁসাইজীতেও কোন পার্থক্য নেই। দরবেশজীর শিষ্যরা তাই তাঁকে যে ভাবেই ধারণা করুন কোন ক্ষতি নেই। আস্বাদনের একটু আধটু রকমফের হলেও হতে পারে। লৌকিক দৃষ্টিতে কিন্তু দরবেশজী বহুরূপী, বিবিধ ও বিচিত্র ভাবের আলোয় তিনি অনেক রূপে প্রতিভাত, প্রকাশিত।

কিন্তু দরবেশজী মনুষ্যদেহধারী গুরু—পথপ্রদর্শক ও আদর্শ। তাঁর ভগবৎ সত্তা বরণীয় ও আদরণীয় নিশ্চয়ই কিন্তু তা সাধকের কাজে লাগে না। অবতীর্ণ ভগবান-ও নরলীলায় পুরোপুরি মানুষের মত—সাধারণ মানুষের মত আচরণ করেন। তিনি তা করেন বলেই সাধক মানুষ তাঁকে অনুসরণ করতে চায় ও চেষ্টা করে। আদর্শ পুরুষ বা গুরুর ভগবৎ সত্তা সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রম থাকা সত্ত্বেও সাধক ভাবতে পারে যে তারই মত ভালমন্দ, দোষত্রুটি মেশানো যে মানুষটি গুরুর পর্যায়ে পৌঁছেছেন কিম্বা ভগবানের মত হয়েছেন তাঁর কথিত ও প্রদর্শিত পথে চলতে পারার সামর্থ্য তারও হবে। এই ভরসাতেই সাধকের পথচলা সম্ভব হয়। ভগবানের মত অপরিচিতের-অসাধারণের ধরণ-করণ সাধককে বিস্মিত করলেও আকৃষ্ট করে না, সচেষ্ট করে না।

মানুষ ধরার জন্য ভগবানকে তাই পুরো মানুষ সাজতে হয়। 'সবার উপর মানুষ সত্য' এ বাণীর তাৎপর্য এখানেই। সিদ্ধদের জন্য ভগবান, সাধকের জন্য মানুষ-গুরু। দরবেশজী একবার শিষ্য পরিবৃত অবস্থায় বসে আছেন, এমন সময় দর্শনার্থী একজন প্রশ্ন করলেন, 'আপনার শিষ্যদের মধ্যে কজন সিদ্ধ হয়েছেন?' দরবেশজীর তৎক্ষণাৎ উত্তর, 'সকলেই সিদ্ধ, শুধু খোসা ছাড়িয়ে নেবার অপেক্ষা'। খোসা ছাড়ানো সিদ্ধরাই কি মানুষ গুরু ছাড়া অন্য কোন ভগবানে আসক্ত হন? এ প্রশ্নের উত্তর গোঁসাইজী ও দরবেশজীর জীবনেই পাওয়া যায়। কে না জানে যে গোঁসাইজী তাঁর বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টা ও আচরণে প্রায়শই তাঁর গুরুর দোহাই দিতেন, বলতেন, গুরুর আদেশ মতই তিনি চলেন। দরবেশজী বলতেন, গোঁসাই ছাড়া সমস্ত জীবনে তিনি আর কাউকে পূজা করেন নি, পরিণত বয়সেও তিনি যে বিভিন্ন সময়ে গোঁসাইজীর ধমক পর্যন্ত খেতেন, পুলকের সঙ্গে তা প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না।

ভগবান দরবেশজীর অনেক রূপ—অনন্ত রূপ, মানুষ দরবেশেরও অনন্তরূপ না হলেও প্রকাশ্যে বহু রূপ। সেই বহু রূপের বিশেষ কয়েকটির আস্বাদন করাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য। দরবেশের ত্রিবিধ প্রকাশ—গুরুসঙ্গে, পরিজন-সঙ্গে ও শিষ্যসঙ্গে। গুরু বা মুরশিদ দরবার, আম দরবার ও খাস দরবার এই নিয়ে যে দরবেশ দরবার তার শরিক হতে না পারলেও উঁকিঝুঁকি দেবার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

আগে তিনি স্বয়ং গোঁসাইজীর কাছেই আর একবার সাধন লাভ করেছিলেন। কিন্তু না, এ মীমাংসায় হিসেবের গড়মিল ধরা পড়ে। গোঁসাইজী সাধন দিতে শুরু করেন বাংলা ১২৯১ সালে; কিরণ তখন ছয় বছরের শিশু। কাজেই বলতে হয় অবতীর্ণ সদ্‌গুরু গোঁসাইজীর আবির্ভাবের আগেই অন্য এক জন্মে কিরণচন্দ্র সদ্‌গুরুর সাধন পেয়েছিলেন, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে সে সাধন গোঁসাইজীর কাছে নয়। সে জন্মে তিনি তবে কার কাছে সদগুরু-সাধন লাভ করেছিলেন, এ ব্যাপারে অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই। গোঁসাইজী বলেছেন, মহাপ্রভু মাত্র সাড়ে তিনজনকে এই সাধন দিয়েছিলেন। আর যাঁরা মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা পেয়েছিলেন তাঁরা ধন্য হলেও এ সাধন পান নি। কিরণচন্দ্র কি সেই সাড়ে তিন জনের মধ্যে ছিলেন? উত্তরজীবনে কিরণচন্দ্র দরবেশজী হয়ে শ্রীশ্রীগোঁসাই-গণোদ্দেশ লিপিকা রচনা করতে আরম্ভ করেন; দুর্ভাগ্যবশত লিপিকাটি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ঐ লিপিকায় দেখা যায় সদ্‌গুরু মহাপ্রভুর সাধন-ধন্য রায় রামানন্দ গোঁসাই-লীলায় জগদ্বন্ধু মৈত্র এবং স্বরূপ দামোদর পরবর্তী লীলায় রাধারমণ গুহ। শিখি মাহিতি ও মাধবী দাসীর কথা চরিতামৃতকার যেমন বিশেষ কিছু বলেন নি, দরবেশজীর গণোদ্দেশ লিপিকায়ও তাঁদের কথা উল্লেখ নেই। কিরণচন্দ্র কি এই দু'জনের কেউ ছিলেন? এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেবার কোন উপায় নেই। কিরণচন্দ্র কি করে মাধবী দাসী অর্থাৎ মহিলা ছিলেন এ প্রশ্ন অবান্তর কেন না গণোদ্দেশ লিপিকায় দেখা যায় গোঁসাইজীর শিষ্য ছোট সতীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ লীলায় চন্দ্রাবলী ছিলেন।

এ কথা প্রায় সবারই জানা আছে যে গুরু নানক মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। নানক যে সদ্‌গুরুর অবতার ছিলেন এবং ত্রেতাযুগে তিনি যে রাজর্ষি জনক ছিলেন, এ কথা গোঁসাইজী বলেছেন এবং দরবেশজী, বরদা কুমার দেবকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। একই সময়ে সদ্‌গুরু একজন মাত্র

থাকেন, গোঁসাইজীর এ কথার সঙ্গে মহাপ্রভু ও নানক কি করে একই সময়ে সদ্‌গুরু রূপে বিরাজ করেছেন এই প্রশ্নের সমাধান জিজ্ঞেস করায় গোঁসাইজী ঠাকুর বরদাকান্তকে বলেছিলেন, 'ইহাঁদের (অর্থাৎ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু) মধ্যে তাঁহাকে (নানকজীকে) কেহ কৃপা করেন নাই ইহা কেমন করিয়া বুঝিলে ?' এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে নানকজী অবতীর্ণ সদ্‌গুরু নন, তিনি সদ্‌গুরুর অবতার ; ভগবানের পার্ষদ ; স্বয়ং ভগবান নন। গোঁসাইজী বলেছেন, 'নরকবাসীদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ও শ্রীভগবানের কাছে যাচ্‌ঞা করিয়া রাজর্ষি জনক নানক রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অংশাবতার।'

কিরণচন্দ্র পূর্বজন্মে গুরু নানকের সদগুরু-সাধন পেয়েছিলেন ; এ অনুমান ও তো চলতে পারে। কিরণচন্দ্র তাঁর স্বহস্ত লিখিত 'মদীয় জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলীর পঞ্জিকা' পুস্তকে তাঁর পূর্বজীবনের একটু আভাস দিয়ে গেছেন। বাংলা ১৩০৮ সালের ৮ জ্যৈষ্ঠ কিরণচন্দ্র পুরী-ধাম থেকে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যান। গোঁসাইজীর অন্য তিনজন শিষ্য তাঁর সঙ্গী ছিলেন, অমৃতলাল সেনগুপ্ত তাঁদের একজন। আষাঢ়ের ৪ঠা তাঁরা সেতুবন্ধ হয়ে বেজোয়াদা পৌঁছান। এইখানে কিরণের পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগে। তাঁর মনে পড়ল, বেজোয়াদা সহরের পাহাড়ের অন্য ধারে একটি গোঁফা আছে এবং তাঁর অভ্যন্তরে একটি পাথরের আসন আছে —যে আসনে তিনি পূর্বজন্মে সাধন করেছেন। এই স্মৃতির কথা বলায় অমৃতলাল ও অন্যান্য সঙ্গীরা পাহাড়ের অন্যধারে গিয়ে দেখে এলেন যে কিরণচন্দ্রের বর্ণনা সত্য। পূর্বজন্মে কিরণচন্দ্র এখানে ফকীর ছিলেন, এই ফকীরের স্মরণার্থ এখানে এখনও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় গোঁসাইজীরও গয়াধামে অনুরূপ পূর্বজন্মের স্মৃতি হঠাৎ উদয় হয়েছিল এবং সেই জন্মে তিনি যে একটি বৃক্ষে 'ওঁ রাম' ছুরি দিয়ে লিখে ছিলেন, তাঁর কথা শুনে তাঁর সঙ্গীরা তা খুঁজে বার করেন। সে যাই হোক, কিরণচন্দ্র যে পূর্বজন্মে সদগুরু-সাধন পেয়েছিলেন সে সত্য

মেনে নিয়ে এ কথা বলতে হয় যে তিনি সে জন্মে সাধক হিসাবে চরিতার্থ হন নি। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন যে গোঁসাই অবতারে তিনি প্রথম লীলা সম্ভোগের অধিকারী হলেন। এখানে লক্ষণীয় এই যে কিরণচন্দ্র প্রচলিত বৈষ্ণব ধারণা অনুযায়ী লীলা দর্শনের কথা বলেন নি, লীলা সম্ভোগের কথা বলেছেন। সদ্‌গুরু সাধনের লক্ষ্য যে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি তার ব্যবহারিক প্রাপ্তি লীলা সম্ভোগ, লীলা দর্শন নয়। এই চরম সার্থকতা লাভের জন্যই সাধক বেজোয়াদার ফকীরের কিরণচন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ ও উত্তর জীবনে দরবেশরূপে লীলা। এই জন্মগ্রহণ তো সাধারণ ব্যাপার হতে পারে না। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে এ জন্ম না হয়েই পারে না। কিরণচন্দ্রের জন্মে তাঁর কুলং পবিত্রং ঠিকই, আবার তেমন কুল দেখেই তো তাঁর কুল নির্বাচন।

গোঁসাইজীর শিষ্য বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ' গ্রন্থে গোঁসাইজীর অদ্বৈত-বংশে আবির্ভাবের যুক্তি হিসাবে বলছেন; 'গোস্বামী মহাশয় যে অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা হইতে পারে না। *** শ্রীশ্রীমন্মাহাপ্রভু যে অনর্পিতচরী ভক্তিধারা প্রকট করেন, সেই ভক্তিধারার গঙ্গোত্রীরূপে আমরা শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য প্রভুকে দেখিতে পাই। অদ্বৈতাচার্য যে ভক্তি সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা জ্ঞান-মিশ্র-ভক্তি ছিল। মহাপ্রভু স্বয়ং যে ভক্তি সাধন করেন, তাহা জ্ঞানশূন্যা ভক্তি ছিল। *** অদ্বৈত প্রভুর ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা ছিল বলিয়াই আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে লোকে অদ্বৈত প্রভুর ভক্তিকে যে পরিমাণ শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিতে পারিবে, মহাপ্রভুর জ্ঞানশূন্যা অহৈতুকী ভক্তিতে সে পরিমাণ শ্রদ্ধাবান হইতে পারিবে না। এই জন্যই যিনি মহাপ্রভু-প্রকটিত অনর্পিতচরী ভক্তিধারাকে আবার জীয়াইয়া তুলিবেন, তাঁহার পক্ষে অদ্বৈত প্রভুর সাধন ধারার সঙ্গে সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনেই অদ্বৈত বংশে পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জন্ম হয়, এইরূপ মনে হয়।' এই প্রসঙ্গে বিপিন পাল আরও বলেছেন, যে

ইংরেজী ভাষায় idiom যেখানে was born—জন্মিয়া ছিলেন, বাংলা ভাষায় idiom হিসাবে বলা হয় জন্মগ্রহণ করা। জন্মগ্রহণ কর্ত্তৃবাচ্য। ইহা দ্বারা জন্মব্যাপারে আত্মার যে কর্ত্তৃত্ব আছে, এই কথাটা বোঝায়। এই কর্ত্তৃত্ব সকল আত্মার না থাকুক, অন্তত উন্নত আত্মার অবশ্যই আছে। সদগুরু-সাধন প্রাপ্ত পূর্বজীবনের কিরণচন্দ্র অবশ্যই শ্রীমান্ সাধকের গৃহকে জন্মগ্রহণ করার জন্য বেছে নেবেন, এ ধারণা নিঃসন্দেহে করা যায়।

কিরণচন্দ্র নিজেই তাঁর এ জন্মের বংশ-পঞ্জী বিশদ ভাবে লিখে গেছেন। যাঁরা কৌতুহলী তারা কিরণচন্দ্রের প্রকাশিত তাঁর বাবা কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত সঙ্গীত সংগ্রহ 'কুল-সঙ্গীত' পুস্তিকার ভূমিকাটি পড়ে দেখতে পারেন। ফরিদপুর জেলায় খালিয়া গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বংশ অতি প্রাচীন বংশ। কিরণচন্দ্রের পিতামহ দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সামান্য কেরাণীর পদ থেকে কর্মজীবন শুরু করে পরে ডেপুটী কালেকটর হন। তিনি বহু অর্থ উপার্জন করে স্বদেশে বিস্তৃত জমিদারী খরিদ করেন; কলকাতা, পুরী, বারাণসী ইত্যাদি স্থানে বাড়ি প্রস্তুত করেন। কিরণের বাবা কুলচন্দ্র দুর্গাচরণের চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র হলেও তিনিই পৈতৃক বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

কুলচন্দ্র তন্ত্রোক্ত প্রণালী অনুযায়ী নানা প্রকার সাধনা করতেন, দিনের অধিকাংশ সময় শাস্ত্রালোচনায় যাপন করতেন। কিরণচন্দ্র বাল্যে তাঁর বাবাকে শিবা ভোগ দিতে দেখেছেন। নানারকম অন্ন-ব্যঞ্জন তৈরী করে দোতলার ছাদের উপর এক পার্শ্বে রাখা হত, আর কোথা থেকে একটা শেয়াল এসে বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে গিয়ে সেই সমস্ত খাদ্য খেয়ে নিঃশব্দে চলে যেত। কুলচন্দ্র নানা প্রকার মন্ত্র-তন্ত্র ও ঝাড়া-পোছা জানতেন, তাঁর কাছ থেকে কিরণের বড় ভাই শ্রীশচন্দ্র ঐ সব মন্ত্র-তন্ত্র কিছু কিছু শিখেছিলেন।

কিরণচন্দ্রের পিতা একাধারে ভূস্বামী, কুলীন ব্রাহ্মণ ও উচুদরের তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। গৃহ দেবতা লক্ষ্মী-জনার্দন ও স্থাপিত শিব

লিঙ্গের প্রতি তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। কিরণচন্দ্রের বয়স যখন এগারো বছর তখন তাঁর বাবা ৫৯ বছর বয়সে কলকাতায় গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। ১৩০৬ সালের ১০ বৈশাখ পুরীধামে গোঁসাইজী কিরণচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'তোমার বাবা ডানলপ সাহেবের সঙ্গে যৌবনকালে ঈশান মুখুজ্যের পরামর্শে যে প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তাতে তোমাদের সম্পত্তি থাকা কঠিন। তবে যদি এখন থেকে তোমরা খুব সৎভাবে দানাদি কর, তবে হয়তো টিকে যেতে পারে। * * * তুমি ফকীর হবে, কিন্তু বড় মানুষেরমত চাল বজায় থাকবে।'

কুলীন বামুনের রীতি অনুসারে কিরণের বাবা তিনটি বিয়ে করে ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী রসময়ী দেবী কিরণের মা। রসময়ী পূর্বাপর হিসেবে মেঝো বধূ হলেও বয়সে সর্বজ্যেষ্ঠা এবং পুত্রের জননী বলে বাড়ির কর্ত্তৃত্ব তাঁর হাতেই ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্রের জন্মের দীর্ঘ তেইশ বছর পর কিরণের দিদি গিরিবালার জন্ম হয়। এর দু'বছর পর ১২৮৫ সালে কণিষ্ঠ পুত্র কিরণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কিরণচন্দ্রের বড় মা প্রসন্নময়ীর পুত্র সন্তান ছিল না বলে, রসময়ী কিরণকে তাঁর বড় মাকে দিয়ে দেন এবং কিরণ বাল্যে বড় মাকেই নিজের মা বলে জানতেন। কিরণের যখন জন্ম তখন রসময়ীর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। তাঁর বড় ছেলে শ্রীশচন্দ্রের ছেলের বয়সই তখন আট বছর। এ জন্য রসময়ী বেশ একটু লজ্জিত বোধ করতেন এবং কিরণের প্রতি একটু অনাদর দেখাতেন। কিরণ তাঁর বৌদি প্রসন্নকালীর বুকের দুধ খেয়েই বড় হয়েছেন।

রসময়ী জীবিত থাকতেই কিরণের পিতৃতুল্য দাদা শ্রীশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। এই মৃত্যুর সময়ে রসময়ী কাশীধামে বাস করছিলেন তিনি শোকে শয্যাগত এই খবর পেয়ে কিরণচন্দ্র কাশী যান। তখন তিনি মার কাছ থেকে তাঁর জন্ম সম্বন্ধে অনেক কথা শোনার সুযোগ পান। তাঁর মা বলেছিলেন, যখন কিরণের জন্ম তখন তাঁর আর ছেলে হবার মত বয়স ছিল না। এমন কি মাসিক ঋতু পর্যন্ত তাঁর বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল। কিরণের জন্মের পর তিনি ভাবলেন; শ্রীশই তো তাঁর ছেলে রয়েছে, আবার এ বয়সে এ আপদটা কেন? শ্রীশের মৃত্যুর পর মনে হল, শ্রীশ তো ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, এখন কিরণ যদি না হত তবে তো পুত্রহীনা হয়ে পিণ্ডলোপ করে মরতে হত!

কিরণের মা কিরণ সম্বন্ধে আরও অনেক আশ্চর্য কথা বলেছিলেন। কিরণের ষষ্ঠীর দিন রাত্রে মা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। সিন্দুর কপালে লালপাড় শাড়ি পরা একটি স্ত্রীলোক চার হাত-পায়ে হেঁটে আতুর ঘরে এসে ঢুকল, শিয়রে হাত বাড়িয়ে শিশুকে মায়ের বুক থেকে তুলে নেওয়ার উপক্রম করল। তখনই এক জটাজুটধারী মহাপুরুষ—পরণে গেরুয়া কাপড়, গলায় নানারকম মালা—আবির্ভূত হয়ে হাতের দণ্ড দিয়ে ঐ স্ত্রীলোকটিকে আঘাত করে বললেন, 'তফাৎ যাও, এখানে নয়।' মার খেয়ে স্ত্রীলোকটি ভয়ে পালিয়ে গেল। মহাপুরুষটি তখন হাসতে হাসতে মাকে বললেন, 'তোমার ছেলে আমায় দেবে?' মা অতি নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় ছেলেকে মহাপুরুষের কোলে দিয়ে বললেন, "বাবা এ ছেলে তোমার, তোমার যা ইচ্ছা কর।' মহাপুরুষ শিশুকে হাত দিয়ে ধরলেন কিন্তু কোলে না নিয়ে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন তোমার কাছে থাক, আমি চল্লাম।' এর পরই মার ঘুম ভেঙে গেল। পরদিন সকালে কিরণের বাবা স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে বললেন, স্বয়ং মহাদেব এসেছিলেন। কিরণের মা সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষকে মহাদেব জেনেই তখন নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু ১৩০২ সালে গোঁসাইজীর কাছে সাধন লাভ করার পর গোঁসাইয়ের ছবি নিয়ে কিরণ বাড়ি এসে যখন তা মাকে দেখালেন তখনই তাঁর মা বলে উঠলেন, 'এই সেই সাধু, যাঁকে তোর আতুর ঘরে আমি দেখেছিলাম। আজ আমি তোর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলাম।' কিরণের জন্মের অব্যবহিত পরের এই ঘটনার প্রায় বিশ বছর পর ১৩০৫ সালের ১৮ আষাঢ় পুরীধামে গোঁসাইজী কিরণকে সাক্ষাতে বলেছিলেন, 'তোমার ষষ্ঠী পূজার রাত্রেই ভগবান তোমাকে গ্রহণ করেছেন। তুমি মহাদেবের

চিহ্নিত দাস, তাই তিনি স্বয়ং এসে তোমার শিবপূজা দিয়েছেন।'

কিরণের বয়স যখন সবে তিন বছর তখন মা বাবার সঙ্গে তিনি প্রথম কাশীধাম যান। শিশু কিরণকে নিয়ে তাঁর মা-বাবা মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করতে গেলেন। স্বামীজী শুয়ে ছিলেন, ওঁরা যেতেই উঠে বসলেন এবং মায়ের কোলে কিরণের দিকে চেয়ে সস্নেহে মধুর হাসি দিয়ে আদর করলেন। শিশু কিরণ হাত বাড়িয়ে স্বামীজীর দিকে ঝুঁকে পড়লেন, তিনিও মার কোল থেকে কিরণকে নিজের কোলে নিলেন। মহাপুরুষের দেহে ছেলের পা ঠেকছে বলে মা ব্যস্ততা প্রকাশ করতে স্বামীজী কিরণের কপালে খানিকটা বিভূতি মেখে দিয়ে তাঁকে মার কোলে ফিরিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকেরা বললে, বাচ্চা নিশ্চয়ই সাধু হবে, কারণ স্বামীজী আর কাউকে অমন আদর করেন না। সাক্ষাৎ দেহধারী বিশ্বনাথ-স্বরূপ স্বামীজী মহাদেবের চিহ্নিত দাসকে এক নজরেই চিনে নেবেন, তাতে আর সন্দেহ কি !

জন্মগ্রহণের জন্য কিরণ শুধু মাত্র শুচী ও শ্রীমান সংসারই যে বেছে নিয়েছিলেন তাই নয়। তাঁর আবির্ভাবের তিথিটিও তাঁর নির্বাচিত বলে মনে হয়। গোঁসাইজীর জন্ম তিথি ঝুলন পূর্ণিমা, মহাপ্রভুর দোল পূর্ণিমা ও গুরু নানকের রাস পূর্ণিমা। কিরণচন্দ্রের জন্মতিথি হিন্দোল চতুর্দশী অর্থাৎ ঝুলন পূর্ণিমার ঠিক আগের তিথি। এ নিয়ে উত্তর কালে কিরণ কৌতুক করে বলতেন, 'আমি গোঁসাইজীর চেয়ে একদিনের বড়।'

জন্মের আগে থেকেই এবং জন্মগ্রহণের পর প্রতিদিনের প্রতি পদক্ষেপেই কিরণচন্দ্রের জীবন একটা অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে—সে পরিণতি গোঁসাইজীর আশ্রয় গ্রহণ করা, সেই আশ্রয় অবলম্বন করে তাঁর যুগযুগান্ত ধরে আকাঙ্ক্ষিত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম ভক্তি আস্বাদন করে চরিতার্থ হওয়া। কিরণের শৈশব ও বাল্যের সমস্ত ঘটনার মধ্যে এই পরিণতির সুস্পষ্ট আভাস প্রতি নিয়তই ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাঁর সে উত্তরণের বিস্তৃত লীলা অনুরাগীর আস্বাদ্য

হবে জেনেও বর্তমান আলোচনায় শুধু গোঁসাইজীর সঙ্গে সাক্ষাত যোগাযোগ রয়েছে এমন ঘটনা ক'টি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হবে, সংযমেও তৃপ্তি আছে।

পিতার দেহত্যাগের দেড় বছর পর ১২৯৮ সালের ১ বৈশাখ ১৩ বছর বয়সে কিরণের উপনয়ন সংস্কার হয়। পিতার মৃত্যুর পর গুরুদশার দরুন উপবীত গ্রহণে দেরী হয়েছিল। উপবীত ধারণের পর মাত্র একবছর নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা করার পর তিনি উহা পরিত্যাগ করেন। গোঁসাইজীর কাছে সাধন পাওয়ার পর আবার তিনি ত্রিসন্ধ্যা শুরু করেন। উপনয়নের কিছুদিন পরেই দাদা শ্রীশচন্দ্র কিরণকে পড়াশুনার জন্য ঢাকা পাঠিয়ে দিলেন। ঢাকায় জুবিলী স্কুলে তিনি পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ করেন। তিনি ছাত্রাবাসে থাকতেন।

ঢাকায় থাকতে মাঘোৎসব উপলক্ষে তিনি পূর্ববাংলা ব্রহ্মমন্দিরে গোঁসাইজীর শিষ্য মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রদত্ত 'শ্রীচৈতন্য ও ব্রাহ্মধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা শুনে এত মুগ্ধ হন যে তার পর থেকে প্রতি রবিবার নিয়মিত ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করেন। এদিকে তার ছাত্রাবাসের সঙ্গীদের অধিকাংশেরই চরিত্র ভাল ছিল না, তাদের কুসঙ্গে কিরণের মন বিক্ষিপ্ত হত, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের সৎশিক্ষা ও সুমতি তাঁর মনের রাস টেনে ধরত। কিন্তু কিরণচন্দ্রের ঢাকা বাসের মেয়াদ খুব স্বল্প হল। একদিন সন্ধ্যায় কিরণের চোখের সামনে একটি ঢাকাই কুট্টি যুবক বড় রাস্তায় এক ভদ্রলোকের পেছনে ছোরা মারল। কিরণ দৌড়ে গিয়ে খুনীকে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু আটকে রাখতে পারল না। পুলিশ কিরণকে নিয়ে ঢাকার গলিতে গলিতে খুনীকে সনাক্ত করার চেষ্টা করতে লাগল, ফলে কুট্টিরা কিরণের উপর মারমুখো হয়ে উঠল। হিতৈষীদের পরামর্শে কিরণ ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন।

ঢাকা থেকে ষ্টীমারে দেশে ফেরার পথে কিরণের জীবনে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। নারায়ণগঞ্জ থেকে যাত্রা করে চাঁদপুরের কাছাকাছি ষ্টীমার মেঘনার বুক চিরে পূর্ণ বেগে চলছিল, কিরণ

দোতলায় ডেকে দাঁড়িয়ে দূরবর্তী তটরেখা ও নদীর তরঙ্গ-রঙ্গ দেখ-ছিলেন। তাঁর বাম পাশে ডেকের পর্দাঘেরা অংশে একটি মহিলা তাঁর দু'বছরের শিশুপুত্র নিয়ে বসেছিলেন। মহিলাটির স্বামী উকীল এক ভদ্রলোক একটু দূরে ডেকে বসেছিলেন। হঠাৎ সেই শিশুটি ষ্টীমারের রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে গলে দুরন্ত মেঘনার বুকে পড়ে গেল। পড়ার মুহূর্তেই দৃশ্যটি কিরণের নজরে পড়ল এবং শিশুর মা আর্তনাদ করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কিরণ শিশুর পেছনে নদীর মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। প্রথম ডুবেই কিরণ শিশুটিকে ধরতে পেয়ে প্রাণপণ আয়াসে তাকে জলের উপরে তুলে ধরতে পারলেন। ষ্টীমারের কাছাকাছি নদীর ঢেউ বেশি উত্তাল। কিরণের পক্ষে শিশুকে ধরে সাঁতার কাটা এমন কি নিছক জলে ভেসে থাকাও সহজ সাধ্য ছিল না। সাঁতার কাটায় পারদর্শিতা সত্ত্বেও কিরণ একবার ডুবে আবার ভাসতে লাগলেন। ওরই মধ্যে অবসর করে তিনি পায়ের জুতা ও পরণের কাপড় খুলে হাল্কা হলেন কিন্তু জামা খোলার সুবিধে হল না। ষ্টীমার ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পিছিয়ে এসে বোট নিয়ে শিশুসহ কিরণকে উদ্ধার করতে প্রায় বিশ মিনিট সময় লাগল। যখন তাদের ষ্টীমারে তোলা হল তখন শিশুটি অজ্ঞান, কিরণও অর্ধ-অচেতন। শীঘ্রই দুজনে সুস্থ হলেন। শিশুটির মা তখন পাগলের মত এসে কিরণকে 'বাবা, বাবা' বলে জড়িয়ে ধরলেন। একটা গভীর আত্মপ্রসাদে কিরণের মন ভরে গেল। উত্তর জীবনে এই সৎকার্যটির স্মৃতি কিরণের মনকে সরস করত, চিত্তকে প্রফুল্ল করে তুলত। এই কাজটির স্মরণ হলেই গঙ্গাস্নান করে উঠবার মত তাঁর নিজেকে পবিত্র ও হাল্কা মনে হত। গোঁসাইজী-ও কিরণকে এই জন্য বাহবা দিয়েছেন। পুরীধামে ১৩০৫ সালের ১৮ আষাঢ় গোঁসাইজী ঐ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'বালক বয়সে এক শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি যে চলন্ত জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন সঙ্কটাপন্ন করেছিলে, সে ঘটনা তোমার জীবনের দৃঢ় খুঁটি।'

১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসে কিরণ কলকাতায় পড়তে এলেন, আর্যমিশণ ইনষ্টিটিউশনের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এই কলকাতা বাস কিরণের ভবিষ্যৎ জীবনের পথে নানা কারণে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। ১৩ আষাঢ় তিনি জীবনে প্রথম জগন্নাথ ঘাটে সজ্ঞানে গঙ্গাস্নান করেন —'জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলীর পঞ্জিকা' বইয়ে তিনি এই তারিখটি উল্লেখ করেছেন। কিরণদের স্কুলে নিত্য নিয়মিত গীতা পাঠ আবশ্যিক ছিল, কিরণের এখানেই সম্পূর্ণ গীতা কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। কিরণ এই সময়-ই নিয়মিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। জীবনে এই প্রথম কিরণ তাঁর জীবনের কর্ণধার গোস্বামী দেবের নাম শুনলেন। গোঁসাইজী তখনো ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে জড়িত, সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরীর বাড়িতে আছেন। গোঁসাইজীকে ছাত্র সমাজের অধিবেশনে একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করার জন্য ললিত মোহন দাসের সঙ্গে কিরণ সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়িতে গেলেন। কিন্তু কিরণ দোতলায় উঠে গোঁসাইজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন না, ললিত দাস গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, গোঁসাইজী বক্তৃতা দিতে অস্বীকৃত হয়েছেন, অক্ষমতা জানিয়েছেন। আরও দুর্ভাগ্যের কথা, ললিত মোহন পথে আসতে আসতে গোঁসাইজীর মালা-তিলক ধারণ ও অন্য হিন্দুয়ানী আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন; কিরণকে গোঁসাইজীর নিন্দা শুনে প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত করতে হল। এখানেই এই বিরূপ ধারণার শেষ হল না। কদিন পরে গোঁসাইজী মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার বাসায় তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গিয়ে অভ্যাগত এক তান্ত্রিক সাধুকে কারণ আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। এই সংবাদে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হল। শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই ব্রাহ্মসাজের অধিবেশনে আচার্য হিসাবে গোঁসাইয়ের নাম উল্লেখ না করেও উপসনার উদ্বোধনেই ঐ দুর্নীতির বিষয় তীব্র কটাক্ষ করলেন। কিরণ এ সব শুনলেন এবং পূর্ণ উৎসাহে গোঁসাই বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিলেন। যে গোঁসাইজী কিছুদিন পরই কিরণের

ধ্যানজ্ঞান হয়ে বিরাজ করবেন সেই কিরণের জীবনে তাঁর প্রথম আবির্ভাবের পরিবেশটি বেশ অভিনব ছিল, সন্দেহ নেই ; এই ঘটনার মধ্যে খানিকটা যেন কৌতুকও রয়েছে।

এই কলকাতা বাসের সময়ই ১৩০০ সালের মাঘোৎসব উপলক্ষে কিরণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। মহর্ষি সেদিন বেদীতে বসে আচার্যের কাজ করেছিলেন ।

আবার এই কলকাতাতেই কিরণ কুসঙ্গের ফলে অনেক বহিরঙ্গ বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়লেন। নিয়মিত থিয়েটার দেখা, বাজে নাচগান ইত্যাদিতে যোগদান করা প্রায় তাঁর স্বভাব হয়ে দাঁড়াল। অথচ ভাল হবার বা ভাল হয়ে চলবার জন্য তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা হত, কিন্তু শত চেষ্টা করেও সস্তা আমোদ-প্রমোদের প্রলোভন তিনি এড়াতে পারতেন না। ছুটী উপলক্ষে বাড়িতে এসেও কুসঙ্গের হাত থেকে রেহাই পেতেন না। সেখানেও থিয়েটারের দল করে আড্ডা দেয়া এমন কি মেয়েদের পেছনে লাগা ইত্যাদি অপকর্মে তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতায় তাঁর অভিভাবক তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইপো অমলচন্দ্র, কিন্তু ভাইপো বলেই তিনি তাঁকে আমল দিতেন না।

সৌভাগ্যক্রমে কিরণের কলকাতা বাসের মেয়াদও অল্পে শেষ হয়ে গেল। ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে তিনি কলকাতার পাট উঠিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। অমলচন্দ্র বি· এ পাশ করতে তাঁর কলকাতা থাকার অনিশ্চয়তা দেখা দিল। অভিভাবকহীন কিরণকে তাঁর দাদা দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। কিরণের বয়স তখন ষোল বছরের মত। তাঁর বয়ঃসন্ধিকালের একটি বিচিত্র পর্ব এখানে শেষ হল।

কিরণের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও দুর্বিনীত চালচলনের খবর তাঁর দাদা অমলচন্দ্রের মারফত কিছু কিছু জেনেছিলেন। অনেক ভেবে চিন্তে কিরণকে পড়ার জন্য বরিশাল পাঠানো সাব্যস্ত হল। বরিশালে অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশনের তখন খুব সুখ্যাতি।

কিরণের দাদা অশ্বিনী বাবুকে এক চিঠি লিখলেন এবং কিরণকে বরিশালে পাঠালেন।

১৩০০ সালের ২২ চৈত্র অতি শুভ মুহূর্তে কিরণচন্দ্র বরিশাল পৌঁছালেন। এই সময় থেকেই তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। কলকাতায় তিনি গোঁসাইজীর নামই শুধু শুনেছিলেন, বরিশালেই তিনি প্রথম তাঁর আরাধ্য দেবতার পরিচয় পেলেন। কিরণচন্দ্রের ডায়েরীতে লেখা রয়েছে, 'বরিশালে গিয়াই প্রথম পতিতপাবন শ্রীশ্রীঠাকুরের খবর পাইলাম। ধন্য হইলাম।'

বরিশাল পৌঁছাবার দুইদিন পর ২৫চৈত্র মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিরণের সাক্ষাত ও আলাপ হয়। মাখনের মধুর সঙ্গ ও সহজ মিত্রতা কিরণের জীবনের পথ নির্দেশ করে দিল। প্রথন সাক্ষাতে কিরণের প্রগলভতা দেখে মাখন বললেন, 'যাই কর ভাই, ধর্মছাড়া থেকো না।' এই একটি কথায় কিরণের অন্তর্জগতে যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল, তিনি নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, আত্মস্থ হবার প্রেরণা পেলেন।

মাখনের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাত হলেও, কিরণের তিনি পারিবারিক দিক থেকে নিকট আত্মীয় ছিলেন। মাখনের আপন পিসীমা আনন্দময়ী কিরণের বিমাতা ছিলেন, আবার কিরণের বৈমাত্রেয় ভগ্নী মনোমোহিনী মাখনের বিমাতা। উত্তর জীবনে তাঁদের দুজনের পরিবারিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল, সে কথা আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যাবে। নিকষ কুলীন পরিবারের মধ্যে এ ধরণের বৈবাহিক আদান-প্রদান সে আমলে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু মাখনের সঙ্গে কিরণের যে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্য তার যোগসূত্র পারিবারিক নয়, আধ্যাত্মিক। যে সময়ে দুজনের পরিচয় হয়, তখন-ই মাখন গোঁসাইজীর কাছে সাধন প্রার্থী এবং কদিন পরই সাধনের অনুমতি তিনি পেলেন ; ১৩০১ সালের ২৩ বৈশাখ সাধন গ্রহণ করার জন্য মাখন কলকাতা রওনা হলেন। এর মধ্যে প্রায় প্রত্যহ দুজনের

দেখা-শোনা ও আলাপ হত। মাখনের চিত্ত তখন নব অনুরাগে ভরপুর, গোঁসাইয়ের কথা ও নানা সৎ প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁরা মেতে থাকতেন। তাঁদের আরেকজন বন্ধু পার্বতী চরণ ঘোষ-ও এই সদালোচনায় সঙ্গী হতেন। পার্বতীচরণও কিছুদিন পরে গোঁসাইজীর কৃপা লাভ করেছিলেন। এই সৎসঙ্গে, গোঁসাই-প্রসঙ্গে কিরণের চরিত্রের এক আমূল পরিবর্তন শুরু হল।

শুধু কি নৈতিক চরিত্র? বরিশাল পৌঁছাবার পর থেকে কিরণের সারা জীবনের স্রোত-ই এক অনুকূল পরিবেশ পেয়ে চিরবাঞ্ছিত লক্ষ্যের পথে প্রবাহিত হল। ২৮ চৈত্র তারিখ তিনি ব্রজমোহন স্কুলে ভর্তি হলেন, কদিন পরই অশ্বিনী দত্ত তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কিরণের অভিভাবকের চিঠি পেয়ে অশ্বিনী দত্ত তাঁর স্কুলের নতুন ছাত্রটির কীর্তিকলাপ অবশ্যই জেনেছিলেন। দেখা হতেও দু'চারটা মামুলী প্রশ্নের পর অশ্বিনীবাবু কিরণের কাছে এসে তাঁর গলাটি জড়িয়ে ধরে কানের কাছে বললেন,'দুষ্টুমি কর না তো?' এই আদরে কিরণ মুহূর্তের মধ্যে তাঁর বশীভূত হয়ে পড়লেন; উত্তর দিলেন, 'আর করব না।' অশ্বিনীবাবু হেসে ফেললেন, দু'জনের মধ্যে একটা ভাবের সমন্বয় ঘটে গেল। সেদিনই অশ্বিনীবাবুর বৈকালিক ভ্রমনের সঙ্গী হয়ে কিরণ জানতে পারলেন, তিনি গোঁসাইজীর মন্ত্রশিষ্য। মনে হয়, কিরণকে ধরবার জন্য গোঁসাইজী যেন বরিশালে তাঁর অনুচরদের একজন একজন করে কাজে লাগাচ্ছিলেন।

১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে গ্রীষ্মের ছুটীতে কিরণ বাড়ি এলেন, ২৯ বৈশাখ সাধন লাভ করে গোঁসাইজীর কাছ থেকে ফিরে মাখন কিরণদের বাড়ি এলেন, মাখনের কেমন যেন একটা পরিবর্তনের চিহ্ন কিরণ দেখতে পেলেন। মাখনের মুখে আর কোন কথা নেই, কেবল গোঁসাইয়ের কথা। গোঁসাই প্রত্যহ কি করেন, কি বলেন, কি ভাবে থাকেন এই সব কথা বার বার বলেও যেমন মাখনের বলা শেষ হয়না, বার বার শুনে কিরণেরও যেন তৃপ্তি হয় না। মাখন

বললেন, 'গোঁসাই নিদ্রাকে সম্পূর্ণ জয় করেছেন; একেবারেই ঘুমোন না'—শুনে কিরণের বিস্ময় জাগে—ব্যাপারটা প্রহেলিকা বলে মনে হয়।

বরিশালের সৎ পরিবেশে ও মাখনের সাধু সঙ্গগুণে কিরণ ক্রমশ নতুন মানুষ রূপে গড়ে উঠতে লাগলেন। মাখনের সাহচর্যে তিনি বরিশালের গোঁসাই-শিষ্য-মণ্ডলীর সঙ্গে পরিচিত হলেন, তাদের চরিত্র-মাধুর্যে, স্নেহ ও প্রীতির প্রভাবে গোঁসাইজীর প্রতি কিরণের একটা শ্রদ্ধা জন্মাতে শুরু করল। তখন বরিশালে যে সব গোঁসাই শিষ্যদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল তাঁরা হলেন, গোবিন্দ চন্দ্র দাশগুপ্ত, শিবচন্দ্র গুহঠাকুরতা, নবকুমার ঘোষ, গোরাচাঁদ দাস (শীল), গোরাচাঁদ দাসের পুত্র সত্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র নলিনী, লক্ষ্মীকান্ত সেন, অক্ষয় গুহঠাকুরতা, সতীশচন্দ্র রায়, দেবেন্দ্র নাথ সরকার, সুধন্য কুমার দাস, সূর্যকুমার চক্রবর্তী ও রাইচরণ চক্রবর্তী।

গোঁসাইজীর কৃপাপ্রাপ্ত এই সজ্জন মণ্ডলীর সঙ্গ প্রভাবে কিরণের দুর্দমনীয় উদ্দাম প্রকৃতি ধীরে ধীরে মাথা নত করল। এঁদের মুখে প্রায় সর্বদা গোঁসাইয়ের প্রসঙ্গ শুনে শুনে গোঁসাইজীর প্রতি কিরণের শ্রদ্ধা বাড়ল। কিরণের ইচ্ছে হল গোঁসাইয়ের একখানা ছবি এনে কাছে রাখেন। কলকাতায় বেঙ্গল ফটোগ্রাফারস্ কোম্পানীর মালিক, গোঁসাইজীর শিষ্য নীলমাধব দে-কে লিখে তিনি গোঁসাইজীর একখানা বড় ফটো আনিয়ে শিয়রে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। ১৩০১ সালের ৫ ভাদ্র পটমূর্তির রূপে গোঁসাইজী কিরণের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হলেন।

অথচ দিন দিন গোঁসাইয়ের উপর অনুরাগ বাড়তে থাকলেও তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার কোন বাসনা কিরণের এ যাবত হয় নি। মাখন যখন সাধন নেবার উদ্দেশ্যে বরিশাল থেকে ষ্টীমার যাত্রা করেন, কিরণ তাঁকে তুলে দিতে এসে একবার ভেবেছিলেন, গোঁসাইয়ের কাছে তিনিও যদি দীক্ষা নিতেন তো কেমন হত। কিন্তু না, এ চিন্তা

নিতান্তই হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যাবার ভাবনা। পরক্ষণেই তাঁর মনে হয়েছিল, মন্ত্র যদি একটা নিতেই হয়, তবে বংশের গুরুঠাকুরেই বা দোষ কী। বরিশালের গোঁসাই-শিষ্যেরা সবাই কিরণকে স্নেহ করেন, যতদূর সম্ভব তাঁর সঙ্গে মেশেন, কিন্তু কেউ-ই তাঁকে গোঁসাইজীর কাছে সাধন প্রার্থী হতে কখনও বলেন না, এমন কি এ ব্যাপারে প্রাণের দোসর মাখন-ও অদ্ভুতভাবে নীরব। কিরণও তাই ভাবেন, গোঁসাইজীকে মহাপুরুষ জ্ঞানে, সাধু মহাত্মা বলে সারা জীবন ভক্তি করবেন, তাঁর ছবি মনে মনে পূজা করবেন, কিন্তু মন্ত্র নেয়ার প্রয়োজন নেই। মন্ত্র একটা না নিলে কি আর ভক্তি করা যায় না? এতদিন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করে শেষটায় একটা মন্ত্রনিয়ে বুড়োদের মত মালা জপা কিরণের কাছে বিসদৃশ, হাস্যকর মনে হয়।

কিরণচন্দ্রের জীবনের এই সন্ধিক্ষণে, যখন তিনি সঞ্চিত সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে সত্যের আকর্ষণ অনুভব করেও তাকে ধরা দিতে পারছিলেন না, সত্যের আহ্বানে সাড়া দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন, তখন তাঁর জীবনে একটি আশ্চর্য অবির্ভাব ঘটল। আশ্চর্য কেন, বলতে হয়, যে অবধারিত ইঙ্গিতের বা প্রেরণার অপেক্ষায় গোঁসাইয়ের কাছে কিরণের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ আটকে ছিল, সেই প্রেরণা যেন শরীরী হয়ে প্রকাশিত হলেন আর কিরণ সমস্ত সংস্কার ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের বাঁধন পেরিয়ে তাঁর প্রিয়তমকে বরণ করতে পারলেন, তাঁর কাছে বাঁধা পড়লেন—কিরণ ধন্য হলেন। এই মূর্তিমতী প্রেরণা দেবী সরোজবালা।

সরোজবালার সঙ্গে কিরণের প্রথম সাক্ষাত ১৩০১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ, বৈশাখী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। কিরণচন্দ্রের স্বলিখিত 'পঞ্জিকায়' এই তিথিটির কথা বিশেষ করে লেখা আছে। বন্ধু মাখনের কনিষ্ঠা ভগ্নী এই সরোজ। গোঁসাইজীর কাছে সাধন লাভ করার পরই মাখন কিরণদের বাড়িতে এলেন, কদিন পর দুই বন্ধু মাখনদের বাড়ি ঢাকার আড়িয়লে গেলেন। সেখানেই সরোজের

প্রথম দর্শন পেলেন কিরণ। কিরণের বয়স ষোল, সরোজের তখন তের। মেয়েটি অদ্ভুত শান্ত ও নীরব। একটি বাচ্চা মেয়ের এই অসম্ভব শান্ত-শিষ্ট আচরণ কিরণের ভাল লাগেনি কিন্তু কদিনের মধ্যেই মেয়েটির এই বিচিত্র ব্যবহার কেন যেন কিরণকে আকৃষ্ট করে তুলল। তখনই সরোজ গোঁসাইয়ের কাছে সাধন-প্রাপ্তির অনুমতি পেয়েছে কিন্তু কুলীনের মেয়ে অনুকূল সংসারে বিয়ে হবে কিনা এই আশঙ্কায় সাধন নেয়া স্থগিত আছে। গোঁসাইজী আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেছেন। মেয়েটিব অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভেবে কিরণও কেন যেন চিন্তাকুল হয়ে ওঠেন।

ঐ ১৩০১ সালের-ই দুর্গাপূজার ছুটীতে কিরণ আবার মাখনের সঙ্গে আড়িয়লে এলেন। এর পরদিনই তাঁর জীবনের সেই নাটকীয় অথচ প্রত্যাদেশের মত অমোঘ ঘটনাটি ঘটে গেল। দুপুর বেলা কিরণ একা বারান্দায় বসে আছেন, হঠাৎ সেই নীরব ও নিরীহ মেয়েটি সরোজবালা এসে তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তা হলে এখনো সাধন পান নি ?' চমকে উঠে কিরণ বললেন, 'কিসের সাধন ?' কিরণের কথা শুনে সেই মেয়েটি যেন অবাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ কিরণের মুখের দিকে চেয়ে কণ্ঠে অনেকখানি বিরক্তি মিশিয়ে জবাব দিলেন, 'কি আশ্চর্য, আপনি কেমন মানুষ ?' যে মানুষ সাধন কিসের এ রকম অদ্ভূত প্রশ্ন করতে পারে তার সঙ্গে এ আলোচনা সম্পুর্ণ নিরর্থক যেন এই প্রত্যয় নিয়ে সেই মৃদুভাষিণী কিশোরী যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমন-ই নিঃশব্দে চলে গেলেন।

সরোজবালা তখনকার মত সুমুখ থেকে চলে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর অভাবিত আবির্ভাব ও তাঁর সেই ছোট্ট প্রশ্নের রেশ ক্রমশ ঢেউয়ের মত বড় হয়ে কিরণের অন্তর্জগতে যেন এক বিপ্লবের ঝড় তুলে দিল। কিরণ বুঝতে পারলেন যে সরোজ দাদা মাখনের কাছে তাঁর যে তখনো গোঁসাইজীর সাধন লাভ হয়নি জানতে পেরে সে জন্য তাঁর বিরক্তি জানিয়ে গেছে, কিন্তু কেন ? কিরণ যে সাধন নেবেন, এ

কথা তো অন্য কাউকে এমন কি মাখনকেও কখনো বলেন নি। তাছাড়া, কিরণের সাধন নেয়া না-নেয়ায় ঐ কচি মেয়েটির কি এসে যায়? এই মেয়েটিকে আবার নিরালায় পেয়ে জেনে নিতে হবে, কেন এই সাধন পাওয়া কিরণের আবশ্যক বলে সে সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু সরোজকে একান্তে পাওয়ার সুযোগ আর হয়ে ওঠে না, অথচ দিন-রাত এই সাধনের ভাবনা ভেবে ভেবে কিরণ এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করেন।

কদিন পর ৫ কার্তিক রাত্রে কিরণ, মাখন ও তাঁর মার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমিয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি স্বপ্নে দর্শন পেলেন। কিরণ একটি খরস্রোতা নদীর এ-পাড়ে, অপর পাড়ে সেই জ্যোতির্ময় জীবন্ত যুগল-বিগ্রহ, তিনি ঐ বিগ্রহের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে, পরাব কাপড় ছুড়ে ফেলে দিয়ে সাঁতার কেটে ঐ নদী পাড়ি দেবার জন্য 'ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম্' বলে ঝাঁপ দিতে যাবেন, তখন কে যেন পিছন দিক থেকে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বজ্র-গম্ভীর অথচ মমতা মাখানো কণ্ঠে বললেন, 'থামো, নিজে সাঁতরে কি কখনো নদী পেরুনো যায়?' পিছন ফিরে এই অনাহূত আগন্তুককে দেখতে চাইতেই কিরণের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরদিন ভোরে কিরণ বিছানায় বসেই আগের রাত্রের সেই অপূর্ব-সুন্দর স্বপ্নের কথা ভাবছেন, তখন আবার নিয়তির মতই যেন সরোজবালা কি যেন কাজে ঐ ঘরে ঢুকলেন। সুযোগ পেয়ে কিরণ বললেন, 'সেদিন তুমি অযথা আমায় বিরক্তি দেখিয়ে গেলে কেন? গোঁসাইয়ের কাছে সাধন চাইলেই কি পাওয়া যায়? শুনেছি, কত লোককে তিনি সাধন না দিয়ে বার বার ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমায়-ও যে ফেরাবেন না, তাঁর প্রমাণ কি?' সরোজবালা ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'সাধন পাওয়া তো মানুষের হাত নয়, সে-টি যাঁর সাধন তিনি বুঝবেন। কিন্তু সাধন প্রার্থী হবার মত সৌভাগ্য আপনার আছে বলে আমার ধারণা ছিল। তাই সেদিন বলেছিলাম, ও জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। এ সাধন না

'পেয়েও কেবলমাত্র প্রার্থী হয়ে যে মরতে পারবে তারও ভাবনা নেই। এমন করে কেন বৃথা দিন নষ্ট করছেন ?'

সরোজবালার বাণীর মধ্যে কিরণের অন্তরাত্মই যেন কথা বলে উঠল। সাধন'না পেয়েও শুধু প্রার্থী হতে পারলেই আর ভাবনা থাকে না, এমন আশ্চর্য তত্ত্ব কে কবে শুনেছে, কিরণ তো শোনেন-ই নি। কী অচলা নিষ্ঠা ও গোঁসাইজীর উপর কী অপরিসীম ভক্তি নিয়ে তেরো বছরের এই মেয়েটি—যে নিজে এখনো সাধন পায় নি—একটি ধ্রুব প্রত্যয়ের ভিত্তির উপরে দাড়িয়ে আছে, তা ভাবতে-ই কিরণের সমস্ত গ্রন্থি শিরা উপশিরা মন্থিত করে একটা অখণ্ড অনাদি ক্রন্দনের সুর ধ্বনিত হয়ে কিরণকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কিরণ নিজেকে হারিয়ে ফেললেন, হারিয়েই আবার নিজেকে পেলেন। গতরাতের স্বপ্নের কথা মাখনকে বলতেই তিনি বলে উঠলেন, 'কিরণ, আর কতকাল এমন করে দিন নষ্ট করবে ? শীঘ্র গোঁসাইয়ের চবণে আশ্রয় লও ; তিনিই পেছন থেকে তোমাকে ডেকেছেন, আয়ু তো ক্রমশ কমে ছাড়া বাড়ে না।' কিরণ শুনে কেঁদে ফেললেন। প্রাণ আর মানে না। সাতুই কার্তিক-ই তিনি সাধন প্রার্থনা করে গোঁসাইজীর নামেই এক চিঠি লিখলেন। সংস্কারের প্রাচীর পেরিয়ে কিরণের আত্মসমর্পণ, গোঁসাইজীর চিহ্নিত দাস রূপে তাঁর এই স্বরূপে অভ্যুদয়ের যিনি দিশারী তিনিই-ই দেবী সরোজবালা ; কিরণের প্রেরণা-দাত্রী, তাঁর সহধর্মিনী, সহকর্মিনী, সমমর্মিনী, সদ্‌গুরু দরবেশজীর অভিন্নাত্মা—তাঁর 'বামাঙ্গপীঠস্থিতদিব্যশক্তিম্।' মন্দির কাব্যে সাধন প্রাপ্তির ঠিক আগের অবস্থায় সাধকের বলতে হয়েছে, 'ও গো, আছে সব মোর আয়োজন, শুধু দিব্য দীপক প্রয়োজন।' সরোজবালাই কিরণের জীবনে সেই দিব্য দীপকের সন্ধান এনে দিলেন। কিরণ ধন্য হলেন, সাধন প্রার্থী হতে পারায় গৌরবে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় শান্ত হলেন।

সাধন প্রার্থনা করে আড়িয়ল থেকে কিরণ স্বয়ং গোঁসাইজীর নামে

যে চিঠি লিখেছিলেন তার কোন উত্তর এলো না। 'জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলীর পঞ্জিকায়' এ সম্বন্ধে কিরণের মন্তব্য—সময় না হইলে সাধন দুর্লভ। এই সময় হওয়াটা কি ব্যাপার, তা নিয়ে ভাবনার কথা আছে। গোঁসাইজীর সাধন যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা সকলেই পূর্ব-নির্দিষ্ট অথচ প্রার্থনা করেও তাঁদের মধ্যে সকলে না হোক অনেকেই সাময়িক ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কেন, না সময় হয়নি বলে। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর কথাই ধরা যাক। ১২৯৩ সালের ২০ ভাদ্র রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি ঢাকা ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত আর মন্দিরের বাগানে শিউলি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে গোঁসাইজী তাঁকে সস্নেহে হাত নেড়ে ডেকে বলেছেন, 'ওহে, শীঘ্র এদিকে এসো; যে বস্তু তুমি চাও, আমি তোমাকে তাই দেব।' স্বপ্ন দেখার পর কুলদানন্দ সেই শেষ রাত্রে যেন সম্মোহিতের মত ব্রহ্মমন্দিরের দেয়াল টপকে বাগানে গিয়ে সেই শিউলি গাছের নীচে অবিকল স্বপ্নের দর্শনের মত গোঁসাইজীর সাক্ষাত পেলেন, কাতর ভাবে কৃপা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু গোঁসাইজীর উত্তর হল, 'আরও পূর্বে তোমার আসা উচিত ছিল, এখন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর।' অপেক্ষাই করতে হল কুলদানন্দকে—তাঁর সাধন লাভ হল প্রায় সাড়ে তিনমাস পরে ২ পৌষ তারিখে। গোঁসাইজীর উক্তি থেকে একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়; তা হল প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য একটা নির্দিষ্ট তারিখ বা সময় ঠিক হয়ে থাকেনা, একাধিক শুভ সময় তার পক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় হরিদাস বসু মশাইয়ের বেলায়।

হরিদাস বাবু প্রথম যেদিন গোঁসাইজীর সঙ্গে দেখা করে দীক্ষা নেবার কথা বললেন সেই দিনই রাত আটটায় তাঁকে আসতে বললেন গোঁসাইজী। হরিদাস বাবু এলেন না সে রাত্রে, পরদিন সকালে গেলে গোঁসাইজী বিরক্তি প্রকাশ করে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বেশ কিছুদিন

পরে আবার যখন তিনি মিডিয়াম সুশীলার নির্দেশে গোঁসাইজীর কাছে গিয়ে সাধু অঘোরনাথের দোহাই দিলেন তখন গোঁসাইজী যা বললেন তা বর্তমান প্রসঙ্গে বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ, বললেন, 'অসময়ে কিছু হয় না। এখন আশ্বিন মাস, সম্মুখে যে আমগাছ দেখিতেছেন ইহার শিকড়, গুঁড়ি, ডালপালা সমস্ত চিরিয়া দেখুন, কোথাও একটি আমের গুটী দেখিতে পাইবেন না। আবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখিবেন, এই বৃক্ষ আমে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সময় না হইলে কিছু হয় না। সময় উপস্থিত হইবে, তিথি নক্ষত্রের যোগ হইবে তবে সাধন হইবে। আপনি এখন বোলপুর ফিরিয়া যান। সময় উপস্থিত হইলে আমি আপনাকে সংবাদ দিব।' দেখা যাচ্ছে প্রথম সাক্ষাতের দিন রাত্রেই হরিদাসবাবুর সাধন পাওয়ার শুভ সময় ছিল আবার পরক্ষণেই সে সময় আর রইল না। সুসময়ের জন্য তাঁকে আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হল। আবার গোঁসাইজী সাধন প্রাপ্তির জন্য তিথি নক্ষত্রের যোগের কথাও উল্লেখ করলেন। অথচ শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গে গোঁসাইজীর উক্তি, 'সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। সেখানে কোন প্রকার কালাকাল, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই; তাহা সম্পূর্ণ কৃপা সাপেক্ষ।' যদি কালাকালের বিচার-ই না থাকে তবে সময়-অসময়, তিথি-নক্ষত্রের যোগ এ সব প্রশ্ন আসে কেন? এ রহস্যের একমাত্র সমাধান এই হতে পারে যে পাঁজির হিসাবে সুসময় বা শুভ তিথি-নক্ষত্রের যোগাযোগ সদ্‌গুরু সাধনের বিচার্য বা প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। প্রত্যেক সাধন প্রার্থীর আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক কোন কোন মুহূর্ত আসে যে মুহূর্তে সাধন তার হৃদয়তন্ত্রীতে যথার্থ সাড়া তুলতে পারে। সাধনদাতা ঐ মুহূর্তটিকে বেছে নেন, সাধন প্রার্থীর অজ্ঞাতেই প্রায়শ এটা ঘটে। এ কথা অবশ্য মানতেই হবে যে সদ্‌গুরুর সাধন যা সম্পূর্ণ ভগবানের কৃপার দান সে ব্যাপারেও ভগবানের অনিয়ম নেই, সুনির্দিষ্ট কিন্তু সাধারণত অপ্রকাশ্য একটা নিয়ম ও শৃংখলার সূত্রে সদগুরু ভগবানের লীলা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভগবান কর্ম করে নিয়মানুসারে।
তাঁহার নিয়মে বাধ্য রাখিবে সবারে।
অধ্যাত্ম জগতে বর্তে তাঁহার নিয়ম।
রেখা মাত্র নাহি হয় তার ব্যতিক্রম॥

(শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত)

পরিণত জীবনে কিরণচন্দ্র যখন দরবেশজী রূপে গোঁসাইয়ের সাধন দিতে শুরু করেন তখনও এই সময়-অসময়ের প্রসঙ্গ বারে বারে উঠেছে। প্রার্থনা মাত্র-ই এমন কি মুখ ফুটে প্রার্থনা না করতে-ই অনেক ভাগ্যবান তাঁর কৃপা পেয়েছেন তেমনি কাউকে তিনি অনেকবার প্রত্যাখ্যান করে তবে সাধন দিয়েছেন আবার সাধনের প্রতিশ্রুতি পেয়েও অনেককে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে সাধন পাবার জন্য ; এই অন্তবর্তী সময়ে কাউকে ব্রহ্মচর্য করতে হয়েছে, তুলসী সেবা করতে হয়েছে মহানাম জপ করতে হয়েছে—'সময়ের' জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়েছে, প্রস্তুতি করতে হয়েছে।

ডাক্তার নীরদ বরণ বর্মণ যিনি উত্তরজীবনে সন্ন্যাস নিয়ে নারায়ণদাসজী হয়েছিলেন তিনি দরবেশজীর কথা শোনেন কেদার মণ্ডল মশাইয়ের কাছে। কেদার মণ্ডল কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য, চিৎপুর অঞ্চলে আটঘরের ঘরাণার বিখ্যাত ক্ষতচিকিৎসক ছিলেন।

কেদার গোঁসাইজীর সেই আশ্চর্য শিষ্য লাল ছিলেন, একথা দরবেশজীর কাছে অনেকেই শুনেছেন। কেদার মণ্ডল আটঘরের নিয়মে যে সব ক্ষত বা ঘায়ে অস্ত্রোপচার করতেন সদ্য পাশ করা নীরদ ডাক্তারকে তিনি অ্যানেস্থেশিয়া দেবার সহকারী হিসাবে সঙ্গে নিতেন। কেদার ও নীরদ দু'জনে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর ফিশ্চুলা-ও অপারেশন করেছিলেন। দুজনের সখ্য খুব গভীর হয় এবং একই ভাড়া বাড়িতে তাঁরা অনেকদিন একত্রে বসবাস করেন। কেদার নীরদকে নিয়ে এলেন চুণাপুকুরে দরবেশজীর কাছে। দরবেশজীর পরণে

ছোট কাপড়, খালি গা, হাতে থেলো হুঁকা নিয়ে তামাক খাচ্ছেন। দৃশ্যটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা উঠতি ডাক্তার নীরদের কাছে মোটেই রুচিকর হল না। অথচ কেদার এমন করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে এসেছেন, বলতে মন না চাইলেও নীরদকে বলতে হল, 'আমি আপনার কাছে দীক্ষা নেব।' দরবেশজী বললেন, 'না, তা কেন হবে ? আপনারা উচ্চ শিক্ষিত লোক, আমার কাছে দীক্ষা নেবেন কেন ?' আর কথা হলো না, রাস্তায় বেরিয়ে এসে কেদার নীরদকে যথেষ্ট বকলেন, অমন করে কি কেউ সাধন প্রার্থনা করে নাকি। নীরদের সাধন হল না, দরবেশজী-ও কলকাতা ছেড়ে পুরী চলে গেছেন। কিন্তু এর পর থেকে নীরদের ভাবান্তর শুরু হল। রাত-দিন দরবেশজীর কথা আর মন থেকে তাড়াতে পারেন না। কেদারের কাছে ক্রমাগত খবর নেন তিনি আবার কখন কলকাতায় আসবেন। পুরী থেকে ফিরে কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে নীরদ আবার যান দরবেশজীর কাছে। এবার সাধন চাইতেই অনুমতি—এতদিনে নীরদের সময় হয়েছে। এই চুনাপুকুরের বাসাতে-ই নীরদ সাধন পেলেন—সাধনের সময় তিনি দরবেশজীর পরিবর্তে গোঁসাইজীর দর্শন পান ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

এই নীরদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে প্যারীমোহন পোদ্দার ও অনাথবন্ধু রায় দরবেশজীর কৃপা লাভ করেন। বড়বাজারে অনাথের লীজ নেয়া একটা বাড়িতে প্যারী ও নীরদ উভয়েই ভাড়া নিয়ে সপরিবারে থাকতেন। একবার কলকাতায় এসে দরবেশজী নীরদের বাসায় বেড়াতে এলেন। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে এসে প্যারী ঐ সাধুটির কথা শুনলেন এবং নিতান্ত জোর করে সেই রাতেই নীরদের সঙ্গী হয়ে তিনি দরবেশজীর সঙ্গে সাক্ষাত করে সাধন প্রার্থনা করেন। পরদিন সকালেই সাধনের সময় ঠিক হয়। অনাথ বাড়ি ফিরলেন আরও রাতে। তাঁকে কিছু বলা হল না বলে তাঁর অভিমান হল। নীরদের স্ত্রীকে অনাথ মা বলতেন, নীরদের উপর তাঁর যেন একটা

দাবী ছিল, অথচ তাঁকে কিছু না জানিয়ে প্যারীকে সাধুর কাছে নিয়ে যাওয়াটা অনাথের ভাল লাগে নি। পরদিন সকালে অনাথ চানটান করে সেজেগুজে বসে রইলেন। সস্ত্রীক প্যারী ও নীরদ ঘোড়ার গাড়ি করে সাধনের আসরে রওনা হচ্ছেন। অনাথ অনেকটা নাছোড়বান্দার মত তাদের সঙ্গী হতে চাইলেন। অনাথের ভাড়া বাড়িতে ওঁরা থাকেন তাঁকে চটানো চলে না তাই নিরুপায়ের মত অনাথকে সঙ্গে নিলেন তাঁরা। সাধন আরম্ভ হতে দেরী ছিল। দরবেশজীর বিশেষ অনুমতি নিয়ে অনাথকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হল। দরবেশজী সহাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। একটু পরেই সাধন প্রার্থীদের তালিকা তৈরী করে একজন দরবেশজীকে পড়ে শোনালেন—প্রার্থীরা সবাই আগে থেকেই অনুমতি পেয়ে এসেছেন। কিন্তু দরবেশজী বললেন যে তালিকায় প্রার্থীদের যে সংখ্যা হয়েছে তার চেয়ে একজন বেশি হবে। নতুন করে তালিকা মেলানো চলতে লাগল। অনাথ দোতলা ছেড়ে একতলায় গিয়ে বসলেন। দরবেশজী এবার সাধন দিতে উঠবেন। বেশ কিছুক্ষণ পর একজন এসে অনাথকে ডেকে উপরে নিয়ে গেল, তাঁর-ও নাকি সাধন হবে। তালিকার সংখ্যা ও দরবেশজী কথিত মোট প্রার্থীর সংখ্যা যখন কিছুতেই মিলল না তখন সাধনের আসরে বসে দরবেশজী বললেন, 'নীরদের সঙ্গে যে ছেলেটি এসেছে সে-তো সাধন পাবে, তাকে ডাক।' বিনা প্রার্থনায় অযাচিত সাধন পেলেন অনাথবন্ধু—পাবেন-ই তো, তার যে সময় হয়ে গেছল! এ যেন এক নতুন ধরণের সময় হওয়া।

ভুজঙ্গ ভূষণ মুখুজ্যের এই সময় হওয়ার কাহিনীটি বড় মজার। ভুজঙ্গ তখন পুরুলিয়া স্কুলে পড়েন। তাঁর এক সহপাঠি বন্ধু দরবেশজীর শিষ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ছেলে খগেন্দ্র নাথ মিত্র খবর দিলে এক বড় সাধু এসেছেন পুরুলিয়ায় এবং ঐ সাধুর কাছে পরদিন সকালে তার সাধন হবে। ভুজঙ্গ খগেনের সঙ্গে সাধু দেখতে দরবেশজীর কাছে এলেন, বল্লেন, 'কাল আমিও সাধন নেব।' দরবেশজী বললেন, 'না,

কাল তো তোমার সাধন হবে না। তোমার এখনো সময় হয় নি।' ভুজঙ্গ উত্তর করলেন, 'কেন, খগেনের যদি হতে পারে তবে আমার কেন হবে না। ওর চেয়ে আমি কোনও বিষয়ে কম মার্কস্ পাইনি। অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজী আপনি প্রত্যেকটিতে দুজনের নম্বর দেখে নিন।' হো হো করে হেসে উঠলেন দরবেশজী, বললেন, 'না, তোমারও হবে তবে এখন নয়।' সময় তখনো হয়নি ভুজঙ্গের—সাধন পেতে তাঁর আরও দীর্ঘ কয়েক বছর তাঁর কলেজ জীবন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল।

এই সময় হওয়ার আরও একটি অভিনব কাহিনীর নায়ক বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাই। বিমলচন্দ্র দরবেশজীর পৈতৃক দেশ ফরিদপুরের খালিয়া গ্রামের সরকারী ডাক্তার ছিলেন, সপরিবারে খালিয়াতেই বাস করতেন। দরবেশজীকে তিনি জমিদার চাটুজ্যেবাড়ির ছোটবাবু বলে জানতেন। দরবেশজী বাড়ি এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, দরবেশজী সরকারী ডাক্তারের প্রাপ্য সম্মান দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতেন। সাধু জেনেও দরবেশজীর কাছে সাধন প্রার্থনা করার কথা বিমলচন্দ্রের কখনো মনে আসে নি। বরং দীক্ষা গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে তিনি একবার নৌকা করে সন্তদাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা করতে রওনা হয়েও কচুরীপানায় খাল একদম বন্ধ হয়ে যাবার দরুন বাড়ি ফিরে আসেন। সেবার দরবেশজী খালিয়া এসেছেন খবর পেয়ে বিমলচন্দ্র সকালবেলা রোগী দেখতে বেরোবার মুখে চাটুজ্যে বাড়ি এলেন। দরবেশজী রীতিমাফিক ডাক্তারবাবুকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর কেউ এসে দরবেশজীকে জানালেন যে সাধন দেবার আয়োজন করা হয়ে গেছে; সেদিন পূর্বনির্দিষ্ট প্রার্থীদের সাধনের দিন ছিল। হঠাৎ বিমলচন্দ্রের কী ভাব হল, তিনি দরবেশজীকে বলে বসলেন, 'আমার সাধন হবে না?' দরবেশজীর উত্তর, 'হবে'। বিমলচন্দ্রের দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'কোথায় হবে?' দরবেশজীর তৎক্ষণাৎ উত্তর, 'এখানেই।' বিমলচন্দ্র

আবার বললেন, 'কখন ?' দরবেশজী প্রশ্নোত্তরের সমাপ্তি টেনে বললেন, 'আজকে, এখনই।' ব্যস্, তক্ষুণি সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। দেখা করতে আসার আগে বিমলচন্দ্র সাধন প্রার্থনা করার কথা বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন নি। বিমলচন্দ্রের স্ত্রী প্রিয়বালা দেবীকে আনতে তখন লোক পাঠান হল। তিনি তখন সবে পাড়াগাঁর নিয়মমত সকালের ভাতটাত খেয়ে চান করতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে নিয়ে আসা হল। তিনি দরবেশজীকে বললেন, 'আমি তো ভাত খেয়ে ফেলেছি, কি করে দীক্ষা হবে ?' দরবেশজী বললেন, 'তাতে কি হয়েছে ? আমারও ভাত খেয়ে সাধন হয়েছিল। আমি যখন বৃন্দাবনে গোঁসাইয়ের কাছে পৌছালাম তখন বেশ কদিনের না-খাওয়া। গোঁসাই তখনি আমার জন্য ভাতের ব্যবস্থা করে খাওয়ালেন। সেই রাতেই আমার সাধন হল।' বিমলচন্দ্রের ও প্রিয়বালার সাধন পাওয়ার 'সময়' এমনি করে আকস্মিক ভাবে এসে গেল। দুজনে ধন্য হলেন। এই খালিয়াতেই সময় হওয়ার এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার সাক্ষী ছিলেন নলিনীকান্ত দে। নলিনী যখন বালক তখন একখানা পুরোনো বই-য়ে তিনি তাঁর ঢাকার গ্রামে বসে দু'টি জাতিস্মর ছেলের কথা পড়েন। ছেলেবেলার কৌতূহলে তিনি ঐ ছেলে দুটির যে ঠিকানা বইতে ছিল সেই ঠিকানায় কাশী, ২০৭ মদনপুরায় একখানি চিঠি লেখেন। বইটি যে কত পুরোনো, ঠিকানা যে পাল্টাতে পারে এ সব প্রশ্ন নলিনীর মাথায় আসে নি। চিঠি পৌঁছাবার কিছুদিন আগে পর্যন্ত দরবেশজী কাশীতে ঐ ঠিকানায় কিছুদিন বাসা ভাড়া করে ছিলেন। নলিনীর চিঠি দরবেশজীর নতুন ঠিকানায় তাঁর কাছে বিলি হল। দরবেশজী ঐ চিঠির উত্তর দেন এবং ক্রমশ নলিনীর সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের মাধ্যমে একটা পরিচয় গড়ে ওঠে। এর কয়েক বছর পরে দরবেশজী নলিনীকে লিখলেন যে তিনি তার দেশের বাড়ি খালিয়া যাচ্ছেন, নলিনী গিয়ে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। নলিনী রওনা হলেন কিন্তু তিনি ষ্টীমার থেকে নৌকায়

দীর্ঘ পথ হয়ে কী করে খালিয়া পৌঁছাবেন তা জানতেন না। আশ্চর্যভাবে ষ্টীমারে দরবেশজীর সংসার জীবনের একটি আত্মীয়ার সঙ্গে নলিনীর পরিচয় ঘটে এবং ওঁদের সঙ্গে খালিয়া আসতে তাঁর কোন অসুবিধা হল না। দরবেশজীর সঙ্গে নলিনীর এই-ই সাক্ষাত পরিচয় হল। দিন কাটে, নলিনী খান দান, দরবেশজীর দু'একটা ফরমাশ খাটেন কিন্তু আর কোন কিছু ঘটে না। একদিন বিকেলে দরবেশজী নলিনীকে নিয়ে গ্রামের সুরেন চাটুজ্যে মশাইয়ের বাড়ি কীর্তন শুনতে রওনা হলেন। ঐ বাড়ির সামনে এসে হঠাৎ দরবেশজী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং কীর্তনে না গিয়ে সোজা নলিনীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন ; বললেন, 'গোঁসাই বললেন, এক্ষুণি তোমাকে সাধন দিতে হবে।' তখনি নলিনীর সাধন হয়ে গেল। দরবেশজী নিজেও যেন জানতেন না যে নলিনীর সময় হয়ে গেছে, জানলে তিনি কীর্তন শুনতে গিয়ে এ রকম ফিরে আসবেন কেন ? এত আলোচনাতে-ও যেন সময় হওয়ার বিচিত্র রহস্যের কোন হদিস পাওয়া গেল না। সময় না হলে এ রহস্য বোঝারই বা সাধ্য কি ?

সময় হয়নি বলে কিরণ সাধনের অনুমতি পেলেন না, চিঠির কোন উত্তর-ও পেলেন না। কিন্তু তবু নিছক সাধন-প্রার্থী হওয়ায় সুখে তাঁর চিত্ত ভরে উঠল। বরিশাল ফিরে এসে তিনি সৎপ্রসঙ্গ নিয়ে মেতে রইলেন। গোঁসাইজীর উদ্দেশ্যে এ সময় তিনি অনেক গান রচনা করেন, এ গানের অনেকগুলো পরে তাঁর বিজলী সঙ্গীত বই-য়ে প্রকাশিত হয়েছে। গোঁসাই অনুরাগীরা কিরণের এ সব মুগ্ধ হন। পৌষ মাসের গোড়ার দিকে কিরণ খবর পেলেন, গোঁসাইজী সশিষ্য শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করবেন। শুনে তিনি বড় বিচলিত হয়ে পড়েন, যদি বৃন্দাবন যাবার আগেই তিনি সাধন না পান তবে তো আর তেমন আশা নেই। এই ভাবনায় চঞ্চল হয়ে ১৩০১ সালের ৮ পৌষ তিনি যোগজীবন গোস্বামীর নামে সাধন প্রার্থী হয়ে আবার চিঠি দিলেন। ১২ পৌষ চিঠির উত্তর পেলেন, পশ্চিম থেকে ফিরে এলে কিরণের সাধন

হবে। এ উত্তরে কিরণ আরও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। অত দূরদেশ থেকে গোঁসাই কবে ফিরবেন আর কবেই বা তাঁর সাধন হবে। এ সব ভাবতে ভাবতে বৃন্দাবন যাত্রার আগেই একবার গোঁসাইজীর শ্রীমূর্তি দর্শন করার জন্য তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। সাধন পান কি না পান অন্তত একবার দর্শন করে জীবন সার্থক করা নিতান্ত কর্তব্য মনে হল, কী জানি এর পর জীবনে হয়তো দর্শনও ঘটে উঠবে না।

মাখনের পরামর্শে কিরণ বরিশালে গোঁসাইয়ের শিষ্য সোনাকান্ত বসু-র দ্বারস্থ হলেন। সোনাকান্ত অর্থের অভাবে কলকাতায় যেতে পারছিলেন না। কিরণ তাঁর পাথেয় দিতে রাজী হয়ে সোনাকান্তর সঙ্গে ১৫ পৌষ কলকাতা রওনা হলেন। পরদিন ১৬ পৌষ শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে স্টেশন থেকে সোজা ১৪।২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছে কিরণ জীবনে প্রথম তাঁর আরাধ্য দেবতা গোঁসাইজীকে দর্শন করলেন। 'কী শান্ত সৌম্য মূর্তি, দেখিলে চোখ ফেরানো যায় না।' ১৬ পৌষ থেকে ২০ পৌষ এই পাঁচদিন কিরণ রোজ খাওয়া দাওয়া করতে ভাইপোর বাসায় আসা যাওয়া ছাড়া অন্য সময় গোঁসাইয়ের দিকে চেয়ে বসে থাকেন, বসেই থাকেন। এর মধ্যে একদিন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী কিরণকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি দীক্ষাপ্রার্থী কিনা। কিরণ বললেন, 'ছিলাম, কিন্তু এখন মন ফিরে গেছে।' মন ফেরার কারণ জানতে চাইলে. কিরণ বললেন, 'এমন সৌম্যমূর্তি মহাপুরুষ, ইনি কি আর আমাকে দীক্ষা দেবেন ?' কিরণের সায় নিয়ে ব্রহ্মচারী গোঁসাইজীকে কিরণের কথা জিজ্ঞেস করলেন। গোঁসাই বললেন, 'পূর্বে কোন চিঠি দিয়েছিলেন কি ?' কিরণ বললেন, 'হ্যাঁ চিঠি দেয়া হয়েছিল এবং উত্তরে জানিয়েছিলেন যে বৃন্দাবন থেকে ফেরার পর দীক্ষা দিবেন।' গোঁসাই বললেন, তবে তো জবাব দেয়া-ই হয়েছে। এই পাঁচদিন গোঁসাইয়ের দর্শনে ও সঙ্গে কাটিয়ে কিরণ বরিশাল ফিরে এলেন। কিন্তু তার মন আরও যেন ব্যাকুল

হয়ে উঠল। সর্বদা সেই শ্রীমূর্তি তাঁর চোখে ভাসতে লাগল, তাঁর মনে হল গোঁসাইকে না দেখে তিনি আর বাঁচবেন না।

মাঘ মাসের প্রথম কিরণ খালিয়ায় এলেন। তাঁর ভ্রাতৃবধূ অমলচন্দ্রের মা প্রসন্নকালী পরলোক গমন করলেন, সমস্ত সংসারে শোকের ছায়া। কিরণের দাদা ও মা দু'জনে কাশী রওনা হয়ে গেলেন এবং মাসখানেক পর বৈশাখের প্রথম তাঁরা বাড়ি ফিরে এলেন। এই এক মাসে হঠাৎ কিরণের পুরোনো উচ্ছৃংখল বৃত্তিগুলো যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—আবার তিনি যেন আত্মবিস্মৃত হলেন। ১৩০২ সালের ২৬ বৈশাখ কিরণ হঠাৎ দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ১৮ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভুগে উঠলেন। গোঁসাইজী উত্তরকালে কিরণকে বলেছিলেন, ঐ জ্বর সাধারণ জ্বর ছিল না, ওটা ছিল অনুতাপাগ্নি। জ্বরের পরও নিস্তার ছিল না। ৩১ জ্যৈষ্ঠ কিরণ সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে জীবনে প্রথম মদ্যপান করলেন। অন্ধকার পর্বের এই-ই শেষ অধ্যায়।

এর পরই কিরণের জীবনে যুগান্তর ঘটে গেল। সমস্ত জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর চারদিকে নেচে বেড়াতে লাগল। দিনের খাওয়া রাতের ঘুম বন্ধ হয়ে গেল কিরণের। এক মর্মদাহী জ্বালা নিয়ে কোন এক অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে কিরণ ৬ আষাঢ় কলকাতা চলে এলেন। গোঁসাইজী ইতিমধ্যে ৯ ফাল্গুন বৃন্দাবন রওনা হয়ে গেছেন। গোঁসাই-হীন কলকাতায় কিরণ উন্মাদের মত হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল গোঁসাইকে-ই যদি না পেলেন তবে বেঁচে থেকে আর লাভ কি? ১২ আষাঢ় মঙ্গলবার গভীর রাতে কিরণ বাসা থেকে বেরিয়ে গঙ্গায় জগন্নাথ ঘাটে আত্মবিসর্জন করতে উপস্থিত হলেন। তিনি গঙ্গায় নেমে মনে মনে ভাবছেন, এখনো কি গোঁসাই টেনে নেবেন না। হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে গোঁসাইজীর প্রকাশ হল, তিনি ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে অঙ্গুলি সংকেতে 'আস' বলে কিরণকে আহ্বান করলেন। কিরণ কী করে গঙ্গা

পার হলেন তা আর তাঁর মনে নেই। সম্বিত হতে দেখলেন তিনি ভিজা কাপড়ে রেল লাইন ধরে বৃন্দাবনের পথে হাঁটছেন। তাঁর চোখের সামনে গোঁসাইজীর সেই নয়নবিমোহন জ্যোতির্ময় রূপ, দু'চোখের অবিরল অশ্রু দিয়ে সেই শ্রীমূর্তির চরণ ধুয়ে দিতে দিতে কিরণ বৃন্দাবনের পথে চলেছেন। যুগযুগান্ত ধরে জন্মজন্মান্তরে কিরণ বৃন্দাবনের দিকে চেয়ে কত পথ হেঁটেছেন, কত নদ নদী বন উপবন পেরিয়ে গেছেন, কত চোখের জলে চলার পথ ভিজিয়ে দিয়ে গেছেন—কিন্তু পারেন নি সেই বৃন্দাবনে পৌঁছাতে যে বৃন্দাবনে গোঁসাই আছেন, যে বৃন্দাবনে সদ্‌গুরু গুরু-কৃষ্ণ বসে রয়েছেন কিরণের পথ চেয়ে, কখন কিরণের সময় হবে, কখন তিনি কাছে পেয়ে আদর করবেন তাঁর যুগযুগান্তরের চেনা কিরণকে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণঠাকুর বাঁশীর তানে ডাকেন, ডেকে-ও কত বাঁধা কত গুরুগঞ্জনার বেড়া দিয়ে কাছে আসতে দেন না—কেবল নাকি কাঁদান, কাঁদাতেই তাঁর নাকি ভাল লাগে। এ কাঁদা কিরণ-ও তো কত কেঁদেছেন। এবার কিরণের বৃন্দাবনে গুরু-কৃষ্ণ বসে তাঁকে ডাকছেন, গুরু-কৃষ্ণ তো কাঁদান না, সবসময় কাছে কাছে রাখেন, প্রতিনিয়ত বুকে বুকে থাকেন, শ্বাসে-প্রশ্বাসে অণুপরমাণুতে মিশে থাকেন। কিরণের এবারকার পথ চলা তাই আগের মত নয়, তাঁর এবারকার কাঁদা আর এক নতুন রকমের কাঁদা।

'নয়নে কৃষ্ণ নয়ন-তারা হৃদয়ে মোর রাধা প্যারী।'

গুরু-কৃষ্ণ গোঁসাইজী কিরণকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিশ্চিন্তে বৃন্দাবনে বসে থাকলেন না—বৃন্দাবনের যাবার পথে পথে তাঁর আদরের কিরণের জন্য অপূর্ব মমতায় সব ব্যবস্থা করে রাখলেন। হয়তো এ বর্ণনা ঠিক হল না, গোঁসাইজী-ই যেন কিরণের সাথে সাথে বৃন্দাবন চললেন। রেল লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে পরের দিন ১৩ আষাঢ় বেলা বারোটা নাগাদ কিরণ বালী পৌঁছে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে রেল লাইনের পাশে বসে পড়লেন। স্থানীয় এক ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁকে

দেখতে পেয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্নান-আহার করান। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় কিরণ প্রথমে ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারেন নি, একটু স্বাভাবিক হতেই দেখলেন উনি তাঁর পূর্বপরিচিত। কিরণকে ঐ অদ্ভুত অবস্থায় পেয়ে তিনি কিরণের ভাইপো-কে খবর দেবার জন্য ব্যগ্র হলেন, কিরণকে-ও বাড়ি ফেরার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিরণ তাঁর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য অবিলম্বে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে ষ্টেশনে চলে এলেন। ঐ ভদ্রলোক অনেক চেষ্টা করেও কিরণকে কিছু টাকা দিতে পারলেন না, অনেক সাধ্য-সাধনায় কিরণ তাঁর কাছ থেকে বিন্ধ্যাচলের একটি ট্রেন-টিকিট মাত্র নিলেন। ঠিক বিন্ধ্যাচলের টিকিট কেন নিলেন, কিরণ তা তখন জানতেন না। পরের দিন ১৪ আষাঢ় বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনে নামতেই একটি ভদ্রলোক এসে বললেন যে তিনি কিরণকে বিন্ধ্যাচলের যোগমায়া দেবীর মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়ে এসেছেন। বিন্ধ্যাচলের টিকিট নেবার রহস্য কিরণের কাছে উদ্‌ভাসিত হল। যোগমায়া দেবীর মন্দিরে গিয়ে ভদ্রলোকটি অদৃশ্য হলেন, আর কিরণ মন্দিরের অভ্যন্তরে মাতা যোগমায়ার মূর্তি-ই যেন দর্শন করলেন। কিরণের খোলা চোখের সামনে মন্দিরের দেবী যোগমায়া মাতা যোগমায়ার রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন, আবার চোখ বুজলে অন্তরেও সেই করুণাময়ীর শ্রীমূর্তি প্রকটিত দেখতে পেলেন। কিরণের মনে হল, মা যেন বলছেন, ভয় কি ? অন্তরে বাহিরে আমি তোমায় শান্তিরূপা জননী, তোমাকে পথ দেখিয়ে চলেছি, মা ভৈঃ। কিরণ মূর্চ্ছিত হয়ে মন্দির তলে পড়ে গেলেন।

মাতা যোগমায়ার দর্শন কিরণ এই প্রথম পেলেন—কিন্তু এই দর্শন ও এই কৃপা না হলে তো গোঁসাই-লাভ হতে পারে না। 'কিরণ অবোধ ছেলে, নে মা কোলে, তুই দিলে মিলে গোঁসাই।' বিজলী সঙ্গীতে কিরণ-ই এ কথা লিখে গেছেন। বৃন্দাবন যাত্রার পথে বিন্ধ্যাচল না পোঁছানো পর্যন্ত এ তত্ত্ব কিরণ-ও জানতেন না। মা যোগমায়া তাই তাঁর স্নেহের ছেলে কিরণ-কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দর্শন দিয়ে

গোঁসাই-প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত ও সুগম করে দিলেন। 'দরবেশ দর্শনে' দরবেশজী তাই একটি পত্রে লিখেছেন, 'মাতা যোগমায়া কৃপার আধার। গোঁসাইয়ের দয়া মাপাজোখা ; কিন্তু মায়ের দয়া অজস্র, অসীম।'

যোগমায়া দেবীর মন্দিরে কিরণের যখন মুর্চ্ছা ভাঙল তখন পূর্বের দর্শনের দৃশ্য অন্তর্হিত হয়েছে। কিরণ কাঠুরেদের চলা পথ ধরে বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে উঠে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে পৌঁছালেন। মন্দিরের পূজক বললেন, জটাজুটধারী একটি সাধু এসে এক্ষুণি তোমার কথা বলে গেলেন; তুমি আজ এখানেই প্রসাদ পাবে। কিন্তু সেই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরেব সামনে কিরণের কাছে একটি অপূর্ব হিরণ্ময় মন্দির প্রকাশিত হল, সেই মন্দিবের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, গোঁসাইজী ও মাতা যোগনায়া যুগল মূর্তিতে বসে আছেন এবং কিরণকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। কিরণ আত্মহারা হয়ে গেলেন, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেলেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করতে করতে কিরণ সেই পার্বত্য পথ ধরে ছুটাছুটি করতে করতে পথ হারিয়ে ফেললেন কিন্তু তাঁর মনশ্চক্ষে তখনো সেই হিরণ্ময় মন্দিরে অধিষ্ঠিত শিব-পার্বতী রূপে গোঁসাইজী ও যোগমায়া।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে বরিশাল স্কুলে পড়তে গিয়ে কিরণ জীবনে প্রথম গোঁসাইজীর সন্ধান জানতে পারেন; আর যোগমায়া দেবী ১২৯৭ সালের ১০ ফাল্গুন মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বৃন্দাবন ধামে অপ্রকট হন। কিরণের সঙ্গে যোগমায়া দেবীর কখনো চাক্ষুষ সাক্ষাত ঘটে নি। অথচ মায়ের এমন-ই অহৈতুকী দয়া যে গোঁসাইজীর কাছে সাধন পাবার আগেই তিনি নিজে থেকে কিরণকে দর্শন দিলেন, মাভৈ বাণী শোনালেন। শুধু তাই নয়, যোগমায়া দেবীর মন্দিরে প্রথমে তিনি একক ভাবে দর্শন দিলেন, পরক্ষণেই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে তাঁর যথার্থ স্বরূপে অর্থাৎ সদ্‌গুরু শক্তি রূপে, সদ্‌গুরু গোঁসাইজীর শক্তিরূপে যুগল মূর্তিতে দেখা দিলেন। এই ঘটনায় যুগপৎ অনেক তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

সদ্‌গুরু ও তাঁর শক্তি এ তত্ত্বটি কি এ বিষয়ে 'দরবেশ দর্শনে' প্রাকাশিত দু'খানা পত্রে দরবেশজী ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত ১।২৩ নম্বর পত্রাংশে তিনি লিখেছেন, 'শিব পার্বতী মিলিত যে রূপ তাহাই সদ্‌গুরুর রূপ। উরুর উপরে শক্তি বসিয়া আছেন, ইহাই সদ্‌গুরু, অথচ ইহা রাধাকৃষ্ণের মত যুগল নহেন। * * * এ শক্তির পৃথক কোন সত্তা নাই। কেবল বামাঙ্গে শক্তি না থাকিলে ধ্যানমত মূর্তি পূর্ণ হয় না বলিয়াই বামাঙ্গে উরুর উপর শক্তি। * * * গোঁসাই সদ্‌গুরু অবতার। তিনি সম্পূর্ণ একক। কিন্তু তাঁহার 'বামাঙ্গ পীঠ-স্থিত-দিব্যশক্তিং।' আবার ১৩।১৪ নম্বর পত্রাংশে তিনি বলছেন, 'রাধাকৃষ্ণ ও সশক্তি গুরু একই, অথচ রাধাকৃষ্ণের মত যুগল নহেন। * * * শ্রীগুরু-শক্তি latent, পৃথক স্থাপনা বা পূজা নাই। তাঁহাকে বসাইতে হইলেই শ্রীগুরুর উরু লইয়া আসিতে হইবে। গুরু-শক্তির পৃথক ধ্যান, মন্ত্র, পূজা কিছুই নাই; অথচ ইনি না হইলে, রক্তবর্ণা না থাকিলে তুমি নিষ্ক্রিয় শ্বেতবর্ণ গুরুর দ্বারা কোন কাজ পাইবে না। যদি শ্রীগুরুর মরদেহ বিবাহিত না হন তবে শিষ্যকে মুস্কিল হইতে বাঁচাইবার একটা কৌশল বটে।' মোটামুটি ব্যক্তব্য এই যে শ্রীগুরু ভগবান স্বরূপত ত্রিগুণাতীত, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। ত্রিগুণ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যে আদিগুণ থাকেন, শ্রীগুরু সেই আদিগুণ তমো-তে শ্বেতবর্ণে বিরাজিত থাকেন। এই তমো যখন ত্রিগুণে পরিণত হবার জন্য স্পন্দন অনুভব করেন, তখন সেই সত্ত্ব ও রজ বের হয়ে পৃথক হয়ে পড়েন, এই রজ-ই রক্তবর্ণা শক্তি রূপে শ্রীগুরুকে কর্মে অর্থাৎ জীব উদ্ধারে প্রবৃত্ত করান। প্রথমত, তাই সদ্‌গুরু শক্তি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সদ্‌গুরু থেকেই উদ্ভূতা, সদ্‌গুরুর-ই অন্য রকমের প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, এই শক্তি ছাড়া যেমন সদ্‌গুরু ভগবান নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম মাত্র, তেমন-ই স্পন্দনশীল ও সক্রিয় সদ্‌গুরুর আশ্রয় ছাড়া এই শক্তি-ও অন্যথা নিষ্ক্রিয়। সদ্‌গুরু ও তাঁর শ ক্ত উভয়-ই উভয়ের অবলম্বন। প্রথমোক্ত পত্রাংশে যেখানে বলা হয়েছে যে 'এ শক্তির পৃথক কোন সত্তা নাই'

তার মানে হল, এ শক্তির আলাদা অস্তিত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু সে অস্তিত্ব 'পৃথক' অর্থাৎ স্বাধীন বা independent নয়। একই অর্থে সক্রিয় সদ্‌গুরু-ও independent নন কারণ শক্তি সমন্বিত না হলে 'তুমি নিষ্ক্রিয় শ্বেতবর্ণ গুরুর দ্বারা কোন কাজ পাইবে না।'

তত্ত্ব ছেড়ে লীলার সূত্র ধরে ব্যাপারটি আলোচনা করা যেতে পারে। ১৩।১৪ নম্বর পত্রাংশের শেষে দরবেশজী বলেছেন যে সদ্‌গুরুর ধ্যানমন্ত্রে উল্লিখিত সদ্‌গুরু-শক্তির যে বর্ণনা ও উরু-আসনের কথা বলা হয়েছে তা শুধু সেখানে-ই প্রযোজ্য যেখানে শ্রীগুরুর মরদেহ বিবাহিত নন। যদি শ্রীগুরুর মরদেহ বিবাহিত হন তবে কোন মুস্কিল-ই নেই কারণ সেই মরদেহ বা লীলাদেহের বিবাহিতা স্ত্রী বা শক্তি-ই সদ্‌গুরুর প্রকৃত শক্তি। উভয়ের প্রকট লীলায় যে বাহ্যিক মূর্তি সেই যুগ্মমূর্তি-ই সদ্‌গুরু মূর্তি—সেই যুগল মূর্তির ধ্যান-ই সদ্‌গুরুর ধ্যান। এই জন্যই 'দরবেশ দর্শনের' ১।২২ নম্বর পত্রংশে গোঁসাইজীর বর্ণনা দিতে গিয়ে দরবেশজী বলেছেন, 'সদ্‌গুরু অবতার যোগমায়া অবলম্বনে প্রকটিত বিজয়কৃষ্ণ।' কাশী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠে দরবেশজী সদ্‌গুরু-ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটা তত্ত্বের দিক, খানিকটা বহিরঙ্গ দিক-ও বটে। তাই শাস্ত্রোল্লিখিত ধ্যানমন্ত্রের পূর্ণ মর্যাদা দিতে হয়েছে। কিন্তু যথার্থ অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে গোঁসাইজীর একনিষ্ঠ ভক্ত দরবেশজী সব অবতারের সেরা অবতার শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী দেবের মূর্তি-ই মঠে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর প্রমাণ, মঠের নিত্য পূজায় গোস্বামী দেব ও যোগমায়া দেবীর পৃথক পৃথক পূজা, ধ্যান ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। লীলায় অর্থাৎ ভক্তের দৃষ্টিতে যোগমায়া দেবীর পৃথক সত্ত্বা আছে, তাঁকে ছাড়া গোঁসাইজী অপূর্ণ, তাঁর কৃপা ভিন্ন গোঁসাইজী লভ্য হন না। 'ওমা, তুই দিলে মিলে গোঁসাই।' শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃতে সূত্র-শ্লোকাবলীতে এ তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে ঃ

দেবী পৌর্ণমাসী সে যোগিনী যোগমায়া।

মাতা যোগমায়া মোর মুক্ত কর মায়া ॥
স্বামী সঙ্গচ্যুতা হয়ে পূর্ব অবতারে।
যোগ-ভ্রষ্টা সতীবৎ কঠোর আচারে ॥
দুষ্কর তপস্যা করি তার প্রতিদান।
সন্ন্যাসী স্বামীর পার্শ্বে লভিলেন স্থান ॥
শ্রীবিজয়যুক্তা সেই যোগেশ্বর-জায়া।
সদয়া হউন মোরে মাতা যোগমায়া ॥

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ যেমন 'যোগমায়া অবলম্বনে প্রকটিত', মাতা যোগমায়াও তেমনি 'শ্রীবিজয়যুক্তা যোগেশ্বর-জায়া।'

মাতা যোগমায়া সম্বন্ধে গোঁসাইজীর নিজের উক্তি ও আচরণ আলোচনা করলেও এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়। যোগমায়া দেবীর দেহত্যাগের পর গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে ১২৯৮ সালের মহাষ্টমী তিথিতে যে সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় তা গোঁসাইজীর প্রত্যক্ষ নির্দেশেই হয়েছিল। ঐ মন্দিরে দেবীর অস্থি প্রোথিত করা হয়, তা ছাড়া তাঁর ব্যবহৃত আসন, বালিশ ও বস্ত্রাদিও মন্দিরে স্থাপিত হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হল প্রতিষ্ঠার তিথিতে গোঁসাইজীর লেখা নামব্রহ্মের পট ও যোগমায়া দেবীর ফটো ঐ মন্দিরে সংস্থাপন। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গে লিখেছেন, 'অনন্তর মহাষ্টমী পূজার লগ্নে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গনে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়া উঠিল ; এই সময়ে ঠাকুর ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনিমেষ নয়নে ঠাকুর মাতাঠাকুরাণীর ফটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া, কয়েক শ্লোক চণ্ডীপাঠ শুনিয়াই মন্দির হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভাবাবেশে দক্ষিণে বামে হেলিয়া দুলিয়া মন্দির পরিক্রমা করিতে লাগিলেন।' গোঁসাইজী স্বয়ং তাঁর সংসার জীবনের স্ত্রীর ফটো-মূর্তি পরিক্রমা করে দেবীর মাহাত্ম্য প্রদর্শন করলেন। মন্দিরে দেবী যোগমায়ার ভোগ দেয়া হল এবং সন্ধ্যায় দেবীর যথারীতি আরতি করা হল। পরে

গোঁসাইজী মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্তনানন্দে মাতলেন ও নিজেই হরির লুট বিতরণ করলেন। এই মন্দিরের নিত্যপূজা সম্বন্ধে যোগজীবন পরে যখন একজন শুদ্ধাচারী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নিয়োগের প্রস্তাব করেন তখন গোঁসাইজী যে অবিস্মরণীয় উক্তি করেছিলেন তাতে গোঁসাই-যোগমায়া তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে : 'শুধু প্রণালী মত পূজাতে কৃপা লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ইনি ফিরিয়াও চাহিবেন না। এই স্থানের পূজা এইরূপ হইবে না। যিনি ইঁহাকে আমা হইতে পৃথক জ্ঞান করিবেন, তিনি আমাকে বুঝিতে পারিবেন না। ভগবান-ও আরাধনা দ্বারা দৃষ্ট হন, কিন্তু ইঁহাদের দর্শন অতি দুর্লভ।' এখানে বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য যে গোঁসাইজী ও যোগমায়াকে পৃথক জ্ঞান করলে যেমন গোঁসাইজীকে বোঝা যাবে না বললেন, তেমনি পরমুহূর্তেই যোগমায়ার পৃথক দর্শন-ও যে দুর্লভ হলেও সম্ভব, গোঁসাইজী সেই মহাসত্য তত্ত্বটির নির্দেশ করলেন। বৃন্দাবন লীলায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ গৌরলীলায় 'তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্' হয়ে একই তনুতে প্রকট হলেন আবার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলায় সেই তত্ত্ব-ই দু'টি পৃথক মূর্তিতে প্রকাশ পেলেন অথচ এই দুই মূর্তি যুগলমূর্তি নহেন, পৃথক-ও নহেন অথচ বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে দুজনে পৃথক পৃথক সত্ত্বা নিয়ে বিরাজমান। এই অভূতপূর্ব আবির্ভাব বা প্রকাশের আভাস গৌরলীলায় রায় রামানন্দের কাছে মহাপ্রভু দিয়েছিলেন :

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

এই তত্ত্ব-ই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—অচিন্ত্য কেননা মাত্র চিন্তা করতে সক্ষম যে মন সেই মন দিয়ে এ তত্ত্ব বোঝা যায় না, মনের অতীত উপলব্ধির অন্য কোন স্তরে এ তত্ত্ব বোধগম্য হলেও হতে পারে। গোঁসাই-যোগমায়া তত্ত্ব-টি প্রত্যেক সদ্‌গুরু ও তাঁর শক্তি এবং সদ্‌গুরু মরদেহে বিবাহিত হলে তিনি ও তাঁর পত্নী সম্বন্ধে-ই প্রযোজ্য ও সত্য।

আরও একটু এগিয়ে গেলে বলতে হয় এই তত্ত্বটি সদ্‌গুরু ভগবান ও তাঁর কৃপাশ্রিত প্রত্যেক ভক্ত সম্বন্ধেও খাটে।

কিরণ-ও তাই তাঁর সেই মহাযাত্রার প্রারম্ভে এমনকি সদ্‌গুরু ভগবানের সাক্ষাত কৃপা পাওয়ার আগেই সদ্‌গুরু তত্ত্বের এই মূল বিষয়টি আস্বাদন করলেন। পৃথকভাবে যোগমায়ার দর্শন পেলেন, আবার সদ্‌গুরুর সঙ্গে যুগল মূর্তিতেও মাকে দেখতে পেলেন। 'সেই মন্জিল, যে না পেল সে রূপের সীমা।'

সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মত বেরিয়ে কিরণ পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন স্বামী কুমারানন্দের শিষ্য স্বামী হরিহরানন্দ ভারতীর সঙ্গে দেখা হল। হরিহরানন্দ তাঁকে একটি গুহায় নিয়ে গেলেন এবং কিরণ ক্ষুধার্ত বুঝতে পেরে তাঁকে লবণ ও মশলা ছাড়া একরকমের শাকসিদ্ধ খেতে দিলেন। সাধুটি তাঁর গুরুদেবের আদেশে এগারো বছর ঐ শাকসিদ্ধ খেয়েই জীবন ধারণ করছিলেন। কিরণের কাছেও সিদ্ধ শাক বেশ সুস্বাদুই লাগল। দু'দিন ঐ সাধুর গুহায় কাটিয়ে ১৬ আষাঢ় কিরণ সাধুর দেখানো একটি সোজা পথ ধরে বৃন্দাবনের পথে আবার বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনে পৌঁছালেন। কিন্তু কিরণের কাছে ট্রেনের মাশুলের পয়সা নেই। আবার পায়ে হাঁটা শুরু করবেন ভাবছেন এমন সময় এক ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে তাঁর টিকিট কেটে কিরণকে সঙ্গে করে প্রয়াগ নিয়ে এলেন। এই অযাচিত সাহায্যকে কিরণ গোঁসাইজীর কৃপা ও ব্যবস্থা বলেই মেনে নিলেন। গাড়ীতে ঐ ভদ্রলোকের মুখে প্রয়াগের রঙ্গীন বাবার কথা শুনে কিরণ ষ্টেশনে পৌঁছেই বাবার আশ্রমে গেলেন। তিনি খুব তৃষ্ণার্ত ছিলেন, আশ্রমে পৌঁছাতেই রঙ্গীন বাবা ঘরের কোণের একটি পাত্রে রাখা ঘোল দেখিয়ে তাঁকে পান করতে বললেন। পান করা শেষ হতেই বাবা বললেন, 'এখখুনি ষ্টেশনে যাও, গাড়ীর আর দেরী নেই।' কিরণ রওনা হতেই বাবা আবার বললেন, 'বাবাকে আমার প্রণাম জানিও।' বাবা বলতে রঙ্গীন বাবা গোঁসাইজীর কথাই উল্লেখ করলেন। কিরণ

পরিষ্কার বুঝতে পারলেন রঙ্গীন বাবা আগে থেকেই কিরণের আসার কথা জানতেন। সত্যিই ষ্টেশনে মথুরা যাবার গাড়ী তখন ছাড়ে ছাড়ে। বিনা টিকিটে গাড়ীতে উঠবেন না, নিঃসম্বল কিরণ নিরুপায়ের মত প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রইলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল, হতভম্ব কিরণকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে একজন রেল কর্মচারী তাঁর হাত ধরে চলন্ত ট্রেণে তুলে নিলেন। কিরণ তাঁকে জানালেন যে তাঁর কাছে টিকেট-ও নেই, পয়সাও নেই; তা ছাড়া রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে তিনি যেতে চান না; পরের ষ্টেশনে তাঁকে নামিয়ে দেবার অনুরোধও রাখলেন। বৃদ্ধ রেল কর্মচারীটি কিরণের কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং বিশেষ যত্ন করে কিরণকে মথুরায় নিয়ে এলেন। ১৭ আষাঢ় প্রাতে মথুরা ষ্টেশনে গাড়ী থেকে নামলেন কিরণ আর পাণ্ডারা তাঁকে ঘিরে ফেলে নানা প্রশ্নে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। কিরণ নিরুত্তর। হঠাৎ লুচিপুরী পাণ্ডা বলে উঠলেন যে তিনি গোঁসাইজীর পাণ্ডা, কিরণ তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেন। গোঁসাইজীর নাম শুনে কিরণ উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি গোঁসাইয়ের কাছে যাব, কিন্তু আপনি কি করে তা বুঝলেন?' পাণ্ডাজী উত্তর করলেন, 'তোমার মত অনেক বাবু সেখানে আছেন। চল মথুরা দর্শন কর, পরে বৃন্দাবন যাবে।' সঙ্গে টাকাপয়সা নেই বলে কিরণ মথুরা দর্শন করতে রাজী হলেন না। লুচিপুরী কিরণকে খাবার কিনে খাওয়ালেন এবং একটি গাড়ী ঠিক করে কিরণকে বৃন্দাবন রওনা করিয়ে দিলেন, গাড়োয়ানকে বলে দিলেন যেন তাঁকে ঠিক ঠিক গোঁসাইজীর কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

গাড়ী করে বৃন্দাবনের পথে কিছুদূর এগোতেই কিরণ দেখতে পেলেন যে আর একজন বৃন্দাবন-যাত্রী সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে পথ দিয়ে যাচ্ছেন। দেখেই কিরণ ভাবলেন যে তাঁর গাড়ী চড়ে বৃন্দাবন যাওয়া উচিত হবে না। হেঁটে যাবেন সাব্যস্ত করে তিনি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লেন। লুচিপুরীর উপদেশ মনে রেখে গাড়োয়ান ভাবল

যে ছেলেটি সত্যিই পাগল, পালিয়ে যেতে চায়। কিরণকে আটকে রাখার জন্য সে তাই ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল। কিরণ অনেক করে তাকে বোঝাতে পারলেন যে তিনি সত্যিই পাগল নন, গাড়ী করে না গিয়ে পায়ে হেঁটে বৃন্দাবনে যেতে চান। গাড়োয়ান তখন তাঁকে ছেড়ে দিল। বৃন্দাবনে গোঁসাইজী কোথায় আছেন কিরণ তা জানেন না, গাড়োয়ানকে-ও জিজ্ঞেস করে জেনে নেবার মত মনের অবস্থাও তাঁর নয়। গোঁসাইজীর কথা ভাবতে ভাবতে, তাঁর ধ্যান করতে করতে কিরণ পায়ে হেঁটে দুপুর বেলা বৃন্দাবন পৌঁছালেন। ধামে প্রবেশ করার মুখেই দেখলেন এক সাধু 'জয় জয় রাধেজীগো চরণ তুহারি' এই পদ গেয়ে পথ চলেছেন। কিরণ তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি কিরণকে জড়িয়ে ধরে ঐ গান গাইতে গাইতে তাঁকে নিয়ে সমানে পথ চলতে লাগলেন। অন্য কোন কথাই বললেন না। গোঁসাইজী সে সময় তীর্থমণির কুঞ্জে বাস করছিলেন। সাধু কুঞ্জের সামনে পৌঁছে কিরণকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এই বাড়ি। বাবাকে আমার প্রণাম জানিও।' কিরণের কোন সন্দেহ রইল না যে সাধুটির আবির্ভাব-ও দয়াল গোঁসাইজীর-ই খেলা। দু'দিন পরে কিরণ এই সাধুটির সঙ্গে পরিচিত হন, তাঁর নাম কমলদাস বাবাজী।

গোঁসাইজীর কাছে উপস্থিত হয়েই কিরণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। গোঁসাইজী তাঁকে কোলে টেনে নিয়ে মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে শান্ত ও শীতল করলেন, বলে দিলেন, 'ছেলেটি অনেকদিন ভাত খায় নি, একে খেতে দাও।'

যমুনায় স্নান করে এসে কিরণ অনেকদিন বাদে ভাত খেয়ে বড় তৃপ্তি পেলেন। সুস্থ বোধ করলেন। খাওয়ার পর তামাক খাচ্ছেন এমন সময় কুঞ্জ গুহঠাকুরতা মশাই এসে খবর দিলেন, গোঁসাইজী আদেশ দিয়েছেন যে সে দিনই রাত একটায় কিরণের সাধন হবে। এ খবর শুনে কিরণ একেবারে আত্মহারা হয়ে হাতের হুঁকা ফেলে দিয়ে কুঞ্জবাবুকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরলেন যে তিনি সামলাতে না

পেয়ে আর একজনের গায়ের উপর পড়ে গেলেন, ওদিকে কল্কের আগুন একটা মশারীতে লাগতে সেটা জ্বলে উঠল। সব মিলে একটা চমৎকার বিভ্রাট ঘটে গেল। গোঁসাইজী সব শুনে বললেন, 'ছেলেটার মাথায় কিছু দোষ আছে।' ভবরোগ বৈদ্য গোঁসাইজীর রোগনির্ণয় অবশ্যই যথাযথ হয়েছিল কিন্তু এ রোগের মূলেও যে তিনি এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাও যে তিনিই জানেন এ কথা স্পষ্ট কেউ না বললেও মনেপ্রাণে সকলেই তা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

আষাঢ় শুক্লা নবমী তিথি, ১৩০২ সালের ১৭ আষাঢ়, রবিবার রাত একটার সময় শ্রীবৃন্দাবন ধামে তীর্থমণির কুঞ্জে কিরণ ভগবান শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর চরণে উৎসর্গীকৃত হয়ে কৃত কৃতার্থ বোধ করলেন। কিরণের এবারকার জন্মের সূচনা থেকে তাঁর জীবন এতদিন পর্যন্ত যে অলঙ্ঘ্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছিল তার প্রথম পর্বের ছেদ ঘটল এই শুভ মুহূর্তে। এই সাধন প্রাপ্তি এই পরম লাভ সম্বন্ধে কিরণ পরিণত হয়ে কবি দরবেশ রূপে 'মন্দির' কাব্যে যা লিখেছেন, তা এখানে স্মরণযোগ্য ঃ—

কত যুগ যুগান্তরে,
কেঁদেছি যে ধন তরে,
উদাসী সর্বস্বত্যাগী যাহার কারণ
যার তরে ভস্ম মেখে
দীর্ঘ জটা শিরে রেখে
কত জন্ম কাটাইনু খুঁজি ত্রিভুবন ;
কম্বল সম্বল করি
সুখ-আশা পরিহরি
শ্মশানে-মশানে কত করিনু ভ্রমণ ;
বাসন্ত-কুসুম ভরা
ত্রিজগৎ আলো-করা

শোক-পাপ-তাপ-হরা কনক-রতন—
প্রাণের পবিত্রতম পেয়েছি সে ধন।

গোঁসাইজীর বিলোনো এই সাধন যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের অনেককেই বর্তমান জন্মে কিরণের মত এরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসতে হয়নি, অনেকে আবার এত অল্পায়াসে ও অনায়াসে সাধন পেয়েছেন যে এই পরম বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ ঘটে ওঠে নি, এ বস্তুর মর্যাদা দেয়া তো দূরের কথা। এই জন্যেই বারদীর ব্রহ্মচারী গোঁসাইজীকে যেন অনুযোগ করে বলেছিলেন, মুনি ঋষিদের কলজের ধন তিনি অবিচারে অযোগ্য পাত্রে বিতরণ করছেন। হরিদাস বসু মশাই-ও গোঁসাইজীকে অনুরূপ ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই মুক্তাহার জঙ্গলে ছড়াইলেন কেন?' গোঁসাইজী উত্তরে বলেছিলেন, 'এই সংসারে ত্রিতাপ জ্বালায় আমি ভুগেছি। এ থেকে রক্ষা পাবে, এজন্য তাপিত জীবকে ইহা দান করেছি।' এই সাধন সম্বন্ধে গোঁসাইজীর অন্য ক'টি উক্তি স্মরণ করলে দেখা যাবে যে না, তিনি অযোগ্য কারোর জন্য এ সাধনের ব্যবস্থা করেন নি, যাঁরা এ সাধন পেয়েছেন তাঁদের বিশেষ যোগ্যতা অবশ্যই রয়েছে, তবে তা হয়ত তাঁদের কাছে সাময়িকভাবে অজ্ঞাত বা অননুভূত থেকে গেছে। গোঁসাইজী বলেছেন, 'এ সাধনে বিশেষ অধিকার চাই। প্রথম, সূর্যোপাসনা তিন জন্ম, গনেশ-উপাসনা তিন জন্ম, শিব-উপাসনা তিন জন্ম, শক্তি-উপাসনা একশত জন্ম, পরে বিষ্ণু-উপাসনা তিন জন্ম করিলে এই অধিকার লাভ হয়, তৎ পূর্বে বহুজন্ম অতিবাহিত হয়। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন:

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

এই সাধন প্রথম নারায়ণ ব্রহ্মাকে দেন, ব্রহ্মা নারদকে—এইরূপে গুরুপ্রণালী ক্রমে ইহা চলিয়া আসিতেছে। মাধবেন্দ্রপুরীর এই শক্তি। মহাপ্রভু কেবল সাড়ে তিন জনকে এই শক্তি দান

করিয়াছিলেন।' অন্য প্রসঙ্গে তিনি আবার বলেছেন, 'এ সাধন যাহারা পায়, তাহাদের বড় সৌভাগ্য। ইহার পর মাথা কুটিলেও এ অমূল্য জিনিষ আর মিলিবে না। জগতের পক্ষে এখন বড় সুসময়।' 'যে দুর্লভ বস্তু পেয়েছ, তা যখন প্রত্যক্ষ করবে, তখন বুঝবে। একেবারে নির্ভয় হয়েছ। যাঁরা সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁরাই নির্ভয় হয়েছেন।' 'মহাপ্রভুর সময়ে সাড়ে তিনজনকে যে বস্তু দেওয়া হইয়াছিল, এবার সেই সময়ের বাকী লোকদিগকে তাহাই দেওয়া হইল।'

উত্তরকালে সদ্‌গুরু দরবেশজী গোঁসাইজীর এই সাধন ধারা সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেছেন 'দরবেশ দর্শন' থেকে প্রসঙ্গত তার কয়টি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'সদ্‌গুরুর কার্য শুধু তাঁহার দেহ ধারণের ৫০-৬০ বছর অতীত হইলেই শেষ হইয়া যায় না। এত অল্প কাজের জন্য ভগবান অবতীর্ণ হন না। সদ্‌গুরুর কার্যধারা ও শক্তি প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত শিষ্য-প্রশিষ্যদের ভিতর দিয়া তিনি কাজ করিতে থাকেন।' 'এই সাধন একটা শক্তি। এই শক্তি নিজে লাভ করিলেও শ্রীগুরুর প্রত্যক্ষ অনুমতি ব্যতীত অন্যের দেহে সঞ্চার করিবার ক্ষমতা জন্মে না। এই অনুমতি তোমার গুরু লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তোমরা বাঁচিয়া গেলে। * * * শক্তিদাতা গোঁসাইজী। সুতরাং তোমার যথার্থ গুরু গোঁসাইজী এবং যথার্থ গুরু ও ব্যবহারিক গুরু এই দুইটিই দরবেশ।'

শক্তিদাতা গোঁসাইজীর এই সাধন গোঁসাইজী ছাড়া অন্য ব্যবহারিক গুরুর কৃপায় যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা সবাই বিশেষ অধিকারী এবং নির্ভয় হয়েছেন। তবে যে এ সত্য উপলব্ধি হয় না, আশ্বস্ত হওয়া যায় না সেজন্যই গোঁসাইজীর অভয় বাণী রয়েছে, 'শুভ মুহূর্তের অপেক্ষা কর, চিন্তা নাই; সব হইবে। যেমন নদী শুষ্ক হইয়া গেলেও তাহাতে একটু স্রোত থাকিলে একদিন উহা সাগর সঙ্গম লাভ করিবেই, তেমন, তোমাদের প্রাণ যতই কেন শুষ্ক হউক না, ভগবানের প্রতি একটু

আকর্ষণ থাকিলে, একদিন না একদিন মুক্ত হইবেই হইবে।' 'আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের চেপে রেখেছি। যদি একটু আলগা দি, তা হলে 'জয় রাম, জয় রাম' বলে সকলে বের হয়ে পড়বে।'

ত্রিপুরা দেবী বা ত্রিপুরা ভৈরবী দরবেশজী মহারাজের শিষ্যা ছিলেন। বামুনের ঘরের বধূ এই মহিলা ধর্মলাভের উদ্দেশ্যে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, প্রায় বিশ বছর শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়াতেন, সাধারণত শ্মশানেই বাস করতেন। মাথায় জটাভার, হাতে ত্রিশূল। গাঁজা খেতেন, গৈরিক বসন পরতেন, নরকপালে আহার্য গ্রহণ করতেন। কেওড়াতলা শ্মশানে বাস করার সময় একজন গৃহী তান্ত্রিক সাধক ত্রিপুরা দেবীকে মন্ত্র দেন। কিন্তু এত করেও তিনি তাঁর অভীষ্ট বস্তু লাভ করলেন না, শান্তি পেলেন না। পুরীতে শ্রীশঙ্করাচার্যের মঠে তিনি প্রত্যাদেশ পান, বারাণসী গিয়ে দরবেশজীর শরণাপন্ন হতে। তিনি কাশী চলে এলেন। আশ্রমে তখন দরবেশজীর বিশ্রামের সময়। আশ্রমবাসীরা সেই মুহূর্তে তাঁর দর্শনের ব্যবস্থা করতে রাজী ছিলেন না। দরবেশজী স্বয়ং তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে দেখা করলেন, আশ্বস্ত করলেন। তাঁকে যখন সাধন দিলেন তখন সাধনের প্রচলিত বিধি নিষেধ অনুযায়ী দরবেশজী গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দিতে বললেন না কিন্তু একটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ কথা শোনালেন, বললেন, 'মা, তুমি অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছ, এ সাধনের মর্যাদা তুমি-ই বুঝবে।' এই সাধিকা মহিলা উত্তর জীবনে সাধনের মাধুর্য রসে ডুবে ছিলেন। কি জটা, কি ত্রিশূল, কি গাঁজা খাওয়া সব ধীরে ধীরে ঘুচে গিয়ে তিনি এক শান্তিময়ীর মূর্তিতে বিরাজ করতেন। দরবেশজীর অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য ভগবানদাসজী এই ত্রিপুরা দেবীর সঙ্গ প্রভাবেই দরবেশজীর কৃপাপ্রার্থী হন ও তাঁর আশ্রয় লাভ করেন। অনেক ঘাটের জল না খেলেও এক-আধ ঘাটের জল খাওয়া কেউ কেউ দরবেশজীর কৃপাধন্য হয়েছেন। মেদিনীপুরের মণীন্দ্রমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঢাকার ও পরে কলকাতার ভূপতিরঞ্জন বসু অন্যত্র দীক্ষা গ্রহণ

করে পরে দরবেশজীর কাছে সাধন পান। এঁরা হয়ত এ সাধনের বৈশিষ্টের সন্ধান রাখেন।

গোঁসাইজী কিরণকে যোগজীবন গোস্বামী মারফত লিখে জানিয়েছিলেন এবং পরে কলকাতায় কিরণের সমক্ষেও বলেছিলেন যে তিনি পশ্চিম থেকে ফিরে এলে তাঁর সাধন হবে। অথচ কিরণ সাধন পেলেন বৃন্দাবনে, গোঁসাইজীর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে-ই। এ ঘটনা বিপর্যয়ের নিশ্চয়ই বিশেষ তাৎপর্য আছে। ভগবান গোঁসাইজী ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, এ কথা দরবেশজী তাঁর শিষ্য যোগেশ ঘোষকে বলেছিলেন। কাজেই তিনি অবশ্যই জানতেন কিরণের কোথায় সাধন লাভ হবে, তবু তিনি জানালেন, পশ্চিম থেকে তিনি ফিরে এলে তবে কিরণের সাধন হবে। যদি এ ব্যাখ্যা করা যায় যে কলকাতার জগন্নাথ ঘাটে কিরণের সামনে গোঁসাইয়ের যে দিব্য আবির্ভাব ঘটেছিল তাকেই গোঁসাইয়ের ফিরে আসা ধরতে হবে, তবে একটা কৈফিয়ত দাঁড় করানো যায় বটে, কিন্তু এতে যেন খানিকটা কষ্টকল্পনা থেকে যায়। বরং এ কথা ভাবতে বেশি ভাল লাগে যে বৃন্দাবনে কিরণের সাধন হবে জেনেও গোঁসাইজী তাঁকে যেন আর একটু উৎকণ্ঠ, আরও একটু উতলা করার জন্য একটা ছল করেছিলেন। এ ছল যে সাধন-প্রার্থী কিরণের পক্ষে কেমন মধুময় হয়েছিল তা কিরণের প্রথম গোঁসাই দর্শন ও বৃন্দাবন পৌঁছানোর মধ্যের ঘটনাগুলি স্মরণ করলেই বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিরণের এই মধ্যবর্তী সময়ের অধীর প্রতীক্ষার প্রহরগুলি, তাঁর এই আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠার বেদনা-মাধুরীর ক্ষণগুলি তাঁকে যে আরো বেশি সাধন অভিলাষী আরও অনেকখানি গোঁসাই-উন্মুখ করেছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে গোঁসাইজীর অন্য একটি উক্তি অনুধাবন যোগ্য, 'আমরা যে সাধন করি তাহা স্বপ্ন নহে, প্রত্যক্ষ ঘটনা। তবে সময় না হলে ইহা কেহই পান না। যদি আপনার জমি প্রস্তুত হয় এবং সময় হয়, তা হলে আপনি যেখানেই থাকুন, বসেই পাবেন। কিন্তু, সময় হওয়াই জমি প্রস্তুত নয়। জমি

প্রস্তুতের অর্থ ভিন্ন। তা সাধন পেলে বুঝা যায়, নতুবা বুঝা যায় না।' সময় হওয়া ছাড়াও জমি প্রস্তুতির অন্য একটি যোগ্যতার প্রয়োজন হয় সার্থক সাধন প্রার্থীর। মনে হয়, এই জমি প্রস্তুতির জন্যই কিরণের এই প্রতীক্ষা-যোগ এবং এর প্রয়োজনেই গোঁসাইজীর ঐ ছল। গোঁসাইজীর নিজের জীবনে দীক্ষা-পূর্ব কালের অধ্যায়টি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য; শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত-কার গ্রন্থের মধ্যলীলার চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে একটি মধুর আলেখ্য রচনা করে রেখেছেন।

সদগুরু দরবেশজী-ও সাধনার্থীদের জমি প্রস্তুতির জন্য কখনো কখনো এই ধরণের ছল বা ছুতোর ব্যবহার করেছেন। ঝড়িয়ার শরৎ চক্রবর্তীর কথা-ই ধরা যাক। বাসুদেব গুপ্ত ও শরৎ অনেকদিনের বন্ধু। বাসুদেব তখন ঝড়িয়ার নামকরা কবরেজ আর কলিয়ারীর মালিক শরৎ ঝড়িয়ার পাকা বাসিন্দা। বাসুদেবের খুব সাধু সাধু বাতিক ছিল; সাধুদের খবর পেলেই তাঁদের কাছে যেতেন, আবার তাঁদের নিজের আস্তানায় নিয়ে এসে সেবা করতেন, সঙ্গ করতেন। ক্রমশ বাসুদেব নিজের চিকিৎসা ব্যবসা ও সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যেতে লাগলেন; মনের ভারসাম্য-ও যেন খানিকটা হারিয়ে ফেললেন। বাসুদেবের সাধু-ঘেঁষা ভাব দেখে কে যেন তাঁর বৈঠকখানা ঘরে গোঁসাইজীর একখানা ছবি টাঙিয়ে রেখে গেছল। বাসুদেব ধীরে ধীরে ঐ ছবির প্রেমে পড়েন এবং লোকমুখে গোঁসাইজীর শিষ্য দরবেশজীর কথা শুনতে পেয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করে চিঠি দেন। দরবেশজী বাসুদেবকে পুরো একবছর আচরণের জন্য নিত্য তুলসী সেবা ইত্যাদি কতগুলি নিয়ম জানিয়ে দেন এবং একবছর পরে সাধন দেবার স্বীকৃতি দেন। নির্দিষ্ট সময়ে দরবেশজীর নির্দেশ মত সস্ত্রীক বাসুদেব কাশীর মঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। শরতের সঙ্গে বাসুদেবের প্রায় রোজ-ই দেখা হয়। কাশী যাবার দিন ঠিক হবার পর বাসুদেব শরৎকে তাঁর সঙ্গী হতে বললেন। শরৎ ও তাঁর স্ত্রী, ভগ্নী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিছক বেড়াতে যাবার মত বাসুদেবের সঙ্গী হয়ে কাশীর মঠে গিয়ে

পৌঁছোলেন। বাসুদেবের সঙ্গী বলে সাধনার্থী না হলেও দরবেশজী শরৎকে সপরিবারে মঠের অতিথি হিসাবে গ্রহণ করলেন। এই ঘটনার বহুদিন আগে শরৎ গোঁসাইয়ের সাধন পাবার আকাঙ্ক্ষায় তিনবার বিভিন্ন সময়ে ঠাকুর বরদাকান্তের দ্বারস্থ হন, এবং তিনবারই প্রত্যাখ্যাত হন। প্রথমবার শরতের স্কুলজীবনে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে এবং তৃতীয়বার ঝড়িয়াতে যখন শরৎ সাবালক হয়েছেন। তৃতীয়বার প্রত্যাখ্যানের পর শরৎ একটু অভিমানভরে বরদাকান্তকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তাঁর কি গোঁসাইয়ের সাধন কখনোই লাভ হবে না। উত্তরে জেনেছিলেন যে, সাধন তিনি পাবেন, তবে বরদাকান্তের কাছে নয়। মঠে গিয়ে পৌঁছোবার পরদিন সকালে দরবেশজী তাঁর নিত্যকার অভ্যাসমত মন্দিরে পূজার পর ধুনুচি নিয়ে একতলার বসার ঘরে এসে বসেছেন, অন্যান্যদের সঙ্গে শরৎ-ও সেখানে উপস্থিত। কয়েকদিন বাদেই বাসুদেব ও অন্যান্য অনুমতিপ্রাপ্তদের সাধনের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। দরবেশজী সাধনার্থীদের নামের তালিকা হল কিনা খোঁজ খবর করতে শরৎ বললেন যেন তাঁদের নামও তালিকাভুক্ত হয়। দরবেশজী জানালেন যে, না, শরতের সাধন তো হবে না। শরৎ শুধু ক্ষুণ্ণ হলেন না, আহত বোধ করলেন। যে মঠে তাঁর সাধন হবে না সেখানকার আতিথ্য গ্রহণ করতে তিনি আর রাজী হলেন না। মঠের সেবক গোবিন্দ দত্তকে তিনি জানালেন যে তাঁর পরিবারের কেউ আর প্রসাদ গ্রহণ করবেন না এবং তিনি সেই দিনই এক ধর্মশালায় আস্তানা যোগাড় করে বিকেল নাগাত মঠ ছেড়ে চলে গেলেন। মঠে না থাকলেও মঠের আকর্ষণ শরৎ এড়াতে পারলেন না। অত অভিমান সত্ত্বেও সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করতে এলেন, এমন কি পরদিন সকাল সকাল দরবেশজীর নির্দিষ্ট সময়ে বৈঠকখানা ঘরের প্রাতঃকালীন অধিবেশনেও হাজির হলেন। দরবেশজী তাঁর মঠ ছেড়ে যাবার কথা তুলে ঈষৎ অনুযোগ করতেই শরৎ তাঁকে স্পষ্টই বললেন যে তাঁর যখন সাধন হবে না তখন মঠের অতিথি হওয়া তিনি অকর্তব্য মনে করেন।

সেদিনও সাধনার্থীদের প্রসঙ্গ উঠতে শরৎ আবারও যেন অনেকটা নির্লজ্জের মত জানালেন যে তিনি-ও সাধন প্রার্থী। দরবেশজীর সেই একই উত্তর, 'তোমার সাধন হবে না।' তারও পরের সকালে সেই এক-ই নাটকের পুনরাবৃত্তি। শরতের সেই মঠে হাজিরা, সেই বেহায়ার মত সাধন প্রার্থনা এবং দরবেশজীর দৃঢ়তর উত্তর, 'বলেছি তো, তোমার সাধন হবে না।' শরৎ সেদিন যেন মরীয়া, বলে উঠলেন, 'জানতাম, গোঁসাইজীর শিষ্যেরা মিথ্যে কথা বলেন না ; এখন দেখছি তাঁরাও মিথ্যে বলেন।' একথা শুনে দরবেশজীর মুখ যেন লাল হয়ে উঠল, তিনি বিরক্তি ও ক্রোধ মিশিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এ রকম কথা কেন বলছ ?' শরৎ উত্তর দিলেন, 'আমি শেষবার যখন ঠাকুর বরদাকান্তের কাছে সাধনের জন্য যাই তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁর কাছে না হলে-ও গোঁসাইয়ের সাধন আমি পাব। তিনি দেহ রেখেছেন, গোঁসাইয়ের সাধন দিতে আপনি ছাড়া এখন আর কেউ নেই। আপনি-ও বলছেন আমার সাধন হবে না। কাজেই বরদাকান্তের কথা মিথ্যে হয়ে গেল বৈকি।' উত্তর শুনে দরবেশজী একটু থমকে রইলেন, পরক্ষণেই মধুরভাবে বললেন, 'না, বাবা, তোমার সাধন হবে।' বাসুদেবের সাধন হবার আগেই পূর্বনির্দিষ্ট দিনে শরতের সাধন হল, জ্বর হওয়ার দরুন বাসুদেবের সাধন কদিন পিছিয়ে গেছল। এই শরতের ঝড়িয়ার বাড়িতে দরবেশজী পদধূলি দিয়ে ধন্য করেছেন, দেবী সরোজবালা-ও এই বাড়িতে কয়েকদিন বাস করে আনন্দের হাট বসিয়েছিলেন।

এই রকম আর একটি কাহিনী গড়ে উঠেছিল ডাক্তার যোগেশ বাড়ুজ্যে ও তাঁর স্ত্রী সতী দেবীকে কেন্দ্র করে। যোগেশ ফরিদপুরের একটি গঞ্জে সরকারী ডাক্তার। স্থানীয় এক বাড়ীতে অষ্টপ্রহর সংকীর্তন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি দরবেশজীর শিষ্য প্রভাত ভৌমিক প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের সঙ্গ ও সংকীর্তনের

পরিবেশ তাঁর এত ভাল লাগল যে তিনি সারা রাত ওখানে কাটিয়ে দিলেন এবং এর পর পরই তিনি দরবেশজীর নিকট সাধন প্রার্থনা করে পত্র লিখলেন। যোগেশ তাঁর স্ত্রীর কাছে এই চিঠির কথা যখন বলেন তখন সতীদেবী মোটেই আগ্রহ দেখান নি কাজেই যোগেশ শুধু তাঁর নিজের জন্যই প্রার্থনা জানালেন। যথাসময় চিঠির উত্তর এলো সাধনের তারিখ নির্দিষ্ট করে দরবেশজী যোগেশকে কাশী যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। যোগেশ আর সতীদেবীর সম্পর্ক ছিল অনুরাগ ও অভিমানমেশানো। দরবেশজীর চিঠি পেয়ে যোগেশ যখন কাশী যাবার তোড়জোড় করছেন তখন সতী বললেন, 'তুমি সারাজীবন আমাকে বঞ্চনা করেছো, এখন এই দীক্ষার ব্যাপারেও আমাকে বঞ্চিত করতে চাইছো।' সতীর কোলে তখন মাসখানেক বয়সের বাচ্চা, আর তাঁর সাধনের অনুমতিও নেওয়া হয়নি। অভিমানিনী সতীর অনুযোগ শুনে নিরুপায় যোগেশ স্ত্রী ও বাচ্চাকাচ্চা নিয়েই কাশী যাওয়া সাব্যস্ত করলেন। দরবেশজীকে লিখে জানালেন যে তাঁর স্ত্রী-ও সাধন প্রার্থী এবং যদি তাঁর সাধন না হবার হয় তবে দরবেশজী যেন টেলিগ্রাম করে তাঁকে জানিয়ে দেন। দরবেশজীর কাছ থেকে কোন টেলিগ্রাম না পেয়ে যোগেশ সপরিবারে কাশীর মঠে গিয়ে পৌঁছোলেন। দেখা হতেই দরবেশজী যোগেশকে তিরস্কার করলেন, অনুমতি না নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা শুনতে হল যোগেশকে। টেলিগ্রামের কথা উল্লেখ করে যোগেশ সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করতে দরবেশজী আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার কি টাকার গাছ আছে যে টেলিগ্রাম করতে বললেই টেলিগ্রাম করব? তুমি নিজে ডাক্তার, তোমার তো জানা উচিত যে সেদিন মাত্র তোমার স্ত্রীর প্রসব হয়েছে, তার এখনো শরীর শোধরায়-নি, এ সময় তার সাধন হতে পারে না।' যোগেশ যেন আহম্মক বনে গেলেন, তাঁর সাধ্যমত অনুনয় বিনয় করেও সতীর সাধন দেবার জন্য দরবেশজীকে তিনি রাজী করাতে পারলেন না। যোগেশদের থাকার জন্য মঠের সংলগ্ন একটি ভাড়া

বাড়ি ঠিক করা ছিল। ঐ দিন মঠে সন্ধ্যারতির পর যোগেশ সতীকে সব কথা জানালেন। সতী যেন ভেঙে পড়লেন। কি ভেবে যোগেশ ঐ রাত্রে-ই দরবেশজীর দোতলায় বসার ঘরে তাঁর কাছে সতীকে নিয়ে এলেন। সতী দরবেশজীকে প্রণাম করে শুধু কাঁদতে লাগলেন, যোগেশ বা সতী কেউ-ই নতুন করে সাধনের প্রার্থনা করলেন না। সতীকে কাঁদতে দেখে দরবেশজীর চোখেও জল এলো, তিনি সতীকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁর মাথায় ও পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলতে লাগলেন 'মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে। না মা, তোমার সাধন হবে।'

কি শরৎ চক্রবর্তী কি সতী দেবী—এঁরা যেন সাধন পাবার উপযুক্ত হয়েই বিনা অনুমতিতে, বিনা আমন্ত্রণে দরবেশজীর কাছে এসে জুটেছিলেন। অথচ কোথায় যেন একটু অভাব ছিল, জমি যেন প্রস্তুত হয়েও হচ্ছিল না। প্রথমে প্রত্যাখ্যানের আঘাত দিয়ে, রূঢ় ব্যবহার ও অনাদরের অভিনয় করে, ছল করে দরবেশজী তাঁদের সাধনের আকাঙ্ক্ষাকে যেন আরও তীব্র আরও তীক্ষ্ণ করে তুললেন, তাঁদের উর্বর জমিকে সাধনের বীজ বপনের উপযোগী ভাবে প্রস্তুত করে নিলেন। এ ধরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাঁদের সাধন লাভ করতে হয়নি তাঁরা হয়তো এই প্রত্যাখ্যানের ঘটনার মধ্যে শুধু বেদনার দিকটায় বেশি করে দেখতে পাবেন কিন্তু এর যে একটা আনন্দময় আস্বাদনের দিক-ও আছে তা ভুক্তভোগীরা-ই টের পান ; অনাদর ও আদরের মাঝখানের কালটুকুতে তাঁদের সমস্ত সত্তায়, মনোরাজ্যে যে যুগান্তর ঘটে যায় তার সাক্ষ্য তাঁরাই দিতে পারেন।

কিরণের সাধন বৃন্দাবনে-ই হল কেন এ বিষয়েও ভাববার কথা আছে। গোঁসাইজীর কাছে সাধন পেয়েছেন কাজেই কিরণ যে মহাপ্রভুর কাল থেকেই এ সাধনের জন্য লালায়িত ছিলেন এবং তিনি যে মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মহাপ্রভু প্রথমবারে বৃন্দাবন যাবেন বলে নীলাচল থেকে গৌড়ে এসে

লোকসঙ্ঘট্টের জন্য বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত রেখেছিলেন, কারণ ঃ—

যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥

* * *

দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিম্বা সঙ্গে একজন॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ১৭শ পরিচ্ছেদ)

এরপরে তিনি মাত্র একজন সঙ্গী নিয়ে অপরিচিত বনপথে বৃন্দাবন যান। মহাপ্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবন যেতে বা তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবন বাস ও ভ্রমণ করতে না পেরে তাঁর অনেক ভক্ত যে ম্রিয়মান হয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। মহাপ্রভুর কাল থেকেই সেই জন্মের কিরণ-ও যে বৃন্দাবনের জন্য, বৃন্দাবনেই অবতীর্ণ ভগবানের সান্নিধ্যে কাটাবার জন্য একটা আকুতি পোষণ করেছিলেন, এ কথা অনুমান করা হয়তো অসমীচীন হবে না। এই আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই আরও অনেক ভক্তের ছিল কিন্তু আকাঙ্ক্ষায় তীব্রতার কম-বেশি অনুসারেই তার পূর্তি বা অপূর্তি হয়।

বৃন্দাবনে বা বিশেষ কোন তীর্থে বসে সাধন পাবার কি স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য আছে? গোঁসাইজীর বাক্য অনুসারে বলতে হয়, না, তা নেই; কারণ সদ্‌গুরু-দীক্ষায় স্থান কাল বা পাত্রের বিচার দরকার হয় না। অথচ গোঁসাইজীর দীক্ষা হয়েছিল গয়াধামে যদিও দীক্ষার পূর্বে তিনি কাশী ইত্যাদি কত তীর্থ পর্যটন করেছেন। এমন-ও নয় যে গোঁসাইজীর গুরুদেব গয়াতেই থকেতেন। গয়াতে-ও তিনি আবির্ভূত হয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন, অন্যত্রও তিনি অনুরূপ ভাবেই আবির্ভূত হতে পারতেন। ময়ুর মুকুট বাবা গোঁসাইজীর কাছে সদগুরু-সাধন পাবার আগে সিদ্ধপুরুষই ছিলেন, অষ্টসিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত ছিল। মহাদেবের সাক্ষাৎ আদেশ পেয়ে তিনি বৃন্দাবনে এসে গোঁসাইজীর কৃপা লাভ করেন। অথচ মৌণীবাবাকে সাধন দেবার জন্য গোঁসাইজী সচরাচর যা করতেন না সেই সূক্ষ্মদেহে ওঙ্কারনাথ গিয়ে তাঁকে সাধন দিলেন।

ময়ূরমুকুট বাবাকে বৃন্দাবনে টেনে না এনে-ও তো তেমনি কৃপা করা চলত। দুর্গামোহন পণ্ডিত মশাইয়ের প্রথম শিষ্য মাখনলাল গুহ বরিশালে বসেই সাধন প্রার্থী হন কিন্তু পণ্ডিত মশাই তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেন, এবং পরে তিনি বৃন্দাবন যান। বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসার সব ব্যবস্থা হবার পর-ও তিনি গোঁসাইজীব আদেশে বৃন্দাবনে থেকে যান। মাখন-ও হঠাৎ কিসের টানে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃন্দাবন চলে এলেন। তাঁকে দেখে পণ্ডিত মশাই বললেন, 'বহু ভাগ্যে তোমার এই সময় এখানে আসা সম্ভব হয়েছে। গুরুজী গোঁসাই একটু পূর্বে অপূর্ব ভাবে প্রকাশিত হয়ে তোমাকে দীক্ষা দানের আদেশ দিয়ে একটি নাম বলে অন্তর্হিত হলেন। এখন বুঝতে পারলাম তোমাকে দীক্ষা দান করতে হবে এই জন্যই গুরুজী গোঁসাই ও আমাদের মাতা ঠাকুরাণী এখানে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার জন্য আমাকে আদেশ করেছিলেন।' ভাবতে অবাক লাগে যে পণ্ডিত মশাই ও মাখন দু'জনেই বরিশালের অধিবাসী অথচ মাখনের সাধনের জন্য দু'জনকেই পৃথক পৃথক ভাবে বৃন্দাবন ধামে আসতে হল। এ সমস্ত উদাহরণ থেকে এ কথাই মানতে হয় যে সদ্‌গুরু-সাধনের স্থান-বিচার না থাকলেও, প্রত্যেক সাধনার্থীর সাধন লাভের সময়-ও যেমন নির্দিষ্ট থাকে, সাধন প্রাপ্তির স্থানও তেমন-ই নির্দিষ্ট। প্রত্যেক সার্থক সাধনার্থীর দীক্ষা প্রাপ্তির স্থান তার পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ— এ কথা স্বীকার না করে পারা যায় না।

সদ্‌গুরু দরবেশজীর শিষ্যদের মধ্যে দু'জনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পরিমল পাল—সন্ন্যাসের প্রণবানন্দজী—গোঁসাইয়ের সাধন পেতে আগ্রহী হয়ে দরবেশজীর সঙ্গে দেখা করতে ঢাকা থেকে কাশী যান। সেখানে গিয়ে খবর পেলেন, দরবেশজী পুরী চলে গেছেন। পরিমল পুরী এসে দরবেশজীর দর্শন পেলেন এবং সাধন প্রার্থনা করলেন। দরবেশজী প্রথমে তাঁকে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর কাছে প্রার্থী হতে বললেন। কিন্তু পরিমল রাজী হলেন না। দরবেশজী তখন

বললেন যে তিনি নারায়ণগঞ্জ চলে যাচ্ছেন, কাজেই পুরীতে পরিমলের সাধন হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। দরবেশজী কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন, পরিমল-ও পরে ঢাকা যাত্রা করলেন। শেয়ালদা ষ্টেশনে এসে পরিমল দেখেন দরবেশজী ঐ একই ট্রেণে নারায়ণগঞ্জ চলেছেন। পরিমল তাঁর সঙ্গী হয়ে নারায়ণগঞ্জে এলেন এবং কিছুদিন পরে ওখানেই বসন্ত পালের বাড়িতে তার সাধন লাভ হয়। কাশী বা পুরী এই কোন প্রসিদ্ধ তীর্থেই পরিমলের উপস্থিতি সত্ত্বে-ও তাঁর সাধন লাভ হল না, হল গিয়ে তাঁর বাড়ির কাছে নারায়ণগঞ্জে—তীর্থস্থান বলে যার প্রসিদ্ধি নেই। সাধনের আগেই পরিমল শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ পাঠ করেছিলেন, ভাবতেন, সাধনের মুহূর্তে বিশেষ কোন অনুভব তাঁর হবে, শক্তি সঞ্চারের সময়ে শক্তির ক্রিয়া তিনি শারীরিক উপলব্ধি করবেন। অথচ এমন কোন অনুভূতি না হওয়ায় তিনি যখন খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত তখন দরবেশজী বলে উঠলেন, 'কোন বিশেষ অবস্থা বা অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা-ও এক রকমের কল্পনা।' পরিমল স্তম্ভিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন। এই শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে সাধনের পরেও পরিমলের অনেক সংশয় ছিল। তিনি একবার দরবেশজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের সময় যে সব অনুভবের কথা শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গে বলা আছে তা যখন তাঁর হচ্ছে না, তবে কি কোন গোলমাল হয়েছে। দরবেশজী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমার কুণ্ডলিনী শক্তি জেগেই আছে।'

এরপরে আসে রামচন্দ্রপুরের ত্রিলোচন বা তিলক পাঁড়ের কথা। তিলক অসীমানন্দজীর সন্ন্যাস পূর্ব জীবনের সঙ্গী ও সহকর্মী ছিলেন। অন্নদা ও তাঁর সহধর্মিনী শৈলবালা দেবীর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন তিলক। দরবেশজী একাধিকবার রামচন্দ্রপুর আশ্রমে আসেন। অন্নদা তাঁর স্নেহভাজন অনেককেই দরবেশজীর কাছে নিয়ে এসে তাঁদের সাধন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। তিলক ও দরবেশজীর কাছে সাধন নিতে ব্যগ্র হন কিন্তু ভেতর থেকে নানা বাধা এসে প্রত্যেক

বারই অন্তরায় সৃষ্টি করে। একবার রামচন্দ্রপুর আশ্রমে তিলকের সাধন নেবার সমস্ত আয়োজন করা হল, সাধনের নির্দিষ্ট সময়ে তিলকের জন্য আসন-ও পাতা হল কিন্তু তিলক এসে না পৌঁছাতে সেই আসনে বসে সাধন লাভ করলেন ঐ গ্রামেরই তারাপদ শান্তিকারী। এই তিলকের শেষটায় সাধন হল পুরীধামে—যেখানে যাতায়াতের পাথেয় যোগাড় করা-ও তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। পুরী জটিয়াবাবা আশ্রমে তিলক যখন পৌঁছালেন তখন অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, সকালের চায়ের পাট তখন সমাপ্ত। তিলককে দেখে দরবেশজীর একজন শিষ্য বললেন, 'ঠাকুর সকালবেলা-ই আপনার চায়ের জন্য দুধ রেখে দিতে বলেছেন ; বলেছেন, আজ তিলক আসবে, ওর আবার চায়ের বড্ড ঝোঁক।' আশ্রমের ঐ ভিড়ের মধ্যে-ও তখনও সাধন হয় নি এমন তিলকের জন্য দরবেশজীর এই দরদ মাখানো দৃষ্টির কথা শুনে তিলকের চোখ সজল হয়ে উঠল। তিলকের লেখাপড়া যৎসামান্য কিন্তু তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে বেশ বড়সড় একটি সংসার প্রতিপালন করেন। দরবেশজী তাঁকে ডাক্তার বলে সম্বোধন করেছিলেন, কাজেই ডাক্তারী করার তাঁর যে যোগ্যতা রয়েছে, এ বিষয়ে তিনি কোন সন্দেহ রাখেন না। শুধু সম্বোধন-ই নয় দরবেশজী তিলককে তাঁর নিজের ব্যবহৃত 'ভারতীয় ভেষজাবলী' নামক হোমিও বইখানিও স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে দিয়েছিলেন। এই আশ্বাসে এবং এই গৌরবে তিলক রোগীকে ঔষধ দেন, দেখেন রোগীও বেশ সারে। ভাবলেন, তাঁর চিকিৎসা বিদ্যার কৃতিত্বে এত সব দুশ্চিকিৎস্য ও জটিল রোগের আরোগ্য হয়, না এ ব্যাপারে তাঁর গুরুদেবের কোন কারসাজি আছে এটা বাজিয়ে নেয়া দরকার। এই ভেবে তিলক কিছুদিন সমস্ত রোগীকেই স্রেফ জল ওষুধ বলে দিতে লাগলেন। দেখলেন ঐ জলেও রোগীরা বেশ রোগমুক্ত হচ্ছে। ঠাকুরের কৃপা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে তিলক ডাক্তার বেশ নির্ভাবনায় তাঁর ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরিমল ও তিলকের সাধন পাওয়ার ঘটনা বিচার করলে দেখা যায় যে পরিমলের যেখানে পুরীতে, সেই সর্বকালের তীর্থক্ষেত্রে, সাধন লাভের আপাত কোন বাধা ছিল না অথচ তাঁকে নারায়ণগঞ্জে ফিরে আসতে হল, অন্যদিকে তিলক তাঁর নিজের গ্রামে বসে একাধিকবার দরবেশজীর উপস্থিতি এমন কি সাধনের অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও সাধন পেলেন না, তাঁকে যেতে হল তাঁর পক্ষে যথার্থই দূরদেশ সেই পুরীধামে।

কিরণের বৃন্দাবন ধামে সাধন প্রাপ্তি এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে একটুও অস্বাভাবিক লাগে না ঠিক-ই, তবু যেন কোথাও একটু রহস্যময়তার ছোঁয়া লেগে থাকে। সাধন রাজ্যের সব কিছু, সাধন সংক্রান্ত সমস্ত কিছুতেই এই রহস্য রহস্য ভাব ততদিন বা ততক্ষণ-ই চোখে পড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না সাধন স্বভাবের সঙ্গে গেঁথে যায় বা মিশে যায়। সাধন যখন স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় তখন-ই সে সহজ ও সুন্দর। স্বভাব-সাধকের দৃষ্টিতে সবই সরল ও স্বচ্ছ, তার কাছে কিছুই অস্পষ্টতার ধোঁয়া মাখানো বা রহস্যের রঙ লাগানো মনে হয় না।

গোঁসাইজীর বিশেষ নির্দেশে সাধন লাভের পর দিন থেকে কিরণ নির্জন সাধনে রত হলেন। ছোট কুঞ্জে নির্জন স্থান আর কোথায়, গোঁসাইজীর শাশুড়ী মুক্তকেশী দেবী তাই কিরণকে তাঁর হেফাজতের ভাঁড়ার ঘরটি ছেড়ে দিলেন। পাছে ভাঁড়ারের জিনিষপত্র কেউ নষ্ট করে তাই ঐ ঘরে কিরণকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা তালা বন্ধ করে রেখে দিতেন। প্রায় তিন সপ্তাহ কিরণ সারাদিনের অধিকাংশ সময় নির্জন সাধনে কাটাতেন। এই সময় তাঁর প্রায়ই বাহ্যিক ব্যাপারে তেমন মনোযোগ থাকত না। এরই মধ্যে একদিন তিনি কুঞ্জের বাইরে গোবিন্দচকে বসে নাম করতে করতে এমনই নিবিষ্ট হয়ে গেলেন যে তাঁর কোমরের কাপড় যে আলগা হয়ে গেছে তা খেয়াল করলেন না। গোবিন্দচক থেকে কুঞ্জে এসে যখন পৌঁছালেন তখন সবাই

তাঁকে দেখে হাসাহাসি করছে দেখে নিজের দিকে চেয়ে দেখলেন যে তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে আছেন, কাপড় গোবিন্দচকেই ফেলে এসেছেন। ঐ অবস্থায় তিনি আবার গোবিন্দচকে কাপড়ের খোঁজে রওনা হলেন; কুঞ্জ থেকেই যে আর একখানা কাপড় পরে যেতে পারেন সে বোধ-ও তাঁর নেই।

কিরণ যে শুধু নাম সাধন নিয়ে মশগুল ছিলেন, তা নয়। নবীন সাধকের বিশেষ সম্বল সাধুসঙ্গ-ও তাঁর সাধন পথের সাথী হয়ে উঠল। আর বৃন্দাবনে তিনি তো স্বয়ং গুরুর সন্নিধানেই রয়েছেন; গুরুসঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ। সাধন প্রাপ্তির কয়েকদিনের মধ্যেই ২১, ২২ ও ২৩ আষাঢ় তিনি গোঁসাজীর ভ্রমণ-সঙ্গী হয়ে কেশীঘাট, সনাতন গোস্বামীর সমাধি, মদনমোহন ইত্যাদি বৃন্দাবনের তীর্থস্থলী দর্শন করলেন। সেবারে গোঁসাইজী ১৩০২ সালের ২৭ শ্রাবণ পর্যন্ত বৃন্দাবন ধামে ছিলেন। কিরণ বিভিন্ন দিনে শ্রীগুরু গোঁসাইজীর অনুগমন করে ধামের নানা বিগ্রহ ও প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করেন। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সমাধি, গোপকূয়া, দাবানল কুণ্ড ইত্যাদি গোঁসাইজীর ভ্রমণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৩২ আষাঢ় কিরণ গোঁসাইজীর সঙ্গে গিয়ে কাঠিয়া-বাবাজীকে দর্শন করেন। ১১ শ্রাবণ কিরণ ময়ুর মুকুট বাবার সঙ্গে পরিচিত হন, বাবা কিরণকে দেখেই জড়িয়ে ধরেছিলেন। কিরণ পরে জেনেছিলেন যে বাবা তাঁর গুরুভ্রাতা। বিশিষ্ট অন্য গুরুভাইদের মধ্যে বৃন্দাবনে কিরণের সঙ্গে বিপিন পাল মশাইয়ের-ও সাক্ষাত হয়। বিপিন পাল ২৪ শ্রাবণ গোঁসাইজীকে দর্শন করতে এসেছিলেন।

গোঁসাইজী বলেছিলেন, সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হলে আর সৎসঙ্গের প্রয়োজন হয় না। মহাজন বাণীতে-ও তাই 'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া' বলে সাধকের চলার পথের ক্রম বর্ণিত হয়েছে। ভজনক্রিয়ার সূচনা হলেই সাধুসঙ্গের পর্যায়টি সমাপ্ত বা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। অথচ দরবেশজী পরিষ্কার বলেছেন যে নাম ও সাধুসঙ্গ এই দুটিই সাধকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। দরবেশজীর

সাধুসঙ্গ কিন্তু প্রচলিত অর্থে সাধুর বা সজ্জনের সঙ্গ বোঝায় না, তাঁর পরিভাষায় সাধুসঙ্গের মানে হল গুরু এবং গুরুভ্রাতাদের সঙ্গ ও ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থের পাঠ বা সঙ্গ। সদ্‌গুরু সাধন যাঁরা লাভ করেছেন তাদের পক্ষে সাধারণ অর্থে যে সাধু বোঝায় তা শুধু নিষ্প্রোয়জন-ই নয়, বরং যার তার সঙ্গে তাঁদের বহুসঙ্গের পাপ হয় এবং দরবেশজীর ভাষায় বহুসঙ্গ বেশ্যাসঙ্গের ন্যায় অপকারী। সাধক কিরণ-ও তাই তাঁর সাধন জীবনে যখনই সম্ভব তখনই স্বয়ং শ্রীগুরুর সাক্ষাত সঙ্গ লাভের জন্য লালায়িত থেকেছেন এবং অন্য সময় তাঁর গুরুভ্রাতাদের সাহচর্যে থাকতে চাইতেন, তাঁদের সঙ্গ খুঁজে নিতেন। বিচার করে বুঝতে গেলে মনে হয়, সাধনের যে অবস্থায় শ্রীনাম ও শ্রীগুরুর মধ্যে দ্বিত্ব বোধ আর থাকে না তখন হয়ত নাম নিয়ে থাকলেই শ্রীগুরুর সঙ্গ বা সর্বোত্তম সাধুসঙ্গ একই সাথে জুটে যায় বলে আর পৃথক ভাবে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু না, গোঁসাইজী তাঁর প্রকট লীলার প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত সদ্‌গ্রন্থ পাঠ তাঁর নিত্যকর্মের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। গোঁসাইজী দিনের অধিকাংশ সময় শাস্ত্রাদি পাঠে কাটান কেন এ কথা তাঁর জনৈক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন যে, বাইরের সঙ্গে যোগ রাখার জন্যই তাঁকে এত দীর্ঘ সময় পাঠাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হয়; নইলে আভ্যন্তরীণ আকর্ষণে আত্মস্থ করে তাঁর বাইরের কার্যকলাপ বন্ধ করে দিতে চায়। তেমনি দেখা যায় দরবেশজী তাঁর পরিণত জীবনেও তাঁর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গ পেলে কী রকম উল্লসিত হয়ে উঠতেন। দরবেশজী কথিত সাধুসঙ্গের প্রয়োজন তাই বোধ হয় কখনই ফুরায় না।

এই সাধুসঙ্গের কোন কষ্ট কল্পিত মানে না করে সাদামাটা অর্থ ধরে নেয়াই সঙ্গত। গুরুর সাক্ষাতে ভগবৎ-প্রসঙ্গ বা তত্ত্ব আলোচনা করলে বা শুনলেই যে সাধুসঙ্গ হল, তা নয়। গুরু ভাইদের সঙ্গে মিশে সর্বদা সৎপ্রসঙ্গ করতে হবে এমন-ও কোন কথা নেই। গুরু বা

গুরুভাইদের কাছাকাছি থাকলেই, তাঁদের সঙ্গে যে কোন বিষয়ের আলাপেই সাধুসঙ্গের ফল লাভ হয়। সদ্‌গ্রন্থ বা ঋষি প্রণীত গ্রন্থ পাঠ সম্বন্ধে-ও সেই একই কথা। গ্রন্থ পাঠে মূল গ্রন্থই পড়তে হয় বা আবৃত্তি করতে হয়; তার অন্তর্নিহিত অর্থ বা তাৎপর্যের মর্ম উদ্ধারের কোন চেষ্টা করা দরকার হয় না, বরং ঐ চেষ্টা অনেক সময় অনেক অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ কী—এ নিয়ে-ও গোল বাধতে পারে। ঋষি বলে যাঁরা সর্বজন পরিচিত সেখানে অবশ্য কোন সংশয়ের অবকাশ নেই; কিন্তু ধর্মগ্রন্থ বলে প্রচারিত বা প্রচলিত সব গ্রন্থই সদ্‌গ্রন্থ নয়। অথচ ঋষি বলে পরিচিত না হলেও ঋষিপদবাচ্য মহাজনদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ পাঠ করা সাধুসঙ্গের মধ্যে অবশ্যই পড়ে। এ রকম গ্রন্থ নির্বাচন যদি করতেই হয় তবে গুরুর প্রত্যক্ষ আদেশ মত চলা-ই নিরাপদ। একই বই একজনের জন্য গুরু নির্দিষ্ট হলে-ও অন্যের পক্ষে উপাদেয় ও হিতকর না-ও হতে পারে।

১৩০৪ সালের ফাল্গুন মাস। গোঁসাইজীর নীলাচল যাত্রা সাব্যস্ত হয়েছে। কিরণ সে সময় নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করছেন। অমৃতলাল সেনের চিঠিতে গোঁসাইজীর সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে কিরণ ঊর্ধ্বশ্বাসে কলকাতা ছুটে এলেন, বাসনা গোঁসাইজীর সঙ্গেই পুরী যাবেন। গোঁসাই তখনই কিরণকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হলেন না। কিরণ ক্ষুণ্ণ হলেন, কাতর ভাবে গোঁসাইজীকে বললেন, 'আমি বয়সে ছেলেমানুষ, হয়ত অনেক দিন বাঁচবো; আপনি বুড়ো মানুষ, আমার আগেই দেহত্যাগ করার কথা। বড়ই সাধ হয়, আপনি যতদিন দেহে থাকেন ততদিন আপনার সঙ্গ করি।' গোঁসাইজী ঈষৎ হেসে বললেন, 'পাগল, সম-প্রাণ না হলে কি সঙ্গ হয়? দুজনের চিত্ত এক অবস্থায় এলে তখন সঙ্গ হয়, এক বাড়িতে বাস করাই সঙ্গ নয়।' কিরণ তখন করজোড়ে নিবেদন করলেন, 'ঠাকুর, আপনার সঙ্গে সম-প্রাণ হয়ে সঙ্গ করা আমার

কোনো জন্মেও হবে বলে আমি মনে করি না। আমি এ জন্মে আপনার সঙ্গে মাত্র এক বাড়িতে বাস করতে চাই। আমার ন্যায় হতভাগার পক্ষে সে-ই যথেষ্ট।' গোঁসাই একটু চুপ করে থেকে এমন স্নিগ্ধ চোখে কিরণের দিকে তাকালেন যে তাঁর উদ্বেলিত চিত্ত শীতল হয়ে গেল। গোঁসাইয়ের এই চাউনির মধ্যে কিরণ তাঁর নিবেদনের তাঁর বক্তব্যের সমর্থন ও প্রশ্রয় পেলেন। সেবার কিরণের গোঁসাইয়ের সঙ্গে পুরী যাওয়া হল না বটে, কিন্তু এক বাড়িতে বাস করে যে গুরুসঙ্গ আস্বাদন করার প্রার্থনা ছিল কিরণের, তা গোঁসাই অনেকাংশেই মঞ্জুর করেছিলেন, আলোচনা প্রসঙ্গে তা ক্রমশ দেখতে পাওয়া যাবে।

দরবেশজীর কাছাকাছি যাঁরা বেশ কিছুদিন ধরে থাকার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা অনেকেই তাঁর নৈশ আহার পর্বের পরের জমাট আড্ডার শরিক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। একটু বেশি রাত্রে এ বৈঠক বসত এবং যে সব প্রসঙ্গ বা সরস গালগল্প সেখানে পরিবেশিত হত তার অনেকখানিই তথাকথিত ভগবৎ প্রসঙ্গ বা সৎপ্রসঙ্গ বলে চালানো যেত না। দরবেশজীর মুখের অনেক রসের গল্প ও হিউমারের কাহিনী এই সব বৈঠকেই শোনা যেত। রসিক শিষ্যের একটি দল এই নৈশ বৈঠকের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। দরবেশজীর বেশ সীরিয়াস শিষ্য-ও অনেক ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ গুরুঠাকুরের এই সমস্ত মানুষী গল্পসল্প তেমন ভাল চোখে দেখতেন না। এমনই একজন ছিলেন শান্তিপুরের ধনঞ্জয় চক্রবর্তী ; নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ, রীতি নীতি আচার ব্যবহারের দিকে কড়া দৃষ্টি। কাশীর আশ্রমে ধনঞ্জয় দরবেশজীর এই নৈশ আড্ডায় কদিন যোগ দিয়ে বড় ক্ষুব্ধ হলেন এবং দরবেশজীকে বলেই ফেললেন যে রাতের এই বৈঠকে যদি ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা হয় তাহলে সবাই উপকৃত হবেন, বাজে আলোচনায় কারোরই কোন লাভ হচ্ছে না। দরবেশজী ধনঞ্জয়ের প্রস্তাব মেনে নিলেন, পর পর কদিনই রাত্রের অধিবেশনে বেশ গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা ও

আলোচনা হল। ঐ কদিনেই কিন্তু আড্ডার সদস্য সংখ্যা কমতে কমতে ধনঞ্জয় ও আর দু' একটিতে এসে দাঁড়াল, সৎ প্রসঙ্গে বিশেষ কারোরই তেমন রুচি নেই দেখা গেল, অন্তত ঐ প্রসঙ্গের খাতিরে নৈশ আহারের পরের আমেজী ঘুমকে বঞ্চিত করতে অনেকেই যে নারাজ তা বোঝা গেল। দরবেশজী ধীরে ধীরে আড্ডায় পুরোনো মেজাজ ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। গোঁসাইজীর সঙ্গে মাত্র একই বাড়িতে বাস করার যে সঙ্গ-গুণের কথা দরবেশজী জানতেন ও মানতেন; তিনি এ-ও জানতেন যে তাঁর অনুগত শিষ্যেরা যে কোন ছুতায় তাঁর কাছে বসে থাকলেই তাঁদের মহা উপকার হবে, নিছক গ্রাম্য কথার আকর্ষণে তাঁর সামনে বসে থাকলেও তাদের সাধুসঙ্গই করা হবে।

শ্রীগুরুর সঙ্গে একত্র বাস সকলের পক্ষে সুলভ নয়, গুরুদেবের অপ্রকট অবস্থায় তো এই একত্র বাস করা সম্ভবই হয় না। এজন্য গুরুভাইদের সঙ্গই সাধক জীবনের সহজতর ও স্বাভাবিক সাধুসঙ্গের উপায়। দরবেশ দর্শনের ৮।১২ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী লিখেছেন, 'গুরুভ্রাতাদের সঙ্গের অভাবে দিন দিন তোমার ভিতরে শুষ্কতা আসিতেছে। এজন্য গোঁসাই সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ করা এবং কীর্তন করা একান্ত আবশ্যক মনে করি।' গুরুদেবের সঙ্গ বলতে যেমন তাঁর কাছাকাছি বাস করাকেই দরবেশজী বুঝতেন, গুরুভাইসঙ্গ বলতেও তাই-ই জানতেন। সঙ্গ করতে হলেই যে তথাকথিত সদালোচনাই করতে হবে তা নয়, যেন তেন প্রকারেন গুরুভাইয়ের সংস্পর্শে, কাছাকাছি আসতে পারলে, থাকতে পারলেই সাধুসঙ্গ করা হয়। এ প্রসঙ্গে গোঁসাইজী বর্ণিত কাহিনীটি উল্লেখ করা যেতে পারে। গয়াতে একজন লোক দীক্ষা নেয়ার পর বিশ বছর মদ, বেশ্যা, ঘুষ ইত্যাদি নিয়ে মজে থাকে। হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী তাঁর কাছে ভিক্ষার জন্য এলেন। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে লোকটি সন্ন্যাসীকে প্রহার করল, কিন্তু সন্ন্যাসীর দেহের স্পর্শ মাত্রই তার সাধনের একটা অবস্থা খুলে গেল, সে সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। দুজনেই ক্রমে জানতে

পারল যে তারা পরস্পরের গুরুভাই। লোকটির জীবন ওলটপালট হয়ে গেল, সব ছেড়ে দিয়ে সে আবার গুরুর কাছে গিয়ে সাধন পথে উচ্চ অবস্থা লাভ করল। দেখা যাচ্ছে যে নিতান্ত অজানতে হলে-ও গুরুভাইদের সংস্পর্শে এলেই সাধন পথে অনেক সহায়তা হয়। সমস্ত পরিচিত গুরুভাইকেই সমান শ্রদ্ধা করা বা প্রীতি করা অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না, কাছাকাছি থাকলে কারোর সঙ্গে কখনো কখনো মনোমালিন্য বা কলহ হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। দরবেশ দর্শনের ১১।১১ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী লিখেছেন যে তাঁরা অর্থাৎ গোঁসাইজীর শিষ্যেরা পরস্পর বহু মারামারি-ও করেছেন। দরবেশজী তাঁর জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলীর পঞ্জিকা বইয়ে ১৩০৫ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ তারিখের একটি ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন যে পুরীতে গোঁসাইজীর সঙ্গে একত্রে বসবাস কালে তাঁর সঙ্গে অশ্বিনী বৈরাগীর হাতাহাতি হয়, অবশ্য আধঘণ্টা পরেই দুজনের আবার ভাব হয়। হাতাহাতি হোক বা মারামারি হোক, সৎপ্রসঙ্গেই হোক কি নেহাত অসৎ আলোচনাতেই হোক, প্রসন্নতায় হোক অথবা বিরক্তিতেই হোক গুরুভাইদের সঙ্গ যথার্থই সাধুসঙ্গ, গুরুভাইয়ের দর্শন ও স্পর্শ অবশ্যই সাধু দর্শন, সাধন পথের নিশ্চিত অবলম্বন। পুরীধামে অবস্থান কালে গোঁসাইজীর শিষ্যদের মধ্যে কত মতান্তর মনান্তর হয়েছে এবং কখনো কখনো গোঁসাইজী তা নিয়ে বেশ বিরক্তি ও ক্লেশ প্রকাশ করেছেন— এর উল্লেখ গোঁসাইজীর বিভিন্ন চরিতকারের লেখাতেই দেখতে পাওয়া যায়। অথচ সতীশ মুখোপাধ্যায় (ছোট সতীশ) তাঁর ডায়েরীতে ১৩০৫ সালের ২২ বৈশাখ তারিখের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে লিখে গেছেন যে ঐ দিন বিধু ঘোষের সঙ্গে মহাপ্রসাদ পাওয়ার সময় তাঁর বচসা হয় এবং শেষটায় মহাপ্রসাদের হাঁড়ি ভাঙ্গাভাঙ্গিতে গিয়ে গড়ায়। ব্যাপারটা গোঁসাইজীর নজরে আসায় তিনি বললেন, 'মাঝে মাঝে রাগারাগি হওয়া ভাল। মন নিস্তেজ হলে ওতে সতেজ হয়।'

গুরুদেবের সাক্ষাত সঙ্গ এমন কি গুরুভাইয়ের সঙ্গ করাও যে-

সাধকের ভাগ্যে জোটে না তার পক্ষে সাধু-সঙ্গের একমাত্র উপায় ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ পাঠ। যাঁরা নিত্য ভজনের অঙ্গ হিসাবে নিয়মিত পাঠ করে থাকেন এবং শ্রীগুরুর নির্দিষ্ট গ্রন্থাদি নিত্যপাঠ্য ভাবে গ্রহণ করেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। সদ্‌গুরু সাধনে এই নিত্যপাঠ একটি ভজনাঙ্গ মাত্র, আবশ্যিক কিছু নয়। এ বিষয়ে দরবেশ দর্শনের ১।২১ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী লিখেছেন, 'এই শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে কেহ কেহ বলেন কীর্তন করিতে ইচ্ছা করে, কেহ কেহ বলেন পাঠ করিতে ইচ্ছা করে, কেহ বলেন গোঁসাইয়ের ছবি সেবা পূজা করিতে ইচ্ছা করে। আমি ইহাদিগকে ইহাদের ইচ্ছামত ঐ ঐ কার্য কি ভাবে করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেই।' নাম সাধনের আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসাবে প্রাণায়াম যেমন উপযোগী এই রকম নিত্য নিয়মিত কোন কোন গ্রন্থ পাঠ-ও উপযোগী। কিন্তু প্রাণায়াম যেমন সাধন নয়, নিত্য পাঠ-ও তেমন সাধন নয়, সাধনের সহায়ক বা অনুপূরক মাত্র। সাধনের বিকল্প হিসাবে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ গ্রাহ্য নয় অর্থাৎ পাঠের খাতিরে নাম সাধনের যদি কোন হানি ঘটার সম্ভাবনা থাকে তবে এই নিত্যপাঠ সাধকের পক্ষে একটা উপদ্রব হয়ে দাঁড়াতে পারে। বলা বাহুল্য এই নিত্য পাঠের গ্রন্থ শ্রীগুরুর নির্দিষ্ট হওয়া দরকার, সব গ্রন্থ সব সাধকের কল্যাণদায়ক না হতে পারে। দরবেশ দর্শনের ৬।৩৫ এবং ৬।৪৫ নম্বর পত্রাংশে কোন কোন নিত্য পাঠ্য গ্রন্থের নাম করা আছে কিন্তু ওগুলি যাঁদের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁদের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু সাধুসঙ্গ হিসাবে যে গ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থা তা কিন্তু ঠিক নিত্যপাঠের মত ভজনাঙ্গ নয়। সাধকের যে অবস্থায় সাধুসঙ্গ প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে তখনই সাধুসঙ্গের অন্যতম বিকল্প রূপে এই গ্রন্থপাঠ দরকার হয়, আবার সাধুসঙ্গের প্রয়োজনটি সাময়িক ভাবে মিটে গেলেই গ্রন্থপাঠ-রূপ সাধুসঙ্গ করার প্রয়োজন হয় না। দরবেশ দর্শনের ৮।১১ এবং ৮।১২ নম্বর পত্রাংশে সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গের প্রয়োজনে যে পাঠ সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত রয়েছে। এই পাঠের গ্রন্থ নির্বাচনে প্রত্যেক সাধকের জন্য

পৃথক পৃথক নির্দেশের অপেক্ষা করে না; ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ বা শ্রীগুরুর কথিত ঋষিপদবাচ্য যে কোন মহাজন-কৃত গ্রন্থই সাধুসঙ্গের ফলদায়ী হয়। নাম সাধনে শুষ্কতার অধ্যায়গুলিতেই এই গ্রন্থপাঠ অবলম্বন করতে হয়, সাধনে রুচি ফিরে এলেই এই পাঠের আর আবশ্যকতা থাকে না। এই প্রসঙ্গে গোঁসাইজী একটি উক্তি স্মরণযোগ্য—'যখন নাম করতে আলস্য বোধ হবে তখন শাস্ত্র কী অন্যান্য সদ্গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। যিনি সর্বদা নাম করতে পারেন, তাঁর আর কোন গ্রন্থপাঠের দরকার নেই।'

গোঁসাইজী হরিদাস বসুকে যে সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রতিদিন এক অধ্যায় করে পাঠ করার নির্দেশ দেন, তখন হরিদাস বাবুর বৈষ্ণবী আচারের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা, আরতির ঘণ্টাধ্বনির শব্দ কানে এলে মারধর করে তা থামিয়ে দেবার প্রবল ইচ্ছা জাগে তাঁর। অথচ কালে এই গ্রন্থ তাঁর সাধন জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দরবেশ দর্শনের ১২।৫ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী তাঁর শিষ্য নরেশ সেনকে-ও তেমনি স্বপ্নের মাধ্যমে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকে নিত্য নিয়মিত সাধনের মতই গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীগুরুর বিশেষ নির্দেশে সাধনের পরিপূরক হিসাবে এই যে পাঠ—এর মূল্য ও মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। এই পাঠ ও নাম সাধন একই বস্তুর রকমফের মাত্র।

গোঁসাইজীর সঙ্গে বৃন্দাবন বাসের সময় কিরণের যে সব অবিস্মরণীয় আনন্দের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল তার মধ্যে একটি শ্রীবৃন্দাবন পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা—১৩০২ সালের ২২ শ্রাবণ। দ্বিতীয়টি, শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন। ২৫ আষাঢ় সান্ধ্য কীর্তনে কিরণ জীবনে প্রথম ভগবান বিজয়কৃষ্ণের নৃত্য দেখে মোহিত হন। সেই রাত্রে তীর্থমণির কুঞ্জে মহাভাবের তরঙ্গ যেন উদ্বেল হয়ে উঠল; কেউ হাসে কেউ কাঁদে, কেউ বা গড়াগড়ি যায়। কীর্তন চলেছে আর সেই কীর্তনের সঙ্গে গোঁসাইজীর নয়ন-মন-বিমোহন নৃত্য; সেই নৃত্যের তালে তালে যেন সারা কুঞ্জই নেচে চলেছে, কুঞ্জের প্রতি অণু পরমাণু

যেন সেই অপরূপ নৃত্যের প্লাবনে সিক্ত হয়ে সমস্ত কুঞ্জটিকেই নৃত্যময়, মধুময় করে তুলল। গোঁসাইজীর সেই মধুরাদপি মধুর নৃত্যের বর্ণনা-প্রসঙ্গে লীলানুস্মৃতি গ্রন্থে দ্বারিকানাথ রায় মশাই লিখেছেন, 'যেদিন স্বয়ং প্রভু উঠিয়া নৃত্য করিতেন, চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ মধ্যস্থলে প্রভু, কত না মধুর ভঙ্গিতে উর্ধ্ববাহু হইয়া নৃত্য করিতেন। প্রভুর ভাব বিভূষিত বিরাট লম্বিত তনু সকলের মাথার উপর দিয়া দেখা যাইত। দীর্ঘ জটাগুচ্ছ মুকুটের মত যখন প্রভুর মস্তকের উপর দাঁড়াইয়া উঠিত, তখন ভাবাবেগে কী আনন্দের জোয়ার উঠিত, সে তরঙ্গের সঞ্চারী শক্তিতে স্থাবর জঙ্গম সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িত।' গোস্বামী প্রভুর একদিনের নৃত্যের উল্লেখ করে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃতকার লিখ্ছেন,—

বিবাহের পরদিন হইল কীর্তন।
ভক্তগণে প্রেমানন্দে করিল নর্তন॥
বৈদ্যুতিক শক্তি খেলে সংকীর্তন মাঝে।
অভিভূত করে তাহে ভকত সমাজে॥
ভগবৎপ্রেমে প্রভু হইয়া বিভোর।
হরিধ্বনি করে বহে দু নয়নে লোর॥
উদ্দণ্ডে নাচিয়া যবে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
আকাশ কম্পিত করে প্রতিধ্বনি তার॥
মহাভাব চিহ্ন হয় শরীরে প্রকাশ।
নরনারী প্রাণে জাগে মহা প্রেমোল্লাস॥

যে কীর্তন-নর্তন রঙ্গে স্থাবর জঙ্গম অভিভূত ও মুগ্ধ হত, সেই নৃত্যলীলা যে নব-অনুরাগী সাধক কিরণের পরম বিস্ময় ও আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠবে সে আর বিচিত্র কি? শুধু এই একদিন-ই নয়, ৩০ আষাঢ় বৃন্দাবনের বাবাজীদের নগর কীর্তনে, ১৬ শ্রাবণ কুঞ্জে সান্ধ্য কীর্তনে এবং ১৮ শ্রাবণ প্রভাতী কীর্তনে গোঁসাইজী নৃত্য আস্বাদনের সুযোগ লাভ করে কিরণ ধন্য হন।

১৩০২ সালের ২৭ শ্রাবণ সকালে কিরণ মথুরা দর্শনে যান, ফিরে এসে খবর পেলেন গোঁসাইজী ঐ দিনই বৃন্দাবন ছেড়ে যাবেন। কিরণ গোঁসাইজীর সঙ্গী হয়ে বিকেলে মথুরায় এলেন। সন্ধ্যায় সবাই মিলে নৌকা করে বিশ্রাম ঘাটের আরতি দর্শন করলেন। রাত্রে মথুরা স্টেশন থেকে ট্রেনে করে গোঁসাইজী সদলবলে কলকাতার পথে রওনা হলেন। স্টেশনে স্বামী সচ্চিদানন্দজীর (হরিমোহন) উদ্দণ্ড নৃত্য সকলকে আনন্দ দিল ; গোঁসাইজী স্বামীজীকে প্রাণখোলা আশীর্বাদ করলেন।

বৃন্দাবন থেকে কলকাতা ফেরার পথে ১৩০২ সালের ২৯ শ্রাবণ গোঁসাইজী বাঁকিপুরে তাঁর শিষ্য ব্রজেন্দ্র মোহন দাসের বাড়িতে সশিষ্য দু'দিন অবস্থান করেন ; ২৮ শ্রাবণের প্রাত্যহিক সান্ধ্য কীর্ত্তন ট্রেনের কামরাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাঁকিপুরে কিরণ ভিখনদাস বাবাজীকে দর্শন করেন, বাবাজী-ও পরদিন গোঁসাইজীকে দর্শন করতে এলেন। ৩০ শ্রাবণ বিকেলের ট্রেনে কলকাতা রওনা হয়ে ৩১ শ্রাবণ কিরণ গোঁসাইজীর সঙ্গে কলকাতা পৌঁছে ১৪।২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় আশ্রয় নিলেন। ১০ ভাদ্র পর্যন্ত কিরণ কলকাতায় গোঁসাইজীর আশ্রয়েই কাটালেন। বাঁকিপুরে এবং কলকাতায় থাকার সময় প্রায় প্রত্যহ কিরণ অবাক বিস্ময়ে গোঁসাইজীর সেই অপার্থিব নৃত্য দর্শন করলেন। ৭ ভাদ্র তিনি গোঁসাইজীর সঙ্গে মাণিকতলার মাকে দর্শন করতে যান। ৮ ভাদ্র শ্যামবাজার মিত্রালয়ে শ্রীশ্রীমদনমোহন দর্শন করতে গিয়ে গোঁসাইজী উদ্দণ্ড নৃত্য করেন এবং সশিষ্য সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৯ ভাদ্র গোঁসাইজীর আশ্রমে কীর্তনীয়া মুকুন্দ দাসের কীর্তন অনুষ্ঠান হয়, কীর্তনে গোঁসাই ভাবাবেশে নৃত্য করেন। ছায়ার মত এতদিন গোঁসাইজীকে অনুসরণ করে ১০ ভাদ্র কিরণ কলকাতা থেকে যাত্রা করে পরদিন বরিশাল গিয়ে পৌঁছালেন।

১৩০২ সালের ১৭ আষাঢ় থেকে ১০ ভাদ্র পর্যন্ত মোট ৫৮ দিন গোঁসাইজীর সান্নিধ্যে কাটিয়ে, প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁর সঙ্গ করে

কিরণ নতুন মানুষ হয়ে আবার যেন বাস্তবের রাজ্যে ফিরে এলেন। এই দীর্ঘ দিন গোঁসাই সহবাসে থেকে, তাঁকে কাছ থেকে অন্তর দিয়ে দেখে দেখে কিরণ যেন তার অন্তরঙ্গ হয়ে গেলেন; গোঁসাইয়ের সঙ্গে কিরণের এমন একটা সহজ যোগসূত্র স্থাপিত হল যে প্রবর্ত্তক অবস্থায় প্রাথমিক যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব সাধন-পথিককে বিব্রত করতে চায় তার আর কোন অবকাশই রইল না কিরণের জীবনে। দিনের পর দিন তিনি তাঁর গুরুকে, গোঁসাইজীকে নানা রূপে, বিভিন্ন মূর্তিতে দর্শন করলেন আবার সেই আপাত নিস্তরঙ্গ, নিষ্কম্প্র ভাগবতী তন্নকে আশ্রয় করে মহাভাবের বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গ মনপ্রাণ দিয়ে আস্বাদন করতে করতে কিরণ কখন যে সংশয় পারাবার পেরিয়ে নিশ্চিত প্রত্যয়ের, ধ্রুব বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমির আশ্রয় পেয়ে গেলেন তা যেন তিনি নিজেও টের পাননি। বৃন্দাবনে বসেই গোঁসাইজীকে কখনো তিনি দেখেছেন জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবার কখনো বা সাক্ষাৎ শিবরূপে। তাঁর বাইরের ব্যবহার কখন-ও বজ্রের মত কঠোর আবার কখন-ও বা কুসুমের মত কোমল—কখনও বা কঠোর ও কোমলের অপূর্ব, অভিনব মাখামাখি। বৃন্দাবনে থাকতেই গোঁসাইজী কিরণের ঠাকুর হয়ে গেলেন। ভগবৎ বিশ্বাসে, ঈশ্বর বোধে কখনো সখনো সংশয়ের মেঘ এসে ছায়া ফেলে, অনেক আদর্শ ও অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া ভগবানের ক্ষণিক বিচ্যুতি ও সামান্য অপ্রাপ্তিতে বিশ্বাসের স্তম্ভে চিড় খেয়ে যায়, কখনো বা ফাটল ধরে। ঠাকুরকে নিয়ে, ভগবান আর মানুষ মিশিয়ে গড়া ঠাকুরকে নিয়ে এ ঝামেলায় পড়তে হয় না। ঠাকুরকে কখনো সংশয় হয় না, বড় জোর কখনো অভিমানের শিশির লেগে ভেজা ঠাকুরকে আরও মধুর লাগে, আরও অপরূপ মনে হয়। ভাগ্যবান কিরণ তাই অতি অল্পেই ঠাকুর পেয়ে গেলেন। সংশয়ের ক্লেশ তাঁকে আর পেতে হল না। 'মন্দিরে' দরবেশজী তাই কত অনায়াসে বলতে পেরেছেন,

ভেবে দেখ কত যুগ ধরি
তোমায়-আমায় পরিচয় ;
ভুলেছিনু মাঝে ক'টা দিন,
ক'টা দিন পাইনি সময়।

নবীন কিন্তু সীরিয়াস সাধকের সাধন লাভের অব্যবহিত পরেই দু'টি বৃত্তি সহসা কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল হয়ে ওঠে ; একটি, সাধনের পরিণতি সম্বন্ধে প্রবল কৌতূহল, অপরটি তার নিজের রিপু ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য যে অতৃপ্তি তার অবিলম্বে উপশম বা নিবৃত্তির জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠা। সাধন জীবনের সূচনাতে কিরণ-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বৃন্দাবনে বসে তিনি গোঁসাইজীকে নিভৃতে প্রশ্ন করলেন তাঁর বৃন্দাবন লীলা দর্শন হতে পারে কিনা। বৃন্দাবন লীলা কী বস্তু সে সম্বন্ধে কিরণের তখনই কোন পরিষ্কার ধারণা থাকার কথা নয়, আর অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও সেই লীলা দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠ হয়ে ওঠা তখন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। এ প্রশ্ন নিতান্তই কৌতূহলীর প্রশ্ন, জিজ্ঞাসুর নয়। গোঁসাইজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে আশ্বাস ও উপদেশ মিশিয়ে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা বড় মনোরম, বলেছিলেন, 'লীলা দর্শন হবে না কেন ? আমি তো সর্বদাই লীলা দর্শন করছি। এখানে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা আজ-ও চলছে, তার বিরাম নেই। তোমরা দেখবে না তো কে দেখবে, এই সাধন যারাই পাবে একদিন না একদিন তারা এই লীলা দর্শন করবেই। এ সাধন যে পেয়েছে তার আর কোন ভয় নেই। কেমন করে যে কী হয়ে যাবে তা সে বুঝতেই পারবে না, কিন্তু হবেই। ঘরের মালিক যখনই বুঝবেন এবার দরজা খোলা দরকার এক মুহূর্তে দরজা খুলে যাবে এবং সমস্ত ঘর আলোতে ভরে যাবে। তখন ঘর-ও হেসে উঠবে, ঘরের মালিক-ও আনন্দে হাততালি দিবে। সাধন করে যাও, হিসেব নিকেশ কোরো না, আর না পার আমার উপর সব ছেড়ে দাও।' কিরণের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল রিপু সংক্রান্ত, জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বলেছেন, আমি

কতকাল ধরে আপনার সেবক ছিলাম, কিন্তু তবু এ জীবনে আমার ক্রোধাদি রিপু এত প্রবল হল কেন ?' গোঁসাইজী উত্তরে বললেন, 'রিপুর প্রবলতা সংসর্গজ। খাদ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বাল্যে তোমার দেহে রিপুর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দিলেও তোমার তুমিত্ব আমার কাছেই বাঁধা রয়েছে ; যখনই টেনেছি, তোমাকে ছুটে আসতে হয়েছে। রিপুর ক্ষমতা কি এই সাধনের অধিকারীকে আয়ত্ব করে ? সব আপনা আপনি খসে যাবে। ভয়েরও কিছু নেই, ভাবনার-ও কিছু নেই।' না, এ আশ্বাস-বাণী শুনে-ও রিপুর উপদ্রব নিয়ে সাধক কিরণের নালিশ থেমে যায় নি, এ অভিযোগ নিয়ে বারংবার তিনি গোঁসাইজীকে বিব্রত হয়তো বা বিরক্ত-ও করেছেন—আলোচনা প্রসঙ্গে তা দেখা যাবে। তবে তখনকার মত অধৈর্য কিরণ নিশ্চয়ই শান্ত হয়েছিলেন।

যথার্থ জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন এবং সাধনজীবনের নিছক কৌতুহল যে এক বস্তু নয় দরবেশ দর্শনের ২।৩৩ এবং ৬।৯৩ পত্রাংশে উত্তর জীবনে দরবেশজী সে কথা বলেছেন। সাধকের প্রাণের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দরবেশজী কত দীর্ঘ পত্র লিখেছেন তেমনি নিতান্ত কৌতুহলের জবাবে চিঠিতে কত ধমক দিয়েছেন—দরবেশ দর্শনের নিপুণ পাঠকের কাছে তা ধরা না পড়ে পারে না, আর রিপুর উত্তেজনা নিয়ে শিষ্যদেব যত নালিশ শুনতেন দরবেশজী তার উত্তরে তিনি যেন একটু প্রশ্রয়ের ভাবই প্রকাশ করতেন। সদ্‌গুরু সাধনে রিপুর বাধা যে কত অকিঞ্চিৎকর এবং কত সহজে রিপুর রূপান্তর ঘটে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি তা জানতেন বলেই বিশেষ কাউকে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখলে তিনি ওসবকে আমল না দিতেই বলতেন। দরবেশ দর্শনের ষোড়শ অধ্যায়ের পত্রাংশের বক্তব্যই এ কথার প্রমাণ করে। তা ছাড়া সদ্‌গুরু দরবেশজী তাঁর আশ্রিতজনের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য হয়ত ইচ্ছে করেই তাঁদের কামক্রোধাদি রিপুর প্রখরতা কমতে বা শান্ত হতে বাধা দেন একথা মনে করার-ও কারণ ঘটে দরবেশ দর্শনের

তিন অধ্যায়ের ১৩ ও ১৪ নম্বর পত্রাংশের বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে। ১৪ নম্বর পত্রাংশে তিনি বেশ স্পষ্টই বলছেন, 'পাপের ছায়াস্মৃতি যদি এখনই তোমার ভিতর হইতে সবটা চলিয়া যায়, তাহা হইলে তোমার অহংকারে ও অভিমানে শান্তিপুরে অন্য লোকের থাকা কঠিন হইবে। অতএব তোমার জন্মজন্মের বান্ধব শ্রীগুরু এখনই তোমাকে পাপের ছায়া হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি জানেন, কখন কী করিতে হইবে।'

১৩০২ সালের ২ আশ্বিন কিরণ বরিশাল থেকে খালিয়া বাড়িতে গেলেন এবং খালিয়ায় কিছুদিন কাটিয়ে ২৭ আশ্বিন আড়িয়লে মাখনদের বাড়িতে এলেন। সাধন লাভের পর তাঁর এই প্রথম আড়িয়লে মাখনদের সঙ্গে দেখা ; অভিষিক্ত, গোঁসাই-মণ্ডিত কিরণকে দেখে মাখন ও তাঁর মা যে অত্যন্ত খুশী হলেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সবচেয়ে যিনি সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত বোধ করেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই সরোজবালা—যাঁর প্রেরণাতেই কিরণের এই মহা উত্তরণের পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল। সাধন পাওয়া কিরণকে নতুন রূপে, তাঁর স্বরূপে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন সরোজবালা।

ঐ ২৭ আশ্বিন রাত্রে মাখনের মা ও মাখনের সঙ্গে এক বিছানয় শুয়ে গভীর রাত্রে তিনজনেই হঠাৎ টের পেলেন, ঘরের মধ্যে একটি প্রেতাত্মা ঢুকেছে। তিনজনেই ভয় পেলেন ও কাঁপতে লাগলেন। মাখনই প্রস্তাব করলেন, 'কিরণ, এসো এটাকে তাড়াই।' মাখনের মা মশারি তুলতে গিয়ে ভয়ে কিরণদের দিকে সরে এলেন। কিরণ উঠে মশারি তুলে আলো জ্বাললেন, মাখনের মা ধূপ জ্বালিয়ে দিলেন এবং মাখন নাম করতে বসলেন। ধূপ নিয়ে কিরণ সারা ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, স্পষ্টই বোধ করলেন কি একটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আড়িয়ল থেকে ১৬ কার্তিক কিরণ কুঞ্জ গুহঠাকুরতার স্ত্রী গোঁসাইজীর শিষ্যা কুসুমকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে বানরিপাড়া গেলেন।

কিরণের দীক্ষা লাভের পূর্বে ১৩০২ সালের বৈশাখের শেষাশেষি তিনি যখন খালিয়ায় দারুণ জ্বরে শয্যাগত তখন বরিশাল থেকে মাখন কিরণকে কুসুমের কথা লিখে একখানি চিঠি দেন, ঐ চিঠিতে কুঞ্জের গোঁসাইয়ের সঙ্গে বৃন্দাবন বাস করার সময় পতি বিরহে কুসুমের অদ্ভুত অবস্থা ও আচরণের কথা লেখা ছিল। সেই সময় থেকেই কুসুমকে দেখার জন্য কিরণের খুব আগ্রহ হয়। বানরিপাড়া থেকে ১৯ কার্তিক কিরণ নরোত্তমপুরে কুঞ্জের বাড়িতে এলেন। কুঞ্জবাবু সঙ্গে করে প্রথমে কুসুমকে কিরণের সামনে নিয়ে এলেন, কিরণ তাঁকে দর্শন করে মুগ্ধ হলেন কিন্তু তাঁর যেন তৃপ্তি হল না। কিরণের অনুরোধে একটু পরেই কুসুমকে আবার এসে তাঁকে দর্শন দিতে হল। এবারও হল না, তৃতীয়বার কুসুম সামনে আসতেই কিরণ বিহ্বল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন, কুসুমকে উজ্জ্বল দেবীমূর্তি-রূপ কিরণের দর্শন হল। কুসুমের চোখে-ও জল। গোঁসাইজীর অসাধারণ কৃপায় কুসুমের যে সব অপার্থিব অবস্থা লাভ হয়েছিল তার বিবরণ, ব্রহ্মচারীজী কুসুমকে দর্শন করতে গিয়ে যা জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন সে সমস্ত শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গের পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। উপসংহারে ব্রহ্মচারীজী যা লিখেছেন তা হল, 'তুই সপ্তাহ-কাল দিবারাত্রি কুঞ্জ কুসুমের সঙ্গে নিয়ত বাস করিয়া তাহাদের যে সুন্দর অবস্থা দর্শন করিলাম, তাহা প্রকাশ কবার উপায় নাই—উহা স্মরণের ও ধ্যানের বিষয়। সুস্পষ্টভাবে কুসুমের অসাধারণ অবস্থা ডায়েরীতে লেখা থাকিলেও তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে আমি সাহস পাইলাম না।' কিরণ ১৯ কার্তিক থেকে ২১ কার্তিক পর্যন্ত কুসুমদের বাড়িতে ছিলেন, ব্রহ্মচারীজী এরই তু'বছর আগে এখানে এসেছিলেন।

নরোত্তমপুর থেকে কিরণ ২২ কার্তিক বরিশালে এসে একদিন কাটিয়ে ২৪ তারিখ বাড়ি ফেরার পথে মাদারিপুর এলেন। মাদারিপুরের উকীল গুরুভ্রাতা যজ্ঞেশ্বর সেনের সঙ্গে কিরণের পরিচয় হল। পরবর্তী

জীবনে কিরণ বহুবার যজ্ঞেশ্বর বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন'। ২৫ কার্তিক থেকে ২৯ পৌষ পর্যন্ত কিরণ খালিয়ায় বাড়িতে কাটালেন। এর মধ্যে ১ অগ্রাণ, কার্তিক অমাবস্যা তিথিতে তিনি ইষ্টমাদুলী ধারণ করেন। এই ইষ্টমাদুলী সারা জীবন তিনি প্রত্যহ পূজা করতেন, এমন কি অবস্থা লাভের পর, সন্ন্যাস গ্রহণের পরও তিনি এই মাদুলী পূজা অব্যাহত রেখেছেন। ভুলে এই ইষ্টকবচ কলকাতায় ফেলে যাওয়ার ফলে ১৩৪৭ সালে গোঁসাইজীর শতবার্ষিকী উৎসবে শিকারপুর যাবার পথে নীলমণিগঞ্জ ষ্টেশনে দরবেশজী ও তাঁর সঙ্গী শিষ্যদের কি বিপর্যয় হয়েছিল, তা শ্রীশ্রীদরবেশজী প্রসঙ্গ বইয়ে সদানন্দ মিত্র বর্ণনা করেছেন।

শ্রীগুরুর প্রত্যক্ষ আদেশে ইষ্টমাদুলী ধারণা করার বিধি। গুরুদেবের ব্যবহৃত বা স্পর্শ করা বস্ত্রখণ্ড বা অন্য কোন বস্তু মাদুলীতে পুরে তা ধারণ করতে হয় এবং রীতিমাফিক পূজা করতে হয়। গোঁসাইজী তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের কতজনকে এই ইষ্টমাদুলী দিয়েছিলেন তা জানা নেই। তবে দরবেশজী তাঁর প্রায় কুড়িজন শিষ্য-শিষ্যাকে এই মাদুলী পূজা দিয়েছিলেন। নিয়মিত নিত্য সাধনের সঙ্গে বিশেষ অনুষ্ঠান সহকারে মাদুলী পূজা করার ব্যবস্থা। এ পূজায় বিশেষ তাৎপর্য কী, কেনই বা কারোর পক্ষে এর প্রয়োজন তা জানার উপায় নেই। তবে এটুকু বলা যায় যে সাধন জীবনে কোনও কোনও সাধকের জন্য গুরুদেব যেমন মালা তিলক ধারণ, দৃষ্টি বা ত্রাটক সাধন এমনকি আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করেন, ইষ্টমাদুলী-ও তেমনি একটা বিশেষ ব্যবস্থা—যার জন্য গুরুদেব ঐ ব্যবস্থা করেন তার পক্ষেই উহা উপযোগী হয়। বিশেষ ব্যবস্থা বলেই যে ওটা একটা আকাঙ্ক্ষণীয় প্রাপ্তি তা ভাবার কোন কারণ নেই।

দরবেশজী তাঁর শিষ্য মঙ্গল চাঁদ দাসকে পুরীর আশ্রমে বসে গোঁসাইজীর সমাধি স্পর্শ করানো তুলসীর মালা অনেকটা জোর করেই গলায় পরিয়ে দেন, কারণ হিসেবে বলেন, 'তোর খালি গলাটা যেন

অসুরের মত লাগে।' তুলসীর মালা ধারণ করলে মাছ খাওয়া চলে না। মঙ্গলচাঁদ মাছ খেতেন না ঠিকই, তবু দু'একবার চটে গিয়ে দরবেশজীকে এ কথাও বলেছেন যে তিনি যেন তাঁর পরানো মালা খুলে নেন কারণ মঙ্গলচাঁদ এবার থেকে মাছ খাবেন। না, দরবেশজী ও মালা আর খুলে নেননি। এই মঙ্গলচাঁদ কলকাতায় একবার দরবেশজীকে ধরে বসলেন যে তাঁকে ইষ্টমাদুলী দিতে হবে। দরবেশজী বললেন যে মঙ্গলের ও মাদুলীতে কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মঙ্গলচাঁদ নাছোড়বান্দা, তাঁর এত গুরুভাই-ভগ্নী মাদুলী পেয়েছেন, এই বিশেষ কৃপা থেকে তিনি কেন বঞ্চিত হবেন। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে দরবেশজী নিমরাজী হলেন, একটা দিন নির্দিষ্ট করে দিয়ে জানালেন যে সেদিন সকালে নিত্য পূজা সেরে উঠে তিনি মঙ্গলচাঁদকে মাদুলী দেবেন। উল্লসিত মঙ্গলচাঁদ এক ভরি সোনা দিয়ে একটা মাদুলী গড়িয়ে নিয়ে এসে নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন দরবেশজীকে দেখালেন, তিনি সেটা তাঁর আসনের নীচে রেখে দিলেন। পরদিন সকালে মঙ্গলচাঁদ রীতিমতন প্রস্তুত হয়ে মাদুলী ধারণ করতে এসে বসে আছেন, দরবেশজী তাঁর নিত্যকর্ম শেষ করে ঠাকুরঘর থেকে বেরোলেন কিন্তু সোনার মাদুলীটি আসনের নীচে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুজি করা হল, দরবেশজীর সেবক যোগানন্দ দরবেশজীর বিছানা-পত্র, বাক্স ইত্যাদি সব জায়গাতেই মাদুলীর জন্য দস্তুরমত তল্লাসী করলেন। কিন্তু মাদুলী উধাও। শেষটায় দরবেশজী যেন সান্ত্বনার মত মঙ্গলচাঁদকে বললেন, 'তোমার মাদুলী ধারণ গোঁসাইয়ের ইচ্ছে নয় বলেই ওটা পাওয়া গেল না।' মঙ্গলচাঁদের মাদুলী ধারণ করা আর হল না। আবার ত্রিপুরা দেবীকে দরবেশজী নিজে যেচে কাশীর মঠে বসে ইষ্টমাদুলী দেবার জন্য ডাকলেন, তাঁর দোতলায় বসার ঘরে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে মাদুলী পূজা শেখালেন। ত্রিপুরা দেবী সবটা দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'বাবা আমার তো নিজের কোন থাকার জায়গা নেই, কোথায় এমন নির্জন পাব যে মাদুলী পূজার নির্দিষ্ট

প্রাণায়াম করব ?' দরবেশজী সায় দিয়ে বললেন, 'তা ঠিক। আচ্ছা তোমার এই নির্দিষ্ট প্রাণায়াম না করলেও চলবে।' দেবী আবার নিবেদন করলেন যে পূজার জন্য তামার পাত্র, তুলসী পাতা ইত্যাদি যোগাড় করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দরবেশজী ওসব বিধি-ও তুলে নিলেন। এই রকম করে দফায় দফায় মাতুলী পূজার সমস্ত নিয়ম থেকে ত্রিপুরা দেবীকে মুক্তি দিলেন দরবেশজী—শেষটায় শুধু বললেন যে প্রত্যহ যেন তিনি স্নানের পর মাতুলী ধুয়ে একটু জল খান। ত্রিপুরা দেবী তাই-ই করতেন। অথচ মাতুলী ধারণ করার পর রীতিমত সদাচারে থেকে পূজা না করার জন্য দরবেশজী তাঁর এক শিষ্যের কাছ থেকে ইষ্টমাতুলী ফিরিয়ে নিয়েছিলেন বলে-ও জানা যায়।

১৩০২ সালের ২৯ পৌষ কিরণ ধুলট উৎসবে যোগ দিতে খালিয়া থেকে ঢাকা রওনা হলেন, ১ মাঘ থেকে উৎসব আরম্ভ হল। ঢাকা গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে গোঁসাইজীর প্রকট লীলায় এই-ই শেষ ধুলট উৎসব। এ উৎসবের একটি মনোজ্ঞ ও বিস্তারিত বিবরণ দ্বারিকানাথ রায় মশাইয়ের শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু লীলানুস্মৃতি গ্রন্থে বিবৃত আছে। এই মহোৎসবে উপস্থিত থেকে যে ক'টি ঘটনা কিরণের মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল তা-ই এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। ৫ মাঘ সান্ধ্য কীর্তনে গোঁসাইজীর এক অপূর্ব ভাবের বিকাশ হল, তিনি ত্রিভঙ্গ হয়ে যেন বাঁশী ধরে আছেন এমনি -ভাবে হাত দু'খানি রেখে দাঁড়ালেন, তাঁর মাথায় জটাভার যেন আপনা আপনি চূড়ার মত হয়ে গেল। সে এক অপূর্ব ভাব-বিগ্রহ। ৬ মাঘ সকালে বানরিপাড়া থেকে সমাগত ভক্তবৃন্দ 'অপরূপ আহা মরি মরি, হরি হরি বলছে বদনে' গানটি গেয়ে সবাইকে মাতালেন, গোঁসাইজী এই গানে বহুক্ষণ ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন। ঐ দিনই বিকেলে মুকুন্দ দাসের লীলাকীর্তনে গোঁসাইজী মাথায় ঘোমটা টেনে রাধাভাবে বহুক্ষণ মধুর নৃত্য করেন। ৭ মাঘ কিরণ গোঁসাইজীর সঙ্গে একরামপুরে ধুলট উৎসবে যান, ওখানে কীর্তনে নৃত্য করতে করতে গোঁসাইজী দু'ঘণ্টা সমাধিস্থ

থাকেন। ৮ মাঘ, গোঁসাইজীর শিষ্য মহেন্দ্র মিত্র ভাবাবেশে এক মালীর পুত্রকে দণ্ডবৎ করেন, ভাবাবিষ্ট ছেলেটি মিত্র মশাইয়ের মাথায় পা রেখে নিশ্চল হয়ে দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল। গোঁসাইজী এসে ছেলেটিকে প্রণাম করলেন এবং বললেন যে তার মধ্যে ভগবৎ শক্তি আবির্ভূত হয়েছেন। পরদিন ৯ মাঘ কিরণ উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান অপূর্ব নগর কীর্তনে যোগদান করে ধন্য হন।

এই ধুলট উৎসব উপলক্ষে কিরণের একান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা ঘটে দু'টি। প্রথমটি হল গোঁসাইজীর প্রসাদ পাওয়া নিয়ে। যেদিন গোঁসাইজী কীর্তনে রাধাভাবের নৃত্য করেন সেদিন নৈশ ভোগের পর কিরণ যোগজীবনের কাছে গোঁসাইয়ের প্রসাদ চাইতে তিনি জানান যে গোঁসাই কাউকে প্রসাদ দিতে বারণ করেছেন। শুনে কিরণ আহত বোধ করে উত্তেজিত হয়ে গোঁসাইজীকে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন যে সত্যি তিনি প্রসাদ দিতে নিষেধ করেছেন কিনা। গোঁসাইজী বললেন, 'হ্যাঁ, প্রসাদ দিতে পার তো নিতে পার।' কিরণকে খুব মুহ্যমান দেখে তিনি আবার বললেন, 'প্রসাদ অর্থে প্রসন্নতা, পাতের উচ্ছিষ্ট নয়। রোজ রোজ আমার পাতের উচ্ছিষ্ট খেলে কী হবে ? আমি দেখছি প্রাতে আমার খাওয়া চা যা অবশিষ্ট থাকে তা প্রসাদ বলে সবাই ভাগ করে খায়। এরপর আমি মরে গেলে আমার ফটোর কাছে চা দিয়ে সবাই প্রসাদ নেবে—এ সব কুসংস্কার।' গোঁসায়ের কথা শুনে কিরণের কান্না পেলো, তিনি আমতলায় গোঁসাইজীর আসনের কাছে বসে একা একা প্রাণ খুলে খুব কাঁদলেন। একটু শান্ত হয়ে কিরণ প্রতিজ্ঞা করলেন, যে পর্যন্ত গোঁসাইয়ের প্রসাদ না পান সে পর্যন্ত আর আহার গ্রহণ করবেন না। ভারাক্রান্ত মনে রাতে ঘুমিয়ে কিরণ স্বপ্নে দেখলেন, গোঁসাইজী তাঁকে বলছেন, 'প্রসাদের জন্য তুমি এত দুঃখিত হচ্ছ কেন ? প্রসাদ অর্থে প্রসন্নতা লাভ করা। আমি তো তোমাদের উপর সর্বদাই প্রসন্ন রয়েছি, তবে আর প্রসাদ খাবার দরকার কি ?' স্বপ্নেই কিরণ বললেন,

'না, ঠাকুর আমাকে প্রসাদ দিতেই হবে।' গোঁসাইজী বললেন। 'তোমার যদি এতই আগ্রহ হয়ে থাকে তবে প্রসাদ খেয়ো।' আশ্চর্য, পরদিন গোঁসাইজীর প্রসাদ নিতে যখন কিরণ গেলেন, যোগজীবন আর কোন আপত্তিই করলেন না। প্রসাদ নিয়ে কিরণ যখন খেতে বসলেন, গোঁসাই বারান্দায় এসে বসে মৃদুমধুর হাসতে লাগলেন।

কিরণের ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ঘটনাটি হল কিরণের বিয়ে সম্পর্কে। ধুলট উৎসবের সমাপ্তি দিনে ৯ মাঘ কিরণ গোঁসাইজীকে জিজ্ঞেস করায় গোঁসাইজী তাঁকে সরোজবালাকে বিয়ে করতে বিশেষ নির্দেশ দিলেন, বললেন এই বিয়েই কিরণের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। আদিষ্ট কিরণ ১০ মাঘ ঢাকা ছেড়ে তাঁর লীলাসঙ্গিনী সরোজবালার জন্মস্থান আড়িয়লে এলেন। গেণ্ডেরিয়ার সেই আনন্দোৎসবের স্মৃতিতে কিরণের চিত্ত তখনো ভরপুর তার উপর সরোজবালার সঙ্গে নতুনতর ও মধুরতর এক সম্পর্ক স্থাপনের আশ্বাসে এক অনাস্বাদিত পুলকে তাঁর পৃথিবী যেন আলোয় আলোয় ভরে গেল। ১৮ মাঘ কিরণ সরোজের সঙ্গে গোঁসাইজীর নির্দেশ নিয়ে আলাপ করলেন। গোঁসাইজীর কথা শুনে সরোজের চোখ জলে ভিজে গেল, তিনি কথা দিলেন যে কিরণকে ছাড়া তিনি আর কোথাও বিয়ে করবেন না। কিরণের প্রাণে সরোজের আসন পাতা হয়ে গেল সেই দিনে, সেই পরম লগ্নে।

আড়িয়ল থেকে ১৩০২ সালের চৈত্র মাসের প্রথম দিকে কিরণ খালিয়া ফিরে এলেন। গ্রামের সুনীতি শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন নিয়ে কদিন ব্যস্ত রইলেন তিনি। ১৩০৩ সালের ১৪ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে খালিয়ায় ভগবৎ কীর্তন সমাজ বলে এক নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল; সমবেত নাম কীর্তন, নগর সংকীর্তন, সাধু-মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচনা ও তাঁদের গ্রামে নিয়ে এসে ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা— এই সমস্ত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। কিরণ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত হলেন। ৪ আষাঢ় কিরণ আবার গোঁসাইয়ের টানে কলকাতা রওনা, হলেন, ৬ আষাঢ় থেকে ১৪ আষাঢ় পর্যন্ত নয়দিন

তিনি ১৪।২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় গোঁসাইজী সঙ্গ করলেন। এ ক'দিনের মধ্যে তিন দিন কীর্তনে গোঁসাইজীর সেই ভাবমধুর নৃত্য দর্শন করার সুযোগ হল তাঁর। ৮ আষাঢ় কিরণ কলকাতা জয়মিত্র লেনে বিখ্যাত সাধু শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীকে দর্শন করেন। কলকাতা থাকতেই গোঁসাইজী ২৫ আষাঢ় কিরণের বিয়ের দিন নির্দেশ করে দিলেন। গোঁসাইজীর সস্নেহ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে অধীর উৎসাহে কিরণ বাড়ি এলেন। খালিয়ায় বাড়িতে উৎসবে সাড়া পড়ে গেল। কিরণ পণ প্রথায় বিরোধী ছিলেন, বাড়ি এসে শুনলেন যে তাঁর দাদা বিয়ের জন্য কন্যা পক্ষের কাছ থেকে সাতশ' টাকা পণ নিয়েছেন। কিরণের আপত্তিতে ঐ পণের টাকা ফেরত দেয়া হয়।

১৩০৩ সালের ২২ আষাঢ় কিরণ বিবাহের জন্য আড়িয়ল যাত্রা করলেন। সঙ্গী ছিলেন বলরাম ঘটক, মহেশ সিং, তারাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণাচরণ ঘটক ও কেদার। খালিয়া থেকে নৌকায় মাদারিপুর, সেখান থেকে শেষ রাতের ষ্টীমারে পরদিন দুপুরে ডোমসার স্টেশনে। গোয়ালন্দগামী ষ্টীমার ঝড়ের দরুন আসতে না পারায় ডোমসারে এক বারুড়ী বাড়িতে অতিথি হয়ে খাওয়াদাওয়া করতে হল বর ও বরাযাত্রীদের। ২৩ আষাঢ় শেষরাত্রে আবার নৌকায় যাত্রা, পদ্মা পাড়ি দিয়ে দুপুরে লৌহজঙ্গ। সেখান থেকে অন্য নৌকায় রওনা হয়ে ২৪ আষাঢ় সন্ধ্যাসন্ধি কিরণদের দল আড়িয়ল পৌঁছালেন। পরদিন ২৫ আষাঢ় বুধবার জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে রাত্রি ছয় দণ্ডের পর হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা সরোজবালা দেবীর সহিত কিরণচন্দ্রের শুভ পরিণয়োৎসব সম্পন্ন হল। যে মন্ত্র তাঁরা দুজনে এতদিন মনে মনে চুপি চুপি বলেছেন আজ তা প্রকাশ্যে উচ্চারিত হল—যদিদং হৃদয় তব তদিদং হৃদয়ং মম। বিয়ের দু'বছর আগে ১৩০১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ তাঁদের প্রথম দেখা হয়, সেদিন থেকে অন্তরালে বসে কিরণের অন্তরে প্রেরণা যুগিয়েছেন দেবী সরোজবালা, তাঁকে দেখিয়েছেন সার্থকতার পথের নিশানা, আজ সেই আড়াল

ঘুচে গিয়ে সহজ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তিনি কিরণের জীবনে তাঁর নির্দিষ্ট ঠাঁই অধিকার করে নিলেন, ছায়াসঙ্গিনী মূর্ত হয়ে উঠলেন জীবনসঙ্গিনী রূপে। এখন আর পরোক্ষ ইশারা নয়, এখন প্রত্যক্ষ আবির্ভূত উন্মেষ ; দুজনে মিলে এক পদক্ষেপ, দুজনে মিশে একই মহাযাত্রার পথে চলা। সপ্তপদীর সাত পা হাঁটতে না হাঁটতেই যেন তাঁরা তাঁদের পুরোনো অনন্ত লীলার সেই অনেক চেনা পথটা আবার খুঁজে পেলেন। কিরণের পরুষ স্পর্শে বিকশিত, উদ্ভাসিত হয় সরোজ আর সরোজের যে কিরণ তার দ্যুতি বড় শীতল, বড়ই মধুর। কিরণের বয়স তখন আঠারো বছরের একমাস কম, সরোজের ঠিক পনেরো—১১৮৮ সালের ঐ ২৫ আষাঢ় পারনায় জন্মেছিলেন সরোজবালা।

বিয়ে করার আদেশ দেবার সময় গোঁসাইজী কিরণকে বলেছিলেন যে তাঁকে বার বছর সংসার করতে হবে এবং গোঁসাইজীর মনোনীতা ঐ পত্নী কিরণের ধর্মজীবনের কোন অনিষ্টের কারণ হবে না। মনে হয় বিয়ে সম্বন্ধে কিরণের মনে দ্বিধার ভাব ছিল, গোঁসাইয়ের এই আশ্বাসে তিনি নিশ্চিন্ত হন। ধর্ম অর্জনের ব্যাপারে যারা রীতিমত সীরিয়াস তাদের অনেকেরই বিয়ে ও সংসার জীবন সম্পর্কে একটা ভীতির ভাব থাকে। অন্যান্য প্রণালীমত যাঁরা ভগবৎ-ভজনা করেন তাঁদের কথা জানা নেই কিন্তু সদ্‌গুরু সাধনের সাধকদের পক্ষে বিয়ে করা না করা যে অনেকখানিই গৌণ ব্যাপার তা উত্তর জীবনে দরবেশজী বারংবার ঘোষণা করেছেন। তাঁর নিজের ধর্মপত্নী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মা কখনো আমার সাধন পথে ব্যাঘাত করেন নি, প্রতি ধর্মকার্যে আমার সাহায্য করেছেন, এমন কি সন্ন্যাস গ্রহণ করার সময়-ও।' দরবেশ দর্শনের ৯।২২ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী বলছেন, 'গোঁসাইজীর বাক্য ও কার্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত যাহা কিছু জানিয়াছি তাহাতে এ সংস্কারটা নিশ্চয়ই দূর হইয়াছে যে, বিবাহ করা বা না করার সঙ্গে ভগবৎ প্রাপ্তির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। বিবাহ করিলেই সাধক পিছাইয়া গেল আর বিবাহ না করিলেই সাধক চতুর্ভুজ হইল—

এ সংস্কার ঠিক নয়। যেমন নিজের পছন্দমত মানুষ বেশভূষা করে ; কেহ বা পাঞ্জাবী জামা, কেহ বা লঙ্‌কোট, কেহ বা বেনিয়ান, যাহার যেমন অভিরুচি। বিবাহ করা বা না করা-ও সেইরূপ একটা অভিরুচি মাত্র।' আবার ৯১৬ নম্বর পত্রাংশে লিখেছেন, 'বিবাহ করিলে ধর্মলাভ হয় না, এ কথা মিথ্যা। নিত্য নিয়মিত ভজন করিলে বিবাহ করা না করায় কিছু যায় আসে না। এবং গৃহস্থ হইয়া ধর্মানুগত হওয়া অনেকটা নিরাপদ। বিবাহ না করিয়া পারিলে পরাধর্ম শীঘ্র শীঘ্র লাভ হইতে পারে, সে কথা ঠিক, কিন্তু রাস্তা বড়ই পিচ্ছিল। স্ত্রীজাতির প্রতি দারুণ একটা বিজাতীয় বোধ না থাকিলে, এ পথে পদে পদে পতনের ভয় আছে। নিজের দৃঢ়তা সম্পূর্ণ থাকিলেই তবে গুরু কৃপা করিয়া এ পথে রক্ষা করেন।' এ তো গেল বিয়ে সম্বন্ধে দরবেশজী নির্দেশিত তাত্ত্বিক উপদেশ। ব্যবহারিক ভাবে তিনি তাঁর শিষ্যদের ব্যক্তিগত সমস্যায় কী বিধান করেছেন তার ক'টি দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যেতে পারে। দরবেশজীর শিষ্য মঙ্গলচাঁদ দাসের সাধন হয় এগার বছর বয়সে। তাঁর যখন বিয়ের বয়স হল তখন তাঁর অভিবাবকেরা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন, বিশেষ করে তাঁর মেশোমশাই ময়ূরমুকুট বাবার কৃপাশ্রিত ও দরবেশজীর বিশেষ স্নেহভাজন অক্ষয় কুমার সাহা দরবেশজীর অনুমতি নিতে যখন এলেন তখন দরবেশজী তাঁদের জানালেন যে মঙ্গলচাঁদ বিয়ে করবেন না বলে তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছে বলে তাঁর বিয়েতে তিনি সম্মতি দিতে অপারগ। অথচ মঙ্গলচাঁদের মনে যা-ই থাক তিনি কখনো বিয়ের জন্য দরবেশজীর কাছে প্রকাশ্যে কোন নিবেদন করেন নি। দরবেশজীর বিধানে মঙ্গলচাঁদ চিরকুমার রয়ে গেলেন। আবার প্রভাতচন্দ্র ভৌমিক-ও অতি বাল্যকালে দরবেশজীর কৃপা প্রাপ্ত হন। ডাক্তারী পাশ করার পর তাঁর বিয়ের কথা যখন উঠল তিনি নিজে বিয়েতে ঘোর অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। দরবেশজী তাঁকে বিয়ে করতে বিশেষ নির্দেশ দিলেন, কারণ হিসেবে বললেন যে প্রভাত বিয়ে না করলে দরবেশজী কলকাতা

এলে তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কে তাঁর সেবা করবে। প্রভাতের বিয়ের পক্ষে বেশ অভিনব যুক্তি, সন্দেহ নেই। দরবেশ দর্শনের ১৫।১৫ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী ১৩৪৮ সালে নরেশ চন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন, 'যদি স্ত্রীলোক সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইতে ভাগ্যগুণে মুক্ত থাকা যায়, তবে তোমার মত ছেলের, এমন দুর্লভ সাধন পাইয়া বিবাহ করা কখনও উচিত নহে। তুমি বিবাহ না করিবার সংকল্প রক্ষা করিবার চেষ্টা কর, আমি ভিতর হইতে তোমাকে সাহায্য করিব।' কিন্তু বছর তিন পরে ১৩৫১ সালে লেখা ৯।৬ নম্বর পত্রাংশে এই নরেশকে-ই দরবেশজী লিখলেন, 'তোমার পক্ষে বিবাহ করাই আমি উচিত মনে করি। বিবাহ দোষের নয়।' নরেশের বিয়ের পরেই ১৫।১৭ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজীর পরিষ্কার ঘোষণা, 'কিন্তু নিয়তি যাহা তাহা ঘটিবেই। এই মেয়ে তোমার ভগবৎ নির্দিষ্ট পত্নী। কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাদের দু'জনকে পৃথক করে। তাই তোমরা মিলিত হইয়াছ।' বেশ দেখা যাচ্ছে যে নরেশের বিয়ে বিধি-নির্দিষ্ট জেনেও তাঁর গুরুদেব তাঁকে সাময়িকভাবে অন্তত কয়টি বছরের জন্য বিয়ে থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলেন, এবং রেখেওছিলেন। কিম্বা এ-ও হতে পারত যে নরেশ যদি গুরুদেবের প্রথম বারের অনুশাসন মেনে দৃঢ় থাকতে পারতেন তবে হয়ত তাঁর নিয়তিকে-ও খণ্ডন করে তাঁর অন্যরকম জীবন গড়ে উঠতে পারত। এই প্রত্যক্ষ আদেশ বা বিশেষ ইঙ্গিত মেনে চলে দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে নারায়ণদাসজীর জীবনের সমস্ত ধারাটি-ই বদলে গেছল, একথা তিনি বেশ উচ্ছাসের সঙ্গে বলতেন। নারায়ণ দাসজী—ডাঃ নীরদ বর্মণের যৌবনেই স্ত্রীবিয়োগ হয়। তিনি নিজে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন এবং স্ত্রীর প্রতি তিনি বেশ আসক্ত ছিলেন। স্ত্রী যখন মারা যান, তখন তাঁর চারটি বালক ও শিশু সন্তান, তাদের দেখাশুনা করার ঝামেলা পোহানো ডাক্তার মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। নীরদের বাবা তখন-ও বেঁচে। তিনি ছেলের আবার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নীরদের

নিজের-ও আবার বিয়ে করার মোটেই অনিচ্ছা ছিল না। দরবেশজী কিন্তু তাঁকে পুনরায় বিয়ে করতে স্পষ্ট নিষেধ করলেন, বললেন, 'যদি জানতাম, আর একবার বিয়ে করলে তোমার সামান্য একটু-ও সুখ হবে, তাহলে আপত্তি করতাম না। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়েতে তোমায় সামান্য একটু সুখের সম্ভাবনা-ও আমি দেখতে পাইনে। তুমি আর বিয়ে করো না, আমাকে নিয়ে থাক। স্ত্রীর অভাবে তোমার যদি তেমন কষ্ট হয়, আমি তোমার কাছে তোমার সঙ্গে থাকব।' এ কথা ছাড়া-ও ইঙ্গিতে দরবেশজী বলেছিলেন যে আবার বিয়ে না করলে যদি নীরদের এক আধবার চরিত্রস্খলন-ও ঘটে যায় তা-ও বিয়ে করার চাইতে বেশি মঙ্গলের হবে। নারায়ণদাসজী গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে আবার বিয়ে করেন নি এবং তিনি মনে মনে বিশ্বাস করতেন এবং প্রকাশ-ও করতেন যে এই একটি আদেশ মেনে তাঁর সমস্ত জীবনের মোড় ঘুরে গেছে।

এই প্রসঙ্গের উপসংহার হিসাবে দরবেশ দর্শনের ৬।৫৬ নম্বর পত্রাংশের মূল বক্তব্যটি উদ্ধৃত করলেই গোঁসাইজীর সাধনে সাধকের বিবাহ বা কৌমার্যের ভূমিকাটি বোঝা যাবে ঃ—'আমাদের এই সাধন প্রাচীন আর্য-ঋষিগণের সনাতন পন্থা। সুতরাং ইহাতে বর্তমান প্রচলিত শংকরাচার্য প্রবর্তিত সন্ন্যাসের বিধান নাই। ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিরা কেহই সন্ন্যাসী ছিলেন না। কেহ কেহ বিবাহ করিয়াছেন এবং স্ত্রী-পুত্র লইয়াই আশ্রম জীবন যাপন করিয়াছেন, কেহ বা বিবাহ করেন নাই। অথচ সকলেই ত্যাগী ও আচরণে সন্ন্যাসীর মত ছিলেন। বাবা, সর্বদা মনে রাখিও, আমাদের আদর্শ এই ঋষিরা।'

এ সব তো গেল বিয়ে করা না করা সম্বন্ধে দরবেশজীর অনুশাসনের কথা। নিজের শিষ্য ও শিষ্যাদের বিয়েতে গোঁসাইজীর মত ঘটকালি করতে-ও তাঁর আগ্রহ নেহাত কম ছিল না। আসানসোলের সন্তোষ ঘোষ এবং বরিশালের দুর্গামোহন পণ্ডিত মশাইয়ের শিষ্য মাখন

গুহের কন্যা উষা বা রাণু—এঁরা তু'জনেই বিয়ের আগে দরবেশজীর কাছে সাধন লাভ করেন। দরবেশজী-ই যোগাযোগ করে এঁদের বিয়ে দেন। সন্তোষের মা প্রতিভা ঘোষকে কনের রূপ গুণ বর্ণনা করে দরবেশজী যেমন চিঠি লেখেন তেমনি বরিশালে উষাকে পাত্র ও পাত্রপক্ষের প্রশংসা করে সালঙ্কারে বর্ণনা লিখে পাঠান। বিয়ের যৌতুক-ও ঠিক করে দেন দরবেশজী। দরবেশ দর্শনের ১৮।০৩ নম্বর পত্রাংশে দেখা যায় যে দরবেশজী তাঁর শিষ্য হাওড়ার কাশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখেছেন কিন্তু কোষ্ঠীর মিল হয়নি বলে অন্য মেয়ের সন্ধান নিবেন বলে আশ্বাস-ও দিয়েছেন। তুঃখের কথা কাশীকৃষ্ণের ভাগ্যে আর ভাল মেয়ে বা বিয়েই ঘটে ওঠে নি। দরবেশজীর প্রায় সমস্ত জীবনের প্রতিদিনের লেখা ডায়েরী তিনি দেহত্যাগের ক'দিন আগে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে যান। ইংরেজী ১৯৪৫, বাংলা ১৩৫১-৫২ সালের ডায়েরীটি যেন কী করে বেঁচে গেছে। সেই ডায়েরীতে দেখা যায় যে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কলকাতার শিষ্য সুনীল করের জন্য পাত্রী দেখতে তাঁর আর একজন শিষ্যের বাড়িতে গেছেন। এ সম্বন্ধ-ও শেষ পর্যন্ত বিয়েতে পরিণত হয়নি, পাত্র ও পাত্রীর তু'জনেরই পৃথক পৃথক অন্যত্র বিয়ে হয়েছে। লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ছাত্রজীবনে দরবেশজীর আশ্রয় পান। তাঁর এম. এ পরীক্ষা শেষ হতে না হতে দরবেশজী যেন তাঁর বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পাত্রী রুবী বা রমা দরবেশজীর অত্যন্ত স্নেহভাজন ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য কেদার মণ্ডলের মেয়ে। বিয়ের যখন সব ঠিক-ঠাক তখন একদিন দরবেশজী কলকাতায় বসে বিয়ের তারিখ ঠিক করার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণের সামনেই পাঁজি খুলে বসলেন। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মেনে চলতেন দরবেশজী। বৈশাখ মাসের আগেই পাঁজি কিনে লাল কালি দিয়ে তিনি বিশেষ বিশেষ তিথি যেমন, পূর্ণিমা, একাদশী, মঠে প্রতিপালিত বিভিন্ন পর্বদিন—পাঁজির সমস্ত বছরের পাতায় পাতায় দাগ দিয়ে রাখতেন। লক্ষ্মীনারায়ণের বিয়ের দিন খুঁজতে গিয়ে দরবেশজী এমনি একটা

আগে থেকে দাগ-দেয়া পাঁজির পাতা বের করে লক্ষ্মীকে বললেন, 'দেখ, কেন জানিনা বিয়ের দিন ভাল বলে এদিনটাও দাগ দিয়ে রেখেছি। এই দিনই তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।' বিয়ের কদিন পর লক্ষ্মীনারায়ণের স্ত্রীর সাধন হয়। দরবেশজীর দেহত্যাগের পরে এই লক্ষ্মীনারায়ণ ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে প্রবেশ করেন এবং বর্তমানে বিদেশে রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত আছেন।

বিয়ের পর ২৯ আষাঢ় কিরণ ও সরোজবালা আড়িয়ল থেকে খালিয়া যাত্রা করলেন। সারা পথ তাঁরা নৌকাতেই এলেন, সঙ্গে কিরণের ভাগ্নী সৌদামিনী ও তারাচরণ চাটুজ্যে এবং কেদার ছিল। পথে কবিরাজপুরে রান্না ও খাওয়াদাওয়া হয়েছিল। ৩০ আষাঢ় রাত তিনটায় তাঁরা খালিয়ার বাড়িতে পৌঁছালেন।

নববধূর আগমন উপলক্ষে কিরণদের বাড়িতে যেন আনন্দের হাট বসে গেল। এই নতুন পরিবেশে, এই আনন্দ উৎসবে সরোজবালা অভিভূত হয়ে গেলেন। কিরণদের সংসার যেমন সরোজবালাকে বরণ করে নিল, কিরণের সঙ্গে সেই সংসারকে-ও সরোজ তেমনি আপনার করে পেলেন। কিন্তু সরোজের তখনো সাধন হয়নি। কলকাতায় তাঁর সাধনের জন্য শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে চিঠি লিখলেন কিরণ, ১৭ শ্রাবণ যোগজীবন গোস্বামী চিঠির জবাবে জানালেন যে আরো ছ' মাস গোঁসাইজী কলকাতা আছেন কিন্তু তাঁর শরীর অসুস্থ বলে তখন কারো সাধন হবে না। গোঁসাইজী সে সময় ৪৫ হ্যারিসন রোডের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

দাম্পত্য জীবনের শুরুতে প্রথম দুই মাস কিরণ ও সরোজবালা একই শয্যায় শয়ন করেও পূর্ণ সংযম প্রতিপালন করেন। ঠিক দু'মাস উত্তীর্ণ হবার পর ১৩০৩ সালের ২৪ ভাদ্র, মঙ্গলবার ভাদ্র শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে কিরণ জীবনে প্রথম স্ত্রীসঙ্গ করলেন। তাঁদের বিবাহিত জীবনের স্বাভাবিক ও সুস্থ সম্পর্ক এখন থেকে গড়ে উঠল। এর পর থেকে দু'বছরের মত তাঁদের পূর্ণ সম্ভোগের জীবন অব্যাহত

থাকে। ক্রমশ কাম সম্বন্ধে তাঁদের সদসৎ বিচারবুদ্ধি আসতে লাগল, কামের জন্য কিরণ যেন অনেকটা অধৈর্য হয়ে উঠলেন, এবং পুরীতে বসে গোঁসাইজীকে এ বিষয় নিবেদন করেন। ১৩০৫ সালের ১৮ আষাঢ় গোঁসাইজী কিরণকে কাম দমনের উপায় হিসাবে একটি বিশেষ কৌশল ও মন্ত্র বলে দেন এবং তিন বছর স্ত্রীসংসর্গ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে পরে জানা যাবে।

মহাপুরুষ এবং উন্নত সাধকদের কাম-জীবন সম্বন্ধে একটা অবাস্তব ও কখনো কখনো একই অদ্ভুত ধারণা অনেকেরই থাকে। এর প্রধান কারণ হিন্দুধর্মে প্রচলিত প্রায় প্রত্যেক সাধন প্রণালীতেই বীর্যরক্ষার উপরে প্রয়োজনেব চেয়ে বেশি এবং আপাতদৃষ্টিতে অহেতুক জোর দেয়া হয়ে থাকে। তা ছাড়া, উন্নত সাধকেরা তাঁদের নিজেদের কাম প্রবৃত্তি নিস্তেজ হবার পরে যখন উপদেশাদি দিয়ে থাকেন তখন হয়ত পূর্বসংস্কার মত এমন সব কথা বলেন যাতে প্রবর্তক সাধকের মনে অযথা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, তাদের বিশ্বাস জন্মে যে কাম প্রবৃত্তি একটি মারাত্মক দোষ এবং ওটা কাটিয়ে উঠতে না পারলে সাধনার পথে উন্নতি সম্ভব নয়। কাম নিয়ে এই অনর্থক ব্যতিব্যস্ততার ফলে অনেক সাধকের সাধন যে শুধু ব্যাহত হয় তা-ই নয়, কেউ কেউ কাম-প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করাকেই যেন পরমার্থ বলে মনে করে প্রকৃত ভজন-সাধন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সংস্কার ছেড়ে নিতান্ত স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বিচার করলে আহার ও নিদ্রার মত মৈথুন প্রবৃত্তি-ও মানুষের অত্যন্ত সুস্থ একটি বৃত্তি বলেই মনে হয়। সাধকের পক্ষে অধিক আহার বা অধিক নিদ্রা যেমন ক্ষতিকর, অধিক মৈথুন-ও তেমনি ক্ষতিকর; সমস্ত মানবিক প্রবৃত্তির পরিমিত ব্যবহার ও ভোগ-ই স্বাস্থ্য ও সাধনের অনুকূল। বেশি খেলে বা অনিয়মে খেলে শরীর মন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়; অপরিমিত ও বেহিসাবী মৈথুনে-ও সেরকম ঘটে। বর্তমান কালের মহাপুরুষদের

মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপর খুব গুরুত্ব দিয়ে সাধকদের উপদেশ দিতেন, কিন্তু তিনি-ই আবার বলেছেন যে মলমূল ত্যাগের মত বীর্যক্ষয়-ও মানুষের দেহের একটি স্বাভাবিক ধর্ম। পরিমিত কামক্রিড়াকে তাই ভগবৎ ভজনের প্রতিবন্ধক বা বিঘ্নকারক বলে মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কোন কোন মানুষের বা সাধকের স্বভাবতই কাম প্রবৃত্তি কম থাকতে পারে, কামক্রিড়াতে-ও একটা স্পৃহাহীনতা থাকতে পারে; মানসিক বিক্ষেপের অন্যতম এই কারণ না থাকায় তাদের ভজনে কিছু কিছু সুবিধা-ও যে না হয় তা নয়। কিন্তু শরীরবিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের সুস্থ মানুষ বলে মনে করেন না। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথাব উল্লেখ করাও দরকার যে শারীরিক বৃত্তিদের মধ্যে কাম নিয়ে যত মাথা ঘামানো দেখা যায়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি নিয়ে উদ্বেগ যেন ততটা চোখে পড়ে না, অথচ এ সব বৃত্তি যে চিত্তবিক্ষেপের কারণ হিসাবে কামের চেয়ে কম জোরদার তা ভাবার-ও কোন হেতু নেই। গোঁসাইজী বলতেন—রিপু দুইটি, জিহ্বা ও উপস্থ। দরবেশজী আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে বলতেন যে এ দু'টির মধ্যে আবার জিহ্বাকেই রিপু হিসাবে গুরুতর বলতে হয় কারণ কামের লক্ষ্য বা আকর্ষণের হেতু animate অর্থাৎ জীবন্ত বস্তু, আকর্ষণটা এখানে পারস্পরিক কিন্তু জিহ্বার লক্ষ্য inanimate অর্থাৎ খাদ্য ইত্যাদি জড় বস্তু, টানটা এখানে একতরফা। গোঁসাইজীর-ও ঠিক এই ভাবের বাণী রয়েছে, যেমন—বিষয় সমস্তই অসৎ। লোভ যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, অনিষ্টকর জানবে। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক দেখে তার প্রতি লোভ করাতে যে ক্ষতি, বাজারের মিঠাইয়ের দোকানে একটি রসগোল্লা দেখে তাতে লোভ করায়-ও ধর্মলাভ বিষয়ে ঠিক সেইরূপ ক্ষতি। সামাজিক ইষ্টানিষ্টের কথা স্বতন্ত্র।

হঠযোগীদের দৈহিক নানারকম প্রক্রিয়ার মত কাম দমনের-ও নানাবিধ কসরত আছে, তাতে দৈহিক ও মানসিক বিভিন্ন সম্পদ লাভ হয় এ কথা-ও সত্য কিন্তু ভগবানকে লাভ করবার জন্য যাঁরা সাধন

পথে চলেন কাম দমনের জন্যই একটা বিশেষ প্রচেষ্টা তাঁদের অবশ্য করণীয় কিছু নয়। দরবেশ দর্শনের ৬।৫৯ নম্বর পত্রাংশে এই জন্যই দরবেশজী বলেছেন, 'আমরা ভগবৎ প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কিছুর জন্যই সাধন করিতে রাজী নই। উহাতে ঊর্ধ্বরেতা হই বা স্খলিতরেতা হই, সে দিকে দৃষ্টি দেবার আবশ্যক নাই। মনে এই ভাব থাকিলে আপনা হইতেই ঊর্ধ্বরেতা হওয়া যায়। নতুবা ঐ জন্য পৃথক সাধনা করিলে ঊর্ধ্বরেতা হওয়া যায় বটে, কিন্তু ভগবান কোথায়?'

না, গোঁসাইজীর প্রবর্তিত সাধন পন্থায় কাম দমনের কোন বিশেষ অনুশাসন নেই, বীর্যরক্ষার কথা আছে বটে। বিবাহিত জীবনে পরিমিত কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা সাধনের প্রতিকূলতা করে না। পরিমিত ভোগ কাকে বলে এ সম্বন্ধে দরবেশ দর্শনের ২।৩৪, ৬।৯৮, ৯।৭৯ এবং ১৯।৩৮ নম্বর পত্রাংশে মোটামুটি বলা আছে। বিবাহিত সাধকের বীর্যরক্ষা সম্বন্ধে গোঁসাইজীর বক্তব্য, 'যাঁহারা বিবাহিত তাহাদের দুই তিনটি সন্তান হইলেই বীর্যরক্ষা করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু কেবল পুরুষের ইচ্ছায় হইবে না। ঐ কার্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সাহায্য চাই। স্ত্রীর ইচ্ছা না হইলে পুরুষ সক্ষম হইবে না। বীর্যরক্ষা দ্বারা শরীর নীরোগ হয় এবং সুস্থির হয়। যদি কোন কারণে বীর্যরক্ষা না হয় তাহাতে মুক্তির ব্যাঘাত হয় না। সাধন পথের বিঘ্ন, এইজন্য বীর্যরক্ষা বিশেষ প্রায়োজন। প্রাণায়াম ও বীর্যরক্ষা কেবল শরীর ও মনকে সুস্থির করে।' কাম সম্বন্ধে দরবেশ দর্শনের ৯।২ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী সুস্পষ্টভাবে যে কথা বলেছেন তাকে এ প্রসঙ্গের সিদ্ধান্ত-বাক্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে—'কাম দমন করিতে হইবে। যদি দমন করিতে বেশি বেগ পাইতে বা বিব্রত হইতে হয়, তবে এই পশুটার সঙ্গে কেবল মারামারি লইয়া দিন না কাটাইয়া, ইহাকে কিছু কিছু খোরাক দিলে যদি পশুটা চুপ চাপ থাকে, তবে তাহাই শ্রেয়। মোক্ষার্থীর ইহাই বিচার। এজন্য মোক্ষার্থীর পক্ষে অনেক সময় বিবাহ না করা অপেক্ষা করায় রাস্তা বেশি সুগম হয়।'

ভগবান গোঁসাইজীর সংসার জীবনে পাঁচটি সন্তান জন্মেছিল—১২৭৪ সাল থেকে ১২৮৪ সাল এই দশ বছরের মধ্যে। বিবাহিত জীবনে স্ত্রীসংসর্গের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে গোঁসাইজীর বক্তব্য সম্বন্ধে নবকুমার বিশ্বাস শ্রীশ্রীবিজয় কথামৃতে যা উল্লেখ করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; তিনি লিখেছেন—আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া গোস্বামী মহাশয় বলেন, 'ঢাকাতে সেদিন সাপ্তাহিক উপাসনার দিন, বেদীতে বসিয়া উপাসনার কার্য করিলাম এবং অনেক প্রকার প্রাণের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিলাম কিন্তু কিছুতেই সেদিন ব্রহ্মদর্শন লাভ হইল না। শূন্য মনে প্রচার নিবাসে আসিয়া আহারান্তে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। সেইদিন দারোপগমনের দিন ছিল। স্ত্রীর মুখে আমার ব্রহ্মদর্শন হইল এবং আমি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম।' এই কথা বলিবার পর গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, 'ছি ছি, এসব কথা কি বলতে আছে? এখানে অনেক ছেলে-পিলে আছে।' তদুত্তরে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, 'দারোপগমন মহাযজ্ঞ। যাঁহারা অপবিত্র ভাবে ইহা করেন তাঁহারা ইহার মর্ম কী বুঝিবেন? শাস্ত্রকর্তারা বলিয়াছেন যে এই কালে ভগবদারাধনা ও পরলোকবাসী পিতৃকূল ও মাতৃকূলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাতে যে কতদূর চিত্তসংযমের প্রয়োজন, তাহা যাঁহারা স্ত্রীকে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার যন্ত্রস্বরূপ মনে করেন, তাঁহারা কিরূপে বুঝিবেন? তাঁহাদের এ তথ্য বুঝিবার অধিকার নাই।'

এই ছি ছি করার মত লোকের অভাব তখনো ছিল না, এখনো নাই। গুরুঠাকুরকে যাঁরা অতিমানব বা কিম্ভূতকিমাকার কিছু মনে করে স্বস্তি পেয়ে থাকেন তাঁরাই গুরুদেবের, বিবাহিত গুরুদেবের স্ত্রীসংসর্গের কথা শুনলে বা ভাবতে গেলে ব্যথিত হন, ও সব চিন্তাকে পাপ বলে শিউরে ওঠেন। এ ভাব নিতান্তই সংস্কারজাত, আর যুক্তি বিচার ছাড়া যে সংস্কার তা অবশ্যই কুসংস্কার—তাতে সত্যও থাকে না

সৌন্দর্যও থাকে না। ডাঃ নীরদ বর্মণ একটু বেশি কামুক ছিলেন একথা তিনি স্বীকার করতেন। তাঁর একটি সন্তানের জন্মের এক বছরের মধ্যেই আর একটি সন্তান হল। সস্ত্রীক কাশী গিয়ে শিশু দু'টিকে নিয়ে দরবেশজীর সামনে বসেছেন, দরবেশজী বেশ কৌতুক করে জিজ্ঞেস করলেন, এটির চেয়ে ওটি কত বড়। না, তিনি সংযম করার জন্য এক মস্ত উপদেশ দিলেন না, নীবদ-ও কোন অসোয়াস্তি বোধ করলেন না। আবার যখন স্বাস্থ্য বা অন্য কোন কারণে সংযমের আবশ্যক বোধ করছেন তখন নীবদ বা অন্য শিষ্যদের সাবধান করতে-ও দরবেশজী কসুর করেন নি। দরবেশ দর্শনের ২।১৭, ১৯।১৮, ১৯।৪৪ এবং ২০।৪৯ নম্বব পত্রাংশ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। দরবেশজীর শিষ্য গড়বেতার নারায়ণ বাগ রক্তপিত্তের রোগী ছিলেন, এক এক সময় তাঁর এক গামলা করে রক্ত বমি হত। এ রোগের কথা সাধনের আগে দরবেশজীকে তিনি জানানো দরকার মনে করেন নি। সাধনেব পরে-ও যখন অসুখ সারল না তখন তিনি দরবেশজীকে লিখলেন। উত্তরে দরবেশজী জানালেন যে সাধন দিতে বসেই তিনি ওঁর অসুখের কথা টের পেয়েছিলেন এবং যদি এক বছর স্ত্রীসংসর্গ থেকে বিরত থাকতে পারেন তবে রোগ সেবে যাবে। তিনি রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

দরবেশজীর সম্ভোগের জীবন কেমন ছিল এবং কাম-চর্চার ব্যাপারে তিনি যে মোটেই অস্বাভাবিক ছিলেন না তা তাঁর শিষ্যদের কাছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন সে থেকেই জানা যায়। ডাঃ নীরদ বর্মণকে তিনি একবার কাশীতে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি স্ত্রীসঙ্গ কবার সময় কতবার নাম কর?' নীরদ নিতান্ত সরলভাবে উত্তর দিলেন, 'সে সময়ে কী আর নাম করব, বাবা; তখন তো ব্রহ্মানন্দের সুখ পেয়ে থাকি।' দরবেশজী বললেন, 'না, ও সময়ে খুব নাম করতে হয়।' নীরদ বললেন, 'সে আপনি আর কি করে জানবেন, আপনি তো ও সব কখনো করেন নি।' দরবেশজী সহাস্যে বললেন, 'কে বলে, করিনি। ডাক তোমার মাকে, তিনি-ই বলতে পারবেন আমি কত

রমণ করেছি।' গোঁসাইয়ের সাধনে উচ্ছিষ্টের বিচার নিয়ে বড় কড়াকড়ি। দরবেশজীর দু'জন শিষ্য রামপদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রভাত ভৌমিক বিয়ের পরে বড্ড বিপন্ন বোধ করলেন, স্ত্রীকে চুমু খেতে গেলে উচ্ছিষ্টের বিচার কি করে রক্ষা করবেন। এ সমস্যার সমাধান চাইলেন তাঁরা দরবেশজীর কাছে। দরবেশজী তাঁদের জানিয়েছিলেন যে দাম্পত্য চুম্বনের বেলা উচ্ছিষ্টের কোন বিচারের দরকার নেই; শুধু তা-ই নয় চুম্বনের বিভিন্ন প্রকারভেদ উল্লেখ করে এ কথা-ও বলেছিলেন যে কামশাস্ত্রে অনুমোদিত কোন কোন রকমের চুম্বন বেশ বীভৎস এবং ওগুলো বর্জন করাই ভাল।

গোঁসাইজীর আর একটি উক্তি—'কাম ক্রোধ অধর্ম নহে। তাহা-হইলে মনুষ্যের আত্মার প্রকৃতির মধ্যে থাকিত না। কামক্রোধের অবৈধ ব্যবহার পাপ। * * * কাম ও ক্রোধ যদি বৈধভাবে চালিত হয়, তাহা অধর্ম বলিয়া গণ্য হয় না।' কামের অবৈধ ব্যবহার যেরূপ পাপ, তার বৈধ ব্যবহার না করাও অন্যায়। অসীমানন্দজী হরিদ্বার বসে একবার বলেছিলেন যে সাধন পাবার পর তিনি স্ত্রীসঙ্গে বীতস্পৃহ হয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করলে দরবেশজী তাকে অবিলম্বে নিয়মিত স্ত্রীসঙ্গ করতে নির্দেশ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন এবং এই নির্দেশ পালন করার ফলেই সাধন পাওয়ার পর-ও তাঁর সন্তানাদি হয়েছে। গোঁসাইজীর শিষ্যা মনোরমার কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর নিজের কাম সম্পূর্ণ চলে যাবার পরে-ও যে তিনি স্বামী-সহবাস ও স্বামীর সন্তান ধারণ করেছেন—এ কথা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তাঁর বইয়ে পরিষ্কার ভাবে লিখে গেছেন।

গোঁসাইজীর সাধন পন্থায় অস্বাভাবিকতার স্থান নেই। সাধনের সঙ্গে যুক্ত থেকে যে আচরণ করা যাক না কেন তা-ই ধীরে ধীরে সমতা প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। এই পন্থায় সাধকের কাম, ক্রোধ এ সব কোন প্রবৃত্তি-ই লোপ পেয়ে যায় না—সাধনের স্পর্শে, সাধনের ঘষায় ঘষায় ওগুলি রূপান্তরিত হয়ে যায়।

গোঁসাইজীর ভাষায় রিপুরা সব বন্ধু হইয়া যায়। বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রন্থে গোঁসাইজীর এ ধরণের বাণী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে সংকলিত হয়ে আছে। ১২৯৩ সালের ১০ শ্রাবণ তারিখের উপদেশ ধরা যাক, 'অনেকে কাম ক্রোধাদিকে রিপু বলিয়া থাকেন, কিন্তু একবার সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর প্রাণে প্রকাশিত হইলে এ সকল আর রিপু থাকে না —তখন ইহারা বন্ধু হইয়া যায়। যখন ঈশ্বর লাভ হয়, তখন কামাদি রিপু সকল ও চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে পারা যায়, তখন ইহাদিগকে পরম উপকারী বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়।' আবার ১২৯৩ সালের ২২ কার্তিক তারিখের উপদেশে আরও পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, 'আত্মসুখের নাম কাম, যখন ভগবৎ সেবা করি তখনই উহারই নাম প্রেম। যখন ভক্তির উদয় হয়, তখন বুঝতে পারা যায়, এই কাম আর রিপু নয়, বাস্তবিক বন্ধু। এই যে ক্রোধ ইহাকে তেজরূপে ব্যবহার করিলে উহা উপকারী বন্ধু; যখন কেহ অন্যায় করে তখন উহা দ্বারা নিবারণ না করিলে মনুষত্বই থাকে না।' অন্যত্র গোঁসাইজী বলেছেন, 'কাম, ক্রোধ, লোভ নরকের দ্বারস্বরূপ। একমাত্র ভগবানের ভজনদ্বারা ইহাদের মুখ ফিরায়ে দিতে পারলেই নিষ্কৃতি। তখন ইহারা ভজনের সহায় হয়, বন্ধু হয়।' সাধকের যখন প্রাণময় কোষ ভেদ হয়, তখনই রিপুরা সমতা প্রাপ্ত হয়ে বন্ধু হয়ে যায়; এই রিপুরা তখন ধ্বংস হয় না বা লোপ পেয়ে যায় না; শুধু এদের প্রকৃতি পালটে যায়। আগে এরা সাধককে ব্যতিব্যস্ত, বিহ্বল করত, এখন সাধক এদের নিজের কাজে লাগাতে পারেন। গোঁসাইজী যেমন বলেছেন, 'কাম শারীরিক গুণের সামিল। বহির্মুখ থাকিলেই কাম, শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্তর্মুখ হইয়া পড়িলেই প্রেম। তখন আত্মার অঙ্গ বা আত্মা।' শ্রীশ্রীদরবেশজী প্রসঙ্গ বইয়ে সদানন্দ মিত্র ইন্দ্রিয়দমন সম্বন্ধে দরবেশজীর সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরের কথা লিখেছেন :—

জনৈক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গীতায় আছে ইন্দ্রিয়গুলি

দমন করতে না পারলে শ্রীভগবানের কৃপা পাওয়া যাবে না। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি বোধ হয় এ জন্মে দমন করা যাবে না।'

দরবেশজী—'দমন করা মানে কী? গীতায়ই আছে কুর্মের ন্যায় সঙ্কোচ করা। কাম ক্রোধ প্রভৃতি কি একেবারেই চলে যাবে? তা নয়, এ থাকবে, তবে নিজের ইচ্ছামত কুর্ম যেমন তার হাত-পা গুলিকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করতে পারে, তেমনি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের আযত্তাধীনে রেখে ইচ্ছামত তাকে ব্যবহার কবিতে হবে।' নিজের সাধন-জীবনের এই মহৎ উপলব্ধি দরবেশজী 'মন্দির' কাব্যে বড় মধুর করে বলেছেন,

সখা, অপরূপ তব রাগিণী
গুঞ্জনে তব মম চিত্ত কাননে
মুগ্ধা যতেক নাগিনী।

* * * * *

কাম নিবাইয়া কামনার লেখা
প্রেম-জ্যোতি রূপে দিয়াছ হে দেখা
বাসনা-অগ্নি সাগ্নিক সাজে
আহুতি দিয়াছে ধমনী
হৃদয়ের যত ক্রোধ-দীপরাগ
ফুটিয়া উঠেছে হয়ে অনুরাগ
মাখিয়া তোমার পরশ-পরাগ
সোহাগ-সমীরে দোলনী।

* * * *

ছিল যত বৃথা ব্যাকুল দ্বন্দ্ব
সকলের মুখ হয়েছে বন্ধ
পাইয়া তোমার প্রেমের গন্ধ
নন্দন হল মেদিনী।

এত আলোচনা ও বিচার সত্ত্বেও একটা বড় কথা থেকেই যায়।

কাম যদি এতই অকিঞ্চিৎকর এবং কাম নিয়ে বিব্রত হওয়া যদি সত্যিই অপ্রয়োজনীয় হয়, তবে সার্থক সাধকদের জীবনে কাম এত ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় কেন, সাধকদের কাম নিয়ে এত মাথা ঘামাতে দেখি কেন। স্বয়ং গোঁসাইজীর কথাতেই দেখতে পাওয়া যায় তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক অবস্থায় পাঞ্জাবে একটি বালিকাকে দেখে হঠাৎ এমন কামবিহ্বল হয়ে পড়েন যে পরে ঐ ঘটনার জন্য অনুতপ্ত ও অসহায় বোধ করে তিনি রাভী নদীতে আত্মহত্যা করতে যান। এই উপলক্ষেই তিনি অনুশোচনায় বশে,

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়,
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়। —ইত্যাদি

গানটি রচনা করেন। ঐ সময়ে গোঁসাইজী রীতিমত সংসারী এবং বিবাহিত। তখনো তিনি দীক্ষা লাভ করেন নি সত্য, কিন্তু তাঁর সাধন ও উপলব্ধির জীবন তখন বেশ উন্নত। কাম প্রবৃত্তি-কে কতদূর অন্যায় ও অস্বাভাবিক বোধ হলে আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়, তা সহজেই অনুমেয়। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর কামের জন্য উৎকণ্ঠা ও অধৈর্য শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গের এখানে সেখানে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মচারীজী এবং তাঁর মত অন্য সব ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী যাঁদের স্ত্রীসঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ ও বীর্যরক্ষা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে হয় তাঁদের পক্ষে কাম নিয়ে বাড়াবাড়ি সঙ্গত ও শোভন বলে মেনে নিতে বাধে না। কিন্তু বিবাহিত গোঁসাইজীর ও রকম আচরণের অন্য কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে ধরে না নিলে মন যেন মানতে চায় না। এই আচরণের দু'টি ব্যাখ্যা দেয়া চলে। প্রথমটি দরবেশ দর্শনের ৬।১০৬ পত্রাংশে দরবেশজী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সাধন জীবনের শুষ্কতার জন্য গোঁসাইজী সে-সময় পাগলের মত হয়েছিলেন এবং সেজন্যই কাম চিন্তা তাঁর এত জ্বালাজনক হয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে বিবাহিত সাধকের কাম যতই প্রবল হোক, যতক্ষণ তা নিজের স্ত্রীতে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ-ই সুন্দর, যেই ঐ কামচিন্তা বা কামপ্রয়াস

পরস্ত্রীর উদ্দেশ্যে ঘটে তখন উহা সাধকের পক্ষে ক্লেশকর ও সাধনের পক্ষে বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়। কিরণের পরবর্তী জীবনে গোঁসাইজীর সঙ্গে পুরীধামে বাস করার সময় এই কাম নিয়ে বড় ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল, এ বিষয়ের আলোচনা যথাসময় উঠবে। কিন্তু এ কথা বোধ হয় এখনই বলা যায় যে সাধকের জীবনে সরসতা যতক্ষণ থাকে তখন এই কামের সাময়িক উপদ্রব তাঁর পক্ষে তত বিরক্তিকর ও বিভ্রান্তিকর হয় না। শুষ্কতার সময়ই এই কাম-টাম নিয়ে অযথা ব্যস্ত রাখতে হয় নিজেকে ; কাম নিয়ে দুশ্চিন্তা সাধন জীবনের শুষ্কতার অন্যতম লক্ষণ-ও বলা যেতে পারে। আর এই শুষ্কতা সাধকের জীবনে একাধিকবার আসবে—এ-ও নিশ্চিত।

দরবেশজী যেমন বলেছেন যে কাম প্রেম-জ্যোতি হয়ে দেখা দেয়, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার-ও তাঁর সেই বহু-উচ্চারিত পয়ারটিতে সেই বক্তব্যই প্রকাশ করেছেন, একটু অন্যভাবে :

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

কাম ও প্রেমের মধ্যে বস্তুগত বা গুণগত কোন প্রভেদ নেই, ঐ বৃত্তির উদ্দেশ্য বা উপলক্ষ কী এর উপরেই ওকে কাম বলা হবে অথবা প্রেম বলা হবে তা নির্ভর করে। কোন লোকের কতগুলি ভাব বা আচরণ দেখে তাকে কামুক বলা হয় কিন্তু ঠিক সেই ভাব বা আচরণগুলিই যদি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বা ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় তবে তাকেই প্রেমিক বলে জানতে হবে। শুধু ভগবান বা কৃষ্ণই বা কেন ? মানুষ-গুরু এমন কি সাধারণ কোন মানুষের বা নারীর প্রতি আপাত দৃষ্টিতে কাম-ভাবের অভিব্যক্তিও প্রেমের পর্যায়ে উঠতে পারে; কালিমা-লেপা কাম প্রেমের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত দেখাতে পারে। চণ্ডীদাস-রামীর সম্পর্ক কিংবা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের আচরণ নিয়ে সেই জন্যই কামের অপবাদ ওঠে না, প্রেম বলে মেনে নিতে বাধে না। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর লীলায় যে সাড়ে তিন জন বিশেষ কৃপা লাভ

করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম। নীলাচলে প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। প্রভু বললেন, কৃষ্ণকথা শুনতে হলে, ঐ কথা বলার উপযুক্ত যিনি সেই রামানন্দের কাছে মিশ্রকে যেতে হবে। মিশ্র আজ্ঞা পেয়ে সেখানে গেলেন এবং গিয়ে কী জানলেন? না, রায় রামানন্দ নিভৃতে দুইজন কিশোরী, পরমা সুন্দরী দেবদাসী নিয়ে নৃত্যগীত শেখাচ্ছেন। শুধু সেই একদিনই নয়, রায় প্রতিদিনই দেবদাসীদের নিয়ে অভিনয় শিক্ষা-কার্যে এরকম ব্যস্ত থাকেন। রায়ের সঙ্গে মিশ্রের পরে দেখা হল বটে কিন্তু কৃষ্ণ কথা শোনা আর হল না। কদিন পর মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত হতে মিশ্র তাঁর সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তাঁর উত্তরে প্রভু যা শোনালেন তা চরিতামৃতকারের ভাষাতেই লেখা যাক :

আমিত সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন রহে দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় আমার তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন॥
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য কথন॥
একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তাহা দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥

সাধারণ দৃষ্টিতে যে সব আচরণকে কাম বা মৈথুন-চেষ্টা বলা চলে, মহাপ্রভুর বাক্য অনুসারে তাকে প্রেমের অভিব্যক্তি বলে জানতে হয়, মানতে হয়। রায়ের ঐসব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল জগন্নাথ দেবের সম্মুখে যে দেবদাসীরা নৃত্য করে তাঁকে আনন্দ দেবে, তাদের নৃত্যগীত ও

অভিনয়কে আরও নিপুণ আরও সৌষ্ঠব মণ্ডিত করে তোলা। অথচ মহাপ্রভু স্বয়ং জানাচ্ছেন যে প্রকৃতি দর্শনেই তাঁর তনু মনে বিকার আসে—রামানন্দের মত আচরণ করাব প্রশ্ন তো তাঁর পক্ষে ওঠেই না। মহাপ্রভুর সাক্ষ্য না পেলে প্রত্যুম্ন মিশ্র-ই কি রামানন্দের আচরণকে প্রেম বলে মানতে পেরেছিলেন ?

কাম আর প্রেমের বাইরের চেহারার মিল এত বেশি যে বহিরঙ্গ ভাবে বিচার করলে অতি সূক্ষ্ম যে প্রভেদ আছে তা প্রায়ই ধরা পড়ে না। কিন্তু একটি বিচার রয়েছে যা দিয়ে কাম ও প্রেমকে আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। সে বিচারের নিরিখ হল একনিষ্ঠতা। প্রেমের ধর্মই হল নিষ্ঠা ও একনিষ্ঠা। কাম একনিষ্ঠ, এক লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেলেই তার জন্মান্তব ঘটে গিয়ে সে প্রেম হয়ে ফুটে ওঠে। এই একনিষ্ঠতা ভগবান বা আরাধ্য কোন ভাববিগ্রহের প্রতি যেমন হতে পারে, রক্ত মানুষের মানুষ-মানুষীর প্রতি-ও হতে পারে। আবার এই একনিষ্ঠা যদি আয়াস করে আয়ত্ত করতে হয় তবে কোন ভাববিগ্রহের চাইতে কোন মানুষ-বিগ্রহকে অবলম্বন করলে স্বতঃ-ই সুবিধা হয় বেশি, কেন না অদেহী কারোব প্রতি কাম বা প্রেমের যে কোন ভাব নিয়ে এগোনো নিঃসন্দেহে বেশ কষ্টসাধ্য, প্রায় অসম্ভব বলে মনে হওয়া-ও বিচিত্র নয়। এ জন্যই গোঁসাইজী বলেছেন, একটি মনুষ্যকে বিশেষরূপে ভালবাসা ধর্মসাধনের প্রধান অঙ্গ। প্রসঙ্গান্তরে তিনি আবার বলেছেন যে প্রাণটা এক স্থানে ঢেলে দিতে পারলেই হল। কলকাতার তালতলায় একটি সাহেবের মেয়ের প্রেমে পড়ে একটি ছাত্রের কী করে সেই প্রেমিকার মূর্তিতেই ভগবদ্দর্শন ঘটেছিল সে কাহিনী বর্ণনা করে গোঁসাইজী বলেছিলেন, 'স্ত্রীলোকই হউক আর যাতেই হউক, সমস্তটি প্রাণ একটা স্থানে ঢেলে দিয়ে একান্তভাবে একচিত্তে বসতে পারলেই তো হয়।'

ভালবাসা যখন একমুখী হয় তা কামাশ্রিত হলেও প্রেমের মর্যাদায় দীপ্যমান হয়ে ওঠে। এই অবিচল কামের অর্থাৎ যে কাম প্রেম হয়ে

যায় তাতে আর একটা বড় লক্ষণ থাকে তা হল স্বার্থপরতার অভাব। প্রেমে স্বার্থবোধ থাকে কিন্তু স্বার্থপরতা থাকে না। গোঁসাইজীর আর একটি তাৎপর্যময় উক্তি—কুকুরকেও যদি প্রাণ দিয়ে নিঃস্বার্থ ভালবাসা যায়, তাতে ভগবৎ-তত্ত্ব লাভ হয়। তিনি আরও বলেছেন, 'কাহাকে-ও ভালবাসিতে হইবে। অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভালবাসা হইবে। * * * সেই ভালবাসা কোনস্থানে অর্পণ করিয়া তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে আত্মবিস্মৃতি হইয়া যায়। এই অবস্থা হইলে সহজে ভগবান লাভ করা যায়।' গোঁসাইজী নিঃস্বার্থ বলতে স্বার্থপরতার অভাব-ই বলতে চেয়েছেন। যথার্থ প্রেমিক প্রেমের পাত্র বা বস্তুকে একার করে রাখতে চান না, তাঁর প্রেমাস্পদ তাঁর মত আরও অনেকের আনন্দ বিধায়ক, এ কথা ভাবতে তাঁর ঈর্ষা হয় না। প্রেমের সম্ভোগে প্রেমিকের নিজের আনন্দ আছে বটে, কিন্তু প্রেমাস্পদের যাতে আনন্দ হয় সেই আকাঙ্ক্ষা বেশি থাকে বলে প্রেমাস্পদের বহুবল্লভ রূপ তার নিরানন্দ বা বেদনার কারণ হয় না। এ জন্যই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছায় কাম প্রেম হয়ে যায়—এ অবস্থায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা যে লোপ পেয়ে যায় তা নয়। দরবেশজী প্রভাত ভৌমিক মশাইকে প্রসঙ্গক্রমে তাই একবার বলেছিলেন যে ভগবান বা গুরুতে যখন কাম হয় (তখন অবশ্য ওকে কাম না বলে প্রেম বলতে হবে) তখন আর অন্য কোন জীব বা বস্তুতে কামভাব থাকে না। প্রেম তত্ত্বটি নিয়ে যতই রহস্যময়তার জাল বোনা হোক না কেন, ওর মধ্যে কিছু অলৌকিক, অস্বাভাবিক বা অতীন্দ্রিয় ভাব আছে বলে তাই মনে হয় না।

কামভাব কুৎসিত বা ঘৃণ্য কোন ভাব নয়। কামের বিকৃতি বা ব্যভিচার কুৎসিৎ হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সে-তো যে কোন সর্বজনগ্রাহ্য সদ্‌ভাব সম্বন্ধে-ও সত্য। অথচ কাম মাত্রই যে হেয় ও পরিত্যাজ্য বিনা যুক্তিতে এ সিদ্ধান্ত করে নিয়ে কত মীথ বা অনৃতভাষণ ধর্মসাহিত্যে ও ধর্মোপদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। শ্রীবৃন্দাবনের রাসলীলাকে রূপক আখ্যা দিয়ে তার সত্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। বৃন্দাবন-

লীলা যা ভগবতে বিবৃত হয়েছে তাকে অপ্রাকৃত বলে বলা হয়েছে।
শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার লিখেছেন,

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তায় কহি কাম নাম॥

এখানে প্রাকৃত শব্দের অর্থ যদি সাধারণ ধরে নেওয়া যায় তবে কোন গোল থাকে না, কেননা যে কাম একনিষ্ঠ ও স্বার্থপরতাশূন্য তা-তো সাধারণ কাম নয়। কিন্তু এই প্রাকৃত শব্দের মানে অলৌকিক কিংবা অমানবিক বলে বর্ণনা করায় যত ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি। গোপীদের প্রেম, রাসলীলায় তাঁদের আচরণ যে অমানবিক অর্থে অপ্রাকৃত নয়, তা হরিদাস বসু মশাই তাঁর সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব গ্রন্থে সুন্দরভাবে বিচার করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণ লীলা যা বৃন্দাবনে দ্বাপরযুগে প্রকট হয়েছিল তা যদি অলৌকিকই কিছু হয় তবে তা মানুষ-সাধকের সাধ্যবস্তু বলে মহাপ্রভু নির্দেশ করবেন কেন? এই অলৌকিকত্ব প্রমাণ করার জন্য নানারকম যুক্তি দেয়া হয়ে থাকে, তার মধ্যে একটি হল যে রাসলীলার সময়ে কৃষ্ণ ও গোপীগণের কারোরই কামপ্রবৃত্তি প্রকাশিত হবার মত বয়সই ছিল না। দরবেশজীর শিষ্য নিখিলানন্দজী তাঁর 'ঈশ্বরসূত্র' গ্রন্থে এ আপাত-যুক্তিহীন যুক্তি ক্রমাগত উপস্থাপিত করেছেন। বৃন্দাবনের প্রকটলীলা ভগবানের নরলীলা-ই বটে, নরলীলায় ভগবান ও তাঁর পার্ষদগণ অসাধারণ কোন কোন আচরণ করলেও, অলৌকিক বা অমানবিক কিছু করতে আবির্ভূত হন না; তা হলে নরলীলার কোনই প্রয়োজন থাকে না, নরলীলার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। সর্বশক্তিমান হয়েও ভগবান পুরোপুরি মানুষের মত চলেন ফেরেন, মানুষের মতই দোষগুণে মেশানো ব্যবহার করেন একেই তো বলে তাঁর লীলা। লীলা মেনে-ও সেই লীলার মধ্যে অলৌকিকত্ব ও অস্বাভাবিকতার ভেজাল মেশালে গোটা তত্ত্বেরই অসঙ্গতি ঘটে যায়। শ্রুতিরা এবং রাম অবতারে আত্মারাম ঋষিরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে কৃষ্ণলীলার গোপী হয়ে ভগবানের মাধুর্য-

রস আস্বাদন করতে জন্ম নিয়েছিলেন। নরলীলার, প্রাকৃত লীলার যদি বিশেষ তাৎপর্যই না থাকবে তরে ওঁরা আবার মানুষ হয়ে এলেন কেন? ভগবান কি তাঁদের এমনিতেই নিত্য বৃন্দাবনের লীলার শরিক করতে পারতেন না? না, গোপীদের কাম মানবিক অর্থেই কাম ছিল, কৃষ্ণে কেন্দ্রীভূত এবং অব্যভিচারী হয়েছিল বলেই সেই কাম প্রেম হয়ে গিয়েছিল। গোঁসাইজী-ও বলেছেন, 'গোপীদের মধ্যে আমিত্ব ছিল, বড়াই ছিল; শেষে যখন দশম দশায় কিছু থাকল না তখন দর্শন হল।' এই যে প্রেমের কথা বলা হল তা মানুষের, সাধকের পক্ষে সাধ্য অর্থাৎ সাধন দ্বারা লভ্য। মহাপ্রভুর ভাষায়ঃ—

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এ হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহো নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে চরিতামৃতকার এই সাধ্য-সাধনের উপায় হিসাবে সখীর আনুগত্যের কথা বলেছেন। এই সখী বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে অনেক বাদানুবাদ বৈষ্ণব সাহিত্যে রয়েছে। সোজাসুজি বিচার করলে বলতে হয় যিনি কৃষ্ণ-লীলা সম্ভোগের অধিকারী হয়েছেন, তিনিই সখী; সাধকের কাছে তাঁর গুরুই সখী। গুরুর আনুগত্য হলেই লীলাসম্ভোগের সাধন করা হয়। প্রসঙ্গান্তরে চরিতামৃতকারই আবার গুরু-কৃষ্ণ তত্ত্বটির কথা-ও বলেছেন। গুরু একদিকে যেমন কৃষ্ণ লীলার সখী তেমনি তিনি-ই আবার সাধকের নিজের লীলা সম্ভোগের কালে কৃষ্ণ হয়ে যান। দরবেশজী সূত্রাকারে এই অচিন্ত্য তত্ত্বটি দরবেশ দর্শনের ৯।১১০ নম্বর পত্রাংশে এইভাবে বলেছেন, 'শ্রীগুরু ভজনা করা এবং শ্রীগুরু অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করা—যদি শক্তি লাভ হয়, তবে একই কথা।' দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলায় যে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তির প্রকাশ হয়েছিল, সেই অভূতপূর্ব প্রকাশ্য লীলা যে লীলা হিসাবেই আস্বাদ্য তা মহাজনেরা

বরাবরই জানতেন। সেই লীলা কথা শ্রবণ ও কখনো-সখনো সেই লীলা মনশ্চক্ষে বা সাধন-চক্ষে দর্শন পর্যন্তই সাধারণ মানুষের প্রাপ্তির সীমা বলে নির্দিষ্ট ছিল। শুধু লীলা শ্রবণ ও দর্শনই নয়, সেই লীলায় অংশীদার হয়ে সেই লীলা সম্ভোগ-ও যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব তা জানাতেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও প্রকট লীলা এবং সেই আপাত-অসম্ভব প্রাপ্তি যে বিশেষ সাধন প্রণালী-দ্বারা সম্ভব তা-ই হল মহাপ্রভুর কৃপার দান—সাধারণ জীবের ভাগ্যে এ খবর ও এ প্রণালী আগে কখনো জোটেনি বলেই এ বস্তু 'চিরাৎ অনর্পিতচরীং' বলে বর্ণিত হয়েছে। মহাপ্রভু সদ্গুরু-অবতার হয়ে আসেন নি তাই এই সাধন প্রণালী প্রকাশিত হয়েও প্রচারিত বা বিতরিত হল না তাঁর প্রকট লীলায়। গোঁসাইজীর আবির্ভাব সদ্গুরু রূপে, মহাপ্রভুর আরব্ধ ব্রতেব উদ্‌যাপন করতে, 'অনর্পিতচরীং স্বভক্তিশ্রিয়ম্'কে পুরোপুরি অর্পণ করতে।

সদ্গুরু সাধন তাই যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের কামের জন্য, নিছক শারীরিক কামের জন্যও লজ্জিত বা বিপর্যস্ত বোধ করার কোনই কারণ নেই। যে সাধন মহাভাগ্যে তাঁরা পেয়েছেন সেই সাধনই তাঁদের কাম-কে প্রেমের সাজে সাজিয়ে দিয়ে প্রেমভক্তির রাজ্যে তাঁদের উত্তীর্ণ করে দেবে। শ্রীগুরু সখী রূপে, সখা রূপে, সাথী রূপে, নাম রূপে সদ্গুরুর-সাধকদের নিয়ে যাচ্ছেন সেই নিত্য-লীলার বৃন্দাবনে যেখানে অভাবিত আস্বাদন ও সম্ভোগের অফুরন্ত আয়োজন নিয়ে শ্রীগুরুই আবার কৃষ্ণরূপে প্রতীক্ষার পথ চেয়ে বসে আছেন প্রেমিক ভক্তের জন্য—যে শুধু পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে নয় সর্বাঙ্গ দিয়ে তাঁর সেবা করবে, তাঁকে তৃপ্তি দেবে। ভক্ত দরবেশজী 'মন্দির' কাব্যে এই পরমতত্ত্বের আভাস দিয়েছেন এইভাবে ঃ—

ওগো মোর প্রিয়তম !
তোমার সুখের সায়র হইয়া ধন্য জীবন মম।
আমার অমল তনু তরঙ্গে, রসময় তুমি খেলিছ রঙ্গে,

আমি বিনে আর কে আছে তোমার
মধু হতে মধুরিম।

কিরণ এখন রীতিমতন সাবালক ও সংসারী, ঘরে তাঁর নববিবাহিতা পত্নী কিন্তু তাঁর মনের অনেকখানিই গোঁসাইয়ের কাছে বাঁধা পড়ে আছে, গোঁসাইয়ের সঙ্গ করার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েই থাকেন। ১৩০৩ সালের ৫ আশ্বিন আবার তিনি ফুরসত পেয়েই কলকাতায় গোঁসাইজীর কাছে চলে এলেন, ৪৫ হ্যারিসন রোডের বাড়িতে। ৬ আশ্বিন নীলকণ্ঠ অধিকারীর কীর্তন হল গোঁসাইজীর সামনে, আবার তাঁর মন ভোলানো নৃত্য দেখে চোখ ও প্রাণ জুড়োল কিরণের। বারোই আশ্বিন কিরণ তাঁর দাদার টেলিগ্রাম পেলেন—মায়ের অসুখ। সেইদিনই বাড়ি রওনা হলেন তিনি, পৌঁছে দেখলেন মা ভালোই আছেন, টেলিগ্রাম যথার্থ নয়। সংসারে চিরদিন এইরকমটি ঘটে থাকে, কাউকে ধর্মের পথ চলতে দেখলে সংসার বড় ভয় পায় এবং পথিককে নানান উপায়ে আগলে রাখতে চায়। শুধু যে প্রলোভন দিয়েই আটকে রাখতে চায় তাই নয়, অনিচ্ছার বাঁধাগুলোকে স্নেহ প্রীতি ইত্যাদির সোনালী পাতে মুড়ে নিয়ে সাধকের হাত ধরে টেনে রাখে। মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসার টান এ সবের মধ্য দিয়ে সংসার তার কাজ হাসিল করে, অনেক সময় তা সাধকের চোখেও পড়ে না। সংসার এমনি করেই ধোঁকা দেয়। অথচ এই সংসারকে গোঁসাইজী বলেছেন সাধকের দুর্গ এবং দরবেশজী বলেছেন যে এই সংসারকে উপেক্ষা করে যাঁর দিকে সাধক মুখ ফেরাতে চায়; যেতে চায়, সংসার সেই তাঁরই রচনা। সংসারের এই সত্য রূপটি চিনে নিতে যেটুকু দেরী হয়, সেটুকু সময় পর্যন্তই সংসারের এই দুষ্টুমি, এই লুকোচুরি। ১৮ আশ্বিন কিরণদের বাড়িতে মাংস খাওয়ার জন্য একটি কচ্ছপ কাটা হল, তিনি এজন্য ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত বোধ করলেন কিন্তু দাদার কাজে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হলেও পারলেন না। ২০ আশ্বিন থেকে ৩ কার্তিক কিরণ সরোজবালাকে নিয়ে আড়িয়লে কদিন কাটিয়ে এলেন। ১৭ অঘ্রান

কিরণদের জমিদারী চৌয়ারীবাড়িতে অম্বিকা মজুমদারের প্রজাদের সঙ্গে কিরণদের প্রজাদের ধান কাটা নিয়ে তুমুল মারামারি হল, তাঁদের প্রজা উজীর মাহ্‌মুদ খুন হল, কাশী মাহমুদ গুরুতরভাবে আহত হয়ে মাদারিপুর হাসপাতালে পরে মারা গেল। বিভিন্ন মূর্তিতে কিরণের চোখের সুমুখে সংসার এভাবে আত্মপ্রকাশ করছিল, আর সংসারের চোখের সামনে কিরণ বড় হয়ে, অভিজ্ঞ হয়ে উঠছিলেন।

এরই মধ্যে ফাঁক পেয়ে কিরণ কদিন ঢাকা গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে কাটিয়ে এলেন, ৩০ অঘ্রান থেকে ২ পৌষ পর্যন্ত। এ সময় গোঁসাইজী কলকাতায় ছিলেন। পয়লা পৌষ ঢাকায় বারদীর ব্রহ্মচারীর শিষ্য রজনী ব্রহ্মচারীর যোগাশ্রমে গিয়ে কিরণ গয়ার রঘুবরদাস বাবাজীর দর্শন পেলেন! ইনি সেই রঘুবর দাস বাবাজী যাঁর আকাশগঙ্গা পাহাড়ের আশ্রমে দীক্ষালাভের কদিন আগে গোঁসাইজী আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং যিনি দীক্ষার পর সমাধিস্থ গোঁসইজীর দেহ যত্নের সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। বাবাজী কিরণকে একটা কমলালেবু দিলেন এবং মন্তব্য করলেন, সন্ন্যাসীকা চেলা সন্ন্যাসী হোগা। গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে কদিন নির্জনে বাস করে কিরণ যেন অনেকটা সুস্থির হয়ে আবার খালিয়ায় সংসারে ফিরে এলেন। সরোজবালা তখনো আড়িয়লে।

নিরবিচ্ছিন্ন সংসারে থাকা বা সংসার লয়ে থাকা যেন কিরণের ধাতে নেই। ১৩০৩ সালের ৩ মাঘ কিরণ মাদারিপুরের চরমুগুরিয়ায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আখড়ায় গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন বিগ্রহের পুরুত মশাই অসুস্থ। কিরণই দ্বিপ্রহরের ভোগ রান্না করে ভোগ নিবেদন করলেন। সন্ধ্যায় তিনি আরতি করলেন এবং রুটি তৈরী করে নৈশ ভোগ-ও দিলেন। এর আগে কিরণ কখনো নিজে রান্না করেন নি অথচ তাঁর নিবেদিত ভোগের প্রসাদ পেয়ে সকলে রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। কিরণ এ প্রশংসাকে মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা বলে মেনে নিলেন; সারাদিন সেবায় কাটিয়ে তাঁর চিত্ত বড়ই প্রসন্ন

ও সরস হল। শুধু এবারই নয়, আনুষ্ঠানিক পূজা কিরণ আরও অনেক করেছেন। তাঁর দীক্ষা লাভের কিছুদিন পর এক রাতে শুয়ে আছেন, শিব দর্শন দিয়ে বললেন, 'আসনে বস এবং আমার পূজা কর।' কী করে পূজা করতে হয় তিনি তা জানেন না বলতে শিব নিজেই পূজার সব মন্ত্র ও পদ্ধতি বলে দিলেন। তার পর থেকে কিরণ বরাবর শিবরাত্রিতে এই প্রাপ্ত মন্ত্রে ও পদ্ধতিতে শিব পূজা করতেন। শিব ঠাকুরের এই দর্শনের কথা পুরীতে বসে গোঁসাইজীকে জানাতেই তিনি বলেছিলেন যে কিরণ মহাদেবের চিহ্নিত দাস। কাশীর ভাড়া বাড়ির আশ্রমে এবং পরে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হওয়ার পরে মঠে কিরণ দরবেশজীরূপে গোঁসাইজীর বিগ্রহের আনুষ্ঠানিক সেবা-পূজা প্রায় নিয়মিত করতেন কিন্তু গোঁসাইজীর বিগ্রহের পূজা ও অন্য দেব বিগ্রহের পূজার মধ্যে যে অনেক তফাৎ বহিরঙ্গ ভাবে দেখতে গেলে তা অবশ্যই মনে হয়। দেহত্যাগের কদিন আগে দরবেশজী বলেছিলেন, 'সারা জীবন তাঁকে (গোঁসাইজীকে) ছাড়া অন্য কিছু ভাবি নি। ধন মান কিছুই চাইনি, অন্য দেবতার চিন্তাও করিনি।' তা হলে মহাপ্রভুর পূজা কি মহাদেবের পূজা তিনি কী ভাব নিয়ে করলেন, এ প্রশ্ন মোটেই অস্বাভাবিক নয়। দরবেশজী নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট করে এ প্রশ্নের উত্তর কাউকে দিয়েছেন কিনা জানা নেই, কিন্তু এর সুন্দর উত্তর পাওয়া যায় কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর শালগ্রাম পূজার প্রসঙ্গে। কণ্ঠশালগ্রাম সংগ্রহের পর তার প্রথম দিনের পূজা উপলক্ষে ব্রহ্মচারীজীর প্রার্থনা ছিল এই, 'ঠাকুর, আজ পর্যন্ত আমার কোন আকাঙ্ক্ষা তুমি অপূর্ণ রাখ নাই।…শালগ্রাম পূজার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তুমি-ই প্রাণে দিয়াছ। …এখন দয়া করিয়া তুমি এই শিলার প্রতি অণু-পরমাণুতে অবস্থান কর —শালগ্রামটি তোমারই কলেবর হউক। দেবদেবী আমি কখনো বুঝি না, ভগবানকেও জানি না। …ঠাকুর যতকাল শালগ্রামে তোমার পূজা করিব— আশীর্বাদ কর, যেন এমন ভাবে করি, যাহাতে তোমার আনন্দ হয়।' ব্রহ্মচারীজীর এই প্রার্থনা যে সত্য এবং গোঁসাইজীর

অনুমোদিত ও স্বীকৃত তা পরিষ্কার বোঝা যায় যখন ব্রহ্মচারীজীর জিজ্ঞাসার উত্তরে গোঁসাইজী নিশ্চয় করে বললেন যে ব্রহ্মচারীজী শালগ্রামে যাঁকে ধ্যান করেন তিনি শালগ্রামে আছেন এবং ওতে থেকে তাঁর পূজা গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, যে ভাবের কথা ব্রহ্মচারীজীর প্রার্থনায় ফুটে উঠেছে কিরণের আনুষ্ঠানিক পূজার পেছনে সেই ভাবেরই প্রবাহ ছিল, তিনি অন্য দেবতার চিন্তাও করেন নি—এ উক্তিটির তাৎপর্যই তাই। সমস্ত দেবদেবীর পরিচিত ও প্রকাশ্য রূপ শ্রীগুরুরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি এ বোধ হলেই সাধকের পক্ষে বিবিধ বিগ্রহের আনুষ্ঠানিক পূজা সার্থক হয়, না হলে এই পূজার কোনই মূল্য থাকতে পরে না, পূজা বিড়ম্বনা হয়ে পড়ে।

সাধারণত যে কোন সাধন প্রণালীতে ইষ্ট বা উপাস্যের কোন নির্দিষ্ট রূপ সাধকের অবলম্বনের জন্য ধরে দেয়া হয়—কাজেই ভগবানের অন্যান্য প্রচলিত বা প্রকাশিত রূপ তাদের সাধন পথের বিঘ্ন হয়, অন্য রূপের চিন্তা-ও তাদের কাছে ব্যভিচার হয়ে দাঁড়ায়। গোঁসাইজীর প্রবর্তিত সাধন প্রণালীতে এ রকম কোন নির্দিষ্ট রূপ আরোপ করা নেই বলে সাধকের পক্ষে মস্ত সুবিধে হয়। গোঁসাইজী বলেছেন যে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে সাধকগণ পঞ্চ উপাসনা করে তার সঙ্গে এই সাধন করতেন, এমন কি যাগযজ্ঞ করেও এই সাধন করতেন। গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু ও শক্তি এই পঞ্চ উপাসনা পৌরাণিক যুগের, তখন দেবতা প্রত্যক্ষ হয়ে বর দিতেন। পঞ্চ উপাসনা এখন যা প্রচলিত তা তান্ত্রিক, পঞ্চ উপাসনা সকাম উপাসনা। 'আমাকে বাসনা মুক্ত কর'—এই হল নিষ্কাম উপাসনা—পরাধর্ম। 'এ প্রণালী কেবল ঋষিদের মধ্যে ছিল। এ জন্য উপনিষদে, ঋগ্বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, ধর্মসংহিতায় পরাধর্মের উল্লেখ আছে। তাহার অধিকারী সকলে নহে, তাই সাধারণ ভাবে উল্লেখ করেন নাই।' পরাধর্ম লাভ হলে পূর্বের উপাসনা নষ্ট হয় না, সাধক প্রত্যেক উপাসনাতেই সেই পরাধর্ম দেখতে পায়। মুক্তির পরে যে অবস্থা

হয় তাকে পরাধর্ম বলে। গোঁসাইজী আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, 'গোলোক, বৃন্দাবন, কৈলাস—এই নিত্যধামে নিত্য দেবতা বিরাজমান। রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, হরগৌরী—একই দেবতা, একই বিগ্রহ; সাধকের ভাব অনুসারে বিভিন্নরূপে দর্শন। যেমন কোন খৃষ্টান ভক্ত কালীঘাটের কালী ও দক্ষিণেশ্বরের আনন্দময়ী মূর্তিতে যীশুখৃষ্ট রূপ দর্শন করিয়াছিলেন।' গোঁসাইজীর প্রবর্তিত সাধন মার্গে ভগবানের ধ্যান-ধারণাকে সীমিত করে রাখা নেই বলেই তাঁর সাধন অসাম্প্রদায়িক। এ সম্বন্ধে ঠাকুর বরদাকান্ত লিখেছেন, 'আমার বিশ্বাস, ঠাকুর অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, আমরা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি। আমরা অসাম্প্রদায়িক হিন্দু, এবং হিন্দু হইলেও অপর কোন ধর্মের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই।······আমরা কালীপূজাও করিয়া থাকি, বৈষ্ণবের তিলক কণ্ঠী প্রভৃতিও ধারণ করিয়া থাকি, পরম ব্রহ্মের নিরাকার ও ভিন্ন ভিন্ন সাকার রূপের আরাধনা করিতেও আমাদের কোন বাধা নাই।' এই জন্যই সাধকের জন্য গোঁসাইজীর উপদেশ, 'নাম করিতে করিতে কত কি দেখিবে, শুনিবে। তাহা লক্ষ্য না করিয়া কেবল জপিতে থাকিবে। কালী, দুর্গা রূপক বা কল্পনা নহে, সব ঠিক। উহারা ভগবানেরই রূপ, ঈশ্বরের অনন্ত ভাব।' তিনি আরও বলেছেন, 'ঈশ্বর দর্শনের পূর্বেই মহাপুরুষ ও দেবতা দর্শন হয়। তাহাতে হৃদয়ের বিশেষ পরিবর্তন হয়না, ভগবদ্দর্শনই লক্ষ্য। দেব-দর্শনে, যিনি যে দেবতাকে ভালবাসেন, তাহাই প্রকাশ হয়। পূর্ব পূর্ব জন্মে ইষ্টদেবতা যে ভাবে, যে মূর্তিতে সাধিত হন, সাধনসিদ্ধির পূর্বে সেই দেবতা স্বপ্নে দর্শন দিয়া আকর্ষণ করেন। পূর্ব পূর্ব যুগে সাক্ষাত-ভাবে আসিয়া পরিচয় দিতেন। কলিতে সাক্ষাত দর্শন এবং সিদ্ধি-লাভ একই কথা। এই জন্য স্বপ্নে দর্শন দিয়া থাকেন।' গোঁসাইজীর এই উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাধনের সাধকের আনুষ্ঠানিক পূজা, অর্চনা ও আরাধনার তাৎপর্য বিচার করে দেখা দরকার। এই মার্গের সাধক যেমন ইষ্টজ্ঞানে ভগবানের প্রকাশিত সমস্ত রূপ বা বিগ্রহের

সেবা পূজা করতে পারেন, তেমনি সর্বত্র ইষ্টজ্ঞান না হলেও সংস্কার বশে যে কোন দেববিগ্রহের পূজার্চনা করতে গিয়েও সাধনের কোন অমর্যাদা বা অনিষ্ট করেন না। কারণ এ সাধনে সাধকের ভগবান সম্বন্ধে পূর্ব সংস্কার থাকলে তা ত্যাগ করা আবশ্যিক নয়—কেননা সাধনেরই এমন অমোঘ শক্তি যে সে সমস্ত সংস্কারকে ক্রমাগত সত্যের ঝর্ণা-ধারায় স্নান করিয়ে, ধুয়ে ধুয়ে চলতে থাকে। এর ফলে যা নিছক সংস্কার তা যেমন গলে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তেমনি যে সত্য বা সত্যের আভাষ সংস্কারের ধুলায় ঢাকা ছিল তা নির্মল হয়ে, নিখাদ ভাবে ফুটে ওঠে। গোঁসাইয়ের সাধনে বর্জন নেই, ক্রমাগত আবাহন, নিত্য নূতন বরণ বা গ্রহণ আছে। এ বিষয়ে গোঁসাইজীর সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্বতঃই মনে আসে, 'এ সাধনে শুধু আমাদের দেশের দেব-দেবীরই যে দর্শন হয়, তাহা নয়। এ পর্যন্ত ভগবানকে যে কোন দেশে যে কোন রূপে লোকে পূজা করেছে—আপনারা জ্ঞাত থাকুন আর না-ই থাকুন—সাধন প্রভাবে ধীরে ধীরে সে সমস্তই জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ হবে। পূর্বে গ্রীসে, রোমে ও অন্যান্য দেশে, এমন কি পাহাড়-পর্বতে অসভ্য লোকেরাও এ পর্যন্ত ভগবানকে যিনি যে রূপে পূজা করেছেন ও করছেন, সমস্ত প্রকাশিত হয়ে পড়বে। এ সব কল্পনার কথা বলছি না, এ সমস্ত বিষয় সত্য, প্রত্যক্ষ।' এ জন্যই গোঁসাইজী তাঁর শিষ্যদের আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রচলিত দেবদেবীর পূজা করতে নিষেধ তো করেন-ই নি, বরং কুঞ্জবিহারী ঘোষ, অভয়বাবু, রামকৃষ্ণ গুহঠাকুরতা প্রভৃতি দ্বারা পুরোহিতের সাহায্যে কালীপূজা করিয়ে-ছিলেন। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী গোঁসাইয়ের আদেশে যেমন নিত্য আনুষ্ঠানিক ভাবে শালগ্রাম শিলার পূজা আরতি করতেন, তেমনি একদিন মনসা পূজাও করেছিলেন। গোঁসাইজী স্বয়ং পুরীধামে নিজ হাতে জগন্নাথ দেব ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছেন।

দরবেশজীর নিজের বক্তব্য-ও এ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, দীক্ষার সময় নামের যে অর্থ বলে দেয়া

হয় সে অর্থে নিরাকার ব্রহ্মকেই বুঝায়।······কাল্পনিক চিন্তা বা সাম্প্রদায়িক ভাব না আসে এ জন্যই নামের অর্থ করে দেয়া হয়। অবশ্য তিনি যখন কোন রূপ ধরে প্রকাশিত হন তখন অবজ্ঞা করতে নেই কারণ উহা উপাস্যের একটি রূপ। সকলের ভিতরে উপাস্য পূর্ণভাবে বিরাজিত। তবে প্রকাশ বা বোধনের তারতম্য আছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে যথা গয়ায় বিষ্ণুপদ, কাশীতে বিশ্বনাথ এই সব স্থানে প্রকাশ বা বোধন বেশি, তাই বলে সেখানে ব্রহ্মের অংশ বেশি তা বলা যায় না। ব্রহ্ম সর্বত্র পূর্ণভাবে বিরাজিত। * * * যেমন কাশীর বিশ্বনাথ, অন্যান্য পাথরের যে সব গুণ যথা শক্ত, শীতল ইত্যাদি সব গুণ এই পাথরের মধ্যেও আছে কিন্তু বিশ্বনাথ যিনি এই পাথরের মধ্যে আছেন তিনি এই সব গুণের অতীত। আবার তিনি যে শুধু এই পাথরেই আছেন অন্যত্র নেই তাও নয়। এই পাথরে তিনি পূর্ণভাবে আছেন আবার সর্বত্রই পূর্ণভাবে আছেন। উপনিষদে আছে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে। এই তত্ত্বের অনুবর্তী হয়েই দরবেশজী তাঁর জীবনের সাহাহ্ন পর্যন্ত একদিকে গোঁসাইজীর বিগ্রহের আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনা করেছেন আবার অন্যান্য বিগ্রহে যেখানে তাঁর ঠাকুরের বা ইষ্টের বিশেষ প্রকাশ বা বোধন হয়েছে বলে জেনেছেন সেখানেই সমান শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে দর্শন ও অর্চনাদি করে তৃপ্তি পেয়েছেন। আনুষ্ঠানিক পূজা সম্বন্ধে দরবেশ দর্শনের ৬।১০৪ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী বলেছেন, 'বাহ্যিক পূজা অর্চনা ভোগ আরতি ইত্যাদি ঠাকুর পূজা সাধনের আর এক কণ্টক। পূজা-অর্চনা দুই প্রকার ব্যক্তির উপযোগী। যাহারা কিছু করিবে না তাহারা ফুল তুলসী ঘণ্টা শঙ্খ লইয়া কাটাইবে, ইহা মন্দের ভাল। আর যাহারা ইষ্টে তদ্‌গতজীবন হইয়াছে, ইষ্টকে পরিপূর্ণ রূপে পাইয়াছে, বাহ্য পূজা তাদের প্রাণের আনন্দের বাহ্য উচ্ছাস। ইহা ছাড়া সাধকদের পক্ষে এই পূজা অর্চনা বিড়ম্বনা বিশেষ। ···ইহাও সাধকদের বাধা তবে মুখ বদলাইবার হিসাবে আবশ্যক হইতে

পারে।' গোঁসাইজী বলেছেন যে সনাতন গোস্বামীর সর্বদা নিত্য-লীলা দর্শন হত অথচ তিনি নিয়মিত তাঁর বিগ্রহের সেবা পূজা করতেন। দরবেশজী তাঁর দেহত্যাগের পাঁচদিন আগে কাশীর মঠে তাঁর দোতলার ঘর থেকে একতলায় মন্দিরে ঠাকুর ঘরে যেতে চাইলেন। তিনি তখন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন, ইনভ্যালিড্ চেয়ারে করে তাঁকে তখন পায়খানা প্রস্রাবের জন্য নিয়ে যেতে হয়। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ঐ চেয়ারে করেই তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বিগ্রহত্রয়ের সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন; গোঁসাইজী ও যোগমায়াদেবীর পাদস্পর্শ করলেন। তাঁর এ আচরণ বড় তাৎপর্যপূর্ণ; যে বিগ্রহ তিনি এতকাল সেবাপূজা করেছেন, যে মূর্তিতে তিনি তাঁর ইষ্টের বিশেষ প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন, দর্শন করেছেন, স্থূল দেহ নিয়ে সেই বিগ্রহের সামনে গিয়ে প্রণত হওয়া তাঁর প্রাণের আনন্দের বাহ্য উচ্ছাস; অন্তরে যিনি সদাসর্বদা বিরাজ-মান, তাঁর বাইরেব প্রতিষ্ঠিত রূপের আনুষ্ঠানিক অর্চনা-ও ভক্তসাধকের কত আকাঙ্ক্ষার বস্তু দরবেশজী যেন তা-ই ব্যক্ত করলেন।

সদ্গুরু সাধনে অন্যান্য দেবদেবীর দর্শনাদি কিম্বা তাঁদের প্রতি অনুরাগ এমন কি তাঁদের আনুষ্ঠানিক পূজা করার অভিলাষ হতে পারে বটে কিন্তু এটাই নিয়ম নয়। পূর্বজন্মের সাধনলব্ধ অবস্থার জন্য অনেকের আবার গুরুনিষ্ঠার দিকটি প্রথমেই খুলে যায়, তাঁদের কাছে গুরুর রূপ ছাড়া অন্য রূপের তেমন আকর্ষণ থাকে না। মনোরমা দেবীর দেত্যাগের পর তাঁর স্বামী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা গোঁসাইজীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অনেকে দেব দেবী দর্শন করেন, কিন্তু মনোরমা সে সব কিছুই দেখেননি, ইহার কারণ কি?' গোঁসাই উত্তর দিলেন, "গুরুতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকাতে গুরু ভিন্ন অন্য কিছু দেখতে তাঁর বাসনা হয়নি। তাতেই দেবদেবী দর্শন হয় নি।'

দরবেশজীর শিষ্যদের মধ্যে তিনজনের কথা জানা আছে যাঁরা সাধন লাভের পূর্ব থেকেই মা কালীর অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা হলেন,

নীরদ বর্মণ বা নারায়ণদাসজী, কলকাতার বলাই দত্ত এবং ফরিদপুরের যোগেশ চন্দ্র ব্যানার্জি। নীরদ সাধনে যে নামটি পেলেন তার সঙ্গে মা কালীর কোন সম্পর্ক না দেখে দরবেশজীকে জানালেন। দরবেশজী বল্লেন ঐ নামের ভিতরেই কালী আছেন, কালে তা প্রকাশ হবে। নীরদ বলেছেন যে সাধন পাবার বিশ বছর পর তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর প্রাপ্ত নামের মধ্যেই মা কালী বিরাজ করছেন। এই নীরদই আবার ঠাকুর ঘরের আসন থেকে গোঁসাইজীর পটমূর্তি সরিয়ে রেখে তাঁর গুরুদেব দরবেশজীর পটমূর্তি স্থাপন করে পূজা করতে লাগলেন। দরবেশজী তখন দেহে, দেহধারী গুরুর মূর্তির আনুষ্ঠানিক পূজা করার জন্য নীরদকে যে তিরস্কার ও দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল তা দরবেশ দর্শনের ৯।৫৭ এবং ১৭।৭১ নম্বর পত্রাংশ পড়লে জানা যায়। বলাই দত্তের অভিজ্ঞতার কথা জানা নেই, তবে তিনি দীর্ঘদিন কালী মায়ের ছবি নিয়ে বিচরণ করতেন তা দেখা গেছে। যোগেশ বাড়ুজ্যে সাধন পাবার পরই দরবেশজীকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি তাঁর প্রিয় কালীর মূর্তি পূজা করতে পারবেন কিনা, দরবেশজী উত্তর দিয়েছিলেন, 'শুরুতেই মূর্তিপূজা করতে চাও? বেশ, যদি ভাল লাগে তবে কোরো।' একদিক থেকে দরবেশজীর আশ্রিতদের বিশেষ ভাগ্যবান বলে মনে হয়, তাঁদের গুরুদেবের গোঁসাইজীর উপর অবিচল অনুরাগ দেখে তাঁদের পক্ষে প্রচলিত অন্যান্য দেবদেবীর চাইতে গোঁসাইজীর মূর্তির প্রতি আকর্ষণ-ই সাধারণত জন্মে যায়। গোঁসাইজীর শিষ্যদের মত দরবেশজীর শিষ্যদের মধ্যে গোঁসাই ছাড়া অন্যান্য দেবদেবীর দর্শন বা অনুভূতির কথা তাই খুব কমই শোনা যায়।

সরোজবালা তখন আড়িয়ল তাঁর পিত্রালয়ে, ১৩০৩ সালের ৭ মাঘ কিরণ আড়িয়লে গেলেন। ৮ মাঘ তিনি যোগজীবন গোঁসাইয়ের এক চিঠি পেলেন, তাতে তিনি লিখেছেন, 'তুমি মহাভারতের শান্তিপর্বে শ্রীভীষ্ম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ঐ যে শ্লোকটির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ঠাকুর বলিলেন, সত্য যুগে ঋভু নামে এক অবতার হইয়াছিলেন, উহা

সেই মূর্তির রূপ। এখন তোমার স্ত্রীকে আনিলে সাধন হইবে।'
কিরণ 'জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং' ইত্যাদি শ্লোকটির সম্বন্ধে প্রশ্ন করেই যোগজীবনজীকে লিখেছিলেন, তারই ঐ উত্তর। ঐ চিঠি পেয়ে কিরণ ১০ মাঘ তারিখেই সরোজবালাকে নিয়ে কলকাতা রওনা হলেন। সাধনের জন্য সরোজবালার নিজের উৎকণ্ঠা তো সহজেই অনুমেয় কিন্তু এ বিষয়ে কিরণের-ও উদ্বিগ্ন থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল। গোঁসাইজীর সাধনে বিবাহিত দম্পতির উভয়েরই সাধন না হলে শুধু যে কতগুলি ব্যবহারিক অসুবিধা ঘটে তা-ই নয়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি হওয়ার-ও যথেষ্ট আশংকা থাকে। কোন শিষ্যের বিয়ের পর তাঁর স্ত্রীর সাধন নেয়ার বিলম্ব ঘটলে দরবেশজী উদ্বেগ বোধ করতেন, অদীক্ষিত স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন একত্র বসবাস ও একই শয্যায় শয়ন দীক্ষিত ব্যক্তির সাধনের পক্ষে বিঘ্নকর, সন্দেহ নেই।

সরোজবালাকে নিয়ে কলকাতা যাওয়ার পথে ষ্টীমারে রাজমোহন সেন নামে একজন সাধুর সঙ্গে কিরণের আলাপ-পরিচয় হল, গোঁসাইজী সম্বন্ধে নানা আলোচনা-ও হল দুজনের মধ্যে। আলোচনা প্রসঙ্গে রাজমোহন বললেন, গোঁসাই যেমন ব্রাহ্ম ছিলেন, তেমনই আছেন; শুধু ব্রাহ্মসমাজ না ছাড়লে এবং হিন্দুর আচার ব্যবহার গ্রহণ না করলে বাইরে থেকে হিন্দুধর্ম বিশেষত বৈষ্ণব ধর্মের সংস্কার করা যাবে না বলে গোঁসাই হিন্দুর আচার ও বেশভূষা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা। এই অভিনব মন্তব্য শুনে কিরণের ভালোই লাগল।

পৌষ কৃষ্ণা ষষ্ঠী, ১২ মাঘ, ১৩০৩ সালে ৪৫ হ্যারিসন রোডের বাড়িতে সকাল সাড়ে নটার সময় দেবী সরোজবালা গোস্বামীদেবের নিকট দেবদুর্লভ সাধন লাভ করলেন, তাঁর এবারকার মানবজন্ম সার্থক হল। প্রকৃত অর্থে তিনি কিরণের সহধর্মিণী ছিলেন, এবার লৌকিক অর্থেও তাঁর সহধর্মিণী ও সতীর্থ হলেন। আর আর একটি নতুন পরিচয়-ও হল, তিনি হলেন কিরণের গুরুভগ্নী। ১৩৪৬ সালে রেজেষ্ট্রী

করা বারাণসী, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের দেবোত্তর পত্র ও অর্পণনামায় দলিলদাতা স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশজী দেবী সরোজবালার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আমার গুরুভগ্নী ও গৃহস্থাশ্রমের সহধর্মিণী'। গোঁসাইয়ের সাধন—যার জন্য শুধু প্রার্থী হতে পারলেই আর ভাবনা থাকে না বলে সরোজবালা জানতেন—তার প্রাপ্তি সরোজবালার দেহমনে কী ঝঙ্কার তুলেছিল তা অনুমান করে নিতে হয়, কিন্তু এ সাধন তাঁর জীবনে কী ভাবে বিকশিত হয়েছিল তা প্রসঙ্গক্রমে জানা যাবে। ১৪ মাঘ কিরণ ও সরোজবালা কলকাতা ছেড়ে চলে এলেন।

নতুন বছর ১৩০৪ সাল শুরু হল। বৈশাখের শেষাশেষি কিরণ ঢাকা এলেন, উদ্দেশ্য গাঁয়ের সখের থিয়েটার দলের জন্য দৃশ্যপট তৈরী করার চিত্রকর নিয়ে আসা। ২৯ বৈশাখ তিনি গেণ্ডেরিয়া আশ্রমের তীর্থে গিয়ে দর্শন করে এলেন। ৩০ তারিখ বাড়ি ফেরার পথে ষ্টীমারে গুরুভ্রাতা বিধুভূষণ ঘোষের সঙ্গে দেখা, কিরণ বাড়ি না ফিরে বিধুবাবুর সঙ্গী হয়ে বানরিপাড়া চললেন। রাস্তায় আরও অনেক গুরুভাই এসে জুটলেন, সবাই মিলে ৩১ বৈশাখ বানরিপাড়া পৌঁছালেন। বানরিপাড়ায় সাধু সাজালের তিরোভাব উৎসব, সেই উপলক্ষে গোঁসাই-শিষ্যদের সমাবেশ। সাজাল ছিলেন জাতে মুসলমান, বানরিপাড়া অঞ্চলেই থাকতেন, নির্দিষ্ট কোন আশ্রয় ছিল না। সাধারণ লোকে তাঁকে পাগল বলেই ভাবত। কিন্তু সংকীর্তনে তাঁর মহাভাব হত, অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হত তাঁর শরীরে। গোঁসাইজী বলেছিলেন, সাজাল পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত মহাপুরুষ। গোঁসাইজীর শিষ্যেরা সাজালকে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, তাঁর দেহত্যাগ উপলক্ষেও মহোৎসবের আয়োজন করা হল। কিরণ এই উৎসবে যোগদান করে ৬ জ্যৈষ্ঠ বানরিপাড়া ছেড়ে বাড়ি এলেন; তাঁর সঙ্গী হয়ে খালিয়া এলেন তাঁর বানরিপাড়ার গুরুভাই অক্ষয় গুহঠাকুরতা। অক্ষয় ২০ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত কিরণদের বাড়িতে ছিলেন, দু'জনে গোঁসাই প্রসঙ্গে মেতে থাকতেন।

৩০ জ্যৈষ্ঠ প্রবল ঝড়বৃষ্টি হল এবং সঙ্গে ভূমিকম্প। ঝড় শুরু হওয়ার একটু আগে কিরণের গ্রামের কালিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত তাঁর ছেলে ও জামাইকে নিয়ে নৌকায় মাদারিপুর রওনা হয়ে গিয়েছেন। দুর্যোগ আরম্ভ হতেই কালিপ্রসন্নের স্ত্রী স্বামী-পুত্রের বিপদের আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে কান্নাকাটি শুরু করলেন। তাঁর অবস্থায় বিচলিত হয়ে কিরণ ঐ ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে মাদারিপুর গেলেন এবং ওঁদের নিরাপদ দেখতে পেয়ে পরদিন সবাইকে নিয়ে খালিয়া ফিরে এলেন। এই উপকারের জন্য কলিপ্রসন্নের স্ত্রী বরাবর কিরণের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করতেন। ২৯ আষাঢ় কিরণ খবর পেলেন, মাদারিপুরে তাঁর গুরুভ্রাতা অমৃতলাল সেনগুপ্তের স্ত্রী আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন; স্বামীকে সংসার থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি আত্মবিসর্জন করেছিলেন। এই ঘটনার অনেকদিন পরে ১৩০৫ সালের ৫ আশ্বিন কিরণ পুরী থেকে অমৃতের পত্রে জানতে পান যে গোঁসাইজী অমৃতকে বলেছেন যে তাঁর স্ত্রী বিমলা মায়ীর বিশেষ কৃপা লাভ করে আত্মহত্যা-জনিত দুর্ভোগের বারো আনা থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং গয়ায় পিণ্ড দিলেই সমস্ত ভোগ কেটে গিয়ে তাঁর পতিলোকে গতি হবে; স্বামী যেখানে যাবে তিনিও সেখানে তাঁর অনুগমন করবেন। গোঁসাইজীর পরম অনুগত শিষ্য শ্রীধর তাঁর পৈতৃক বাড়ি সদরদীতে এসেছেন খবর পেয়ে কিরণ ৯ শ্রাবণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, পরে দুজনে মিলে কুকুরহাটি গ্রামে উৎসবে যোগদান করলেন।

১৩০৪ সালের ২৩ ভাদ্র মঙ্গলবার কিরণ প্রাতঃস্নান শুরু করেন। এটি ক্রমে তাঁর এমন অভ্যেস হয়েছিল যে বাকী জীবনে নিতান্ত অসুস্থ না থাকলে প্রাতঃস্নান বন্ধ করেন নি। ২৭ ভাদ্র কিরণ জীবনে প্রথম নাটক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন; গ্রামেরই দীনবন্ধু ভট্টাচার্যের বাড়িতে এ অভিনয়ের আয়োজন হয়। 'রাম-বনবাস' নাটকে কিরণ রামের ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হন। ২৭ ভাদ্র থেকে ২৮ অঘ্রান পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাঁচদিন গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ঐ একই

নাটকের অভিনয়ে কিরণ নাম ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। এই নাট্যাভিনয় প্রীতি কিরণের সারাজীবনই ছিল, পরিণত বয়সে তিনি নিজে অভিনেতা সাজেন নি বটে কিন্তু অভিনয় তাঁকে আকর্ষণ করত, ভাল অভিনয়ের যথার্থ সমজদার ছিলেন তিনি। স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশজীর ১৩৫১-৫২ সালের রোজনামচায় দেখা যায় যে শিমুল-তলায় বায়ুপরিবর্তন করতে গিয়ে ২৪ পৌষ তিনি সঙ্গের শিষ্য-শিষ্যা সহ 'উদয়ের পথে' ছায়াছবিটি দেখে খুব খুশী হন এবং লিখে রাখেন, 'বড় সুন্দর ফিল্ম, এমন অনেকদিন দেখিনি, চমৎকার। অনুপ ও গোপা চমৎকার প্লে করেছে।' আবার ১৩৫২ সালের পুরীতে গোঁসাইজীর তিরোভাব সম্মেলন উপলক্ষে গিয়ে ২০ বৈশাখ তিনি উড়ে ভাষায় নাটক দেখতে গেছলেন এবং মন্তব্য লেখেন, 'প্লে দেখে অবাক হলাম। প্রত্যেকগুলি অ্যাকটর চমৎকার, কিন্তু কটা সীন হবার পরই ইলেকট্রিক ফিউজ হয়ে গেল, সবটা দেখা হলনা।' মনে রাখতে হবে যে ১৩৫১-৫২ সালে দরবেশজীর বয়স সাতষট্টি-আটষট্টি বছর। তিনি তখন প্রাচীন সন্ন্যাসী ও প্রায় দু'হাজার শিষ্য-শিষ্যার সম্মানিত ও ভক্তিস্নাত গুরুঠাকুর। না, এতসব বিশেষণ সত্বে-ও দরবেশজীর রসিক মনটি কখনো চাপা পড়ে যায় নি। নির্দোষ আনন্দ সম্ভোগের যে সব উপকরণ আছে, থিয়েটার সিনেমা সঙ্গীত ইত্যাদি সব কিছুতেই দরবেশজী সুযোগ পেলেই উৎসুক চিত্তে যোগ দিয়েছেন এবং অনাবিল আনন্দ পেয়েছেন। ভগবৎ ভজন করতে হলে কিংবা ভজন করে অবস্থা লাভ হলে একটা ছদ্ম-গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে থাকতে হয় অথবা যে সব আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে স্বভাবতই মনটা খুশী লাগে সে-সব অনুষ্ঠান ঘটা করে বর্জন করতে হয়—দরবেশজীর আচরণে এ রকমটা কখনো দেখা যায় নি। এ সব ছোটখাট বর্জনের সাহায্যে সস্তায় ধর্মলাভ করার মনোভাব একধরণের ছেলেমানুষি বলেই মনে হয়। বরং নির্দোষ এবং অস্বাস্থ্যকর নয় এমন যে সব প্রমোদের দিকে মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে তাতে

নির্বিকারে যোগ দিলে চিত্তে সাময়িক যে খুশীর হাওয়া বয় বা পুলকের জোয়ার খেলে তাতে ভজনার্থীর সামগ্রিক সুবিধে হবারই কথা। প্রচলিত ধর্ম-উপদেশে ত্যাগের বেনামে এই সব খেলো বর্জনের এত বেশি কাঁটাঝোপ ছড়ানো আছে যে কাঁটা ছাড়াবার প্রাণান্ত প্রয়াসে দেহ-মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়—পথ ধরে এগোনো আর যেন হয়ে ওঠে না।

সংসারের সুবৃহৎ রঙ্গমঞ্চের জীবন্ত স্বাভাবিক অভিনয়ই হোক আর আঁকা দৃশ্যপটের সাজানো মঞ্চের কৃত্রিম অভিনয়ই হোক—এর কোনটাই কিরণকে বেশিক্ষণ বেশিদিন একটানা ব্যাপৃত বা আটকে রাখতে পারে না। গোঁসাইজীর ডাক আসে, গোঁসাইয়ের সাক্ষাত সঙ্গের জন্য মন তাঁর পোড়ে। 'তাঁর চরণ আর তোমার পরাণ এক তারে বন্ধন—নদী আর সমুদ্র যেমন' বাউলের সুরের গানের এই পদটি কিরণই লিখেছিলেন—স্বভাব-বাউল কিরণ ও তাঁর সাঁই গোঁসাইজীর সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে। কিরণ আবার গোঁসাইজীর কাছে চলে এলেন ১৩০৪ সালের ১১ মাঘ, ৪৫ হ্যারিসন রোডের আস্তানায়। গোঁসাইয়ের কাছাকাছি থেকে গুরুভাইদের সাহচর্যে বড় আনন্দে দিন কাটে কিরণের। এর মধ্যে ১২ মাঘ গোঁসাইয়ের ফরমাশ মত কিরণ তাঁকে একখানা 'সর্ব দেবদেবী পূজা পদ্ধতি' বই কিনে এনে দেন। ১৬ মাঘ আবার তাঁর আদেশ মত কিরণ 'ঈশান সংহিতা' ও 'ঊর্ধ্বাম্নায় সংহিতা' বই দুখানি কিনে এনে দিলেন, কিরণ নিজের জন্য-ও বই দুখানার এক কপি কিনলেন। এইদিন গোঁসাইজী কিরণকে তাঁদের গ্রামের সাহাদের বাড়িতে গিয়ে উচ্ছিষ্ট খেতে নিষেধ করলেন। সংকীর্তন উপলক্ষে কিরণ যে এখানে সেখানে গিয়ে উচ্ছিষ্ট খেয়ে থাকেন, তা গোঁসাইজীর নজর এড়ায় নি। এরই মধ্যে ১৯ মাঘ কিরণ কলকাতা থেকে তাঁর দাদা ও বড় বৌদির সঙ্গে গিয়ে তারকেশ্বর দর্শন করে সেদিন-ই ফিরে এলেন। এ যাত্রায় ২০ মাঘ পর্যন্ত কিরণ গোঁসাইজীর সঙ্গ করলেন।

১৩০৪ সালের ২০ মাঘ কিরণ গুরুভাই ব্রজনাথ অধিকারীর সঙ্গে নবদ্বীপ ধাম যাত্রা করলেন, উদ্দেশ্য ধুলট উৎসবে যোগদান। ষ্টীমারে কলকাতা আহিরীটোলার ঘাট থেকে রওনা হয়ে তাঁরা প্রথমে কালনা এলেন। ২১ মাঘ কালনা ও অম্বিকায় দর্শনাদি সেরে নৌকায় করে ২২ মাঘ নবদ্বীপ পৌঁছালেন; সারাদিন নবদ্বীপের বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন করতে কেটে গেল। নবদ্বীপের উপকণ্ঠে মায়াপুর—কিরণ ২৪ মাঘ সেখানে ঘুরে এলেন। গঙ্গার যে পাড়ে প্রাচীন নবদ্বীপ ধাম রয়েছে তার অপর পাড়ে মায়াপুর বলে পরিচিত যে স্থানটি আছে তাকে অনেকে আসল নবদ্বীপ বলে প্রচার করে থাকেন। গোঁসাইজী ১৩০০ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে যখন নবদ্বীপ আসেন তখনই মায়াপুরের শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়। প্রতিষ্ঠা উৎসবে গোঁসাইজীকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য মায়াপুরের কজন ভক্ত আগ্রহ সহকারে তাঁকে অনুরোধ করতে আসেন। গোঁসাইজী মায়াপুর যেতে অস্বীকৃত হয়ে যা বলেছিলেন শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃতকার তা এইভাবে লিখেছেন ঃ

প্রভু সবিনয়ে এই কহিলেন বাণী।
শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান নবদ্বীপে জানি॥
তাঁহার বসতিস্থান অন্বেষণ তরে।
নবদ্বীপ পরিত্যাগ বাঞ্ছা নাহি মোরে॥
এ কারণে ক্ষমা চাহি তোমা সবা স্থলে।
নবদ্বীপে ভক্তি যেন কভু নাহি টলে॥

আসল নবদ্বীপ বলে না হোক, মন্দিরাদি স্থাপিত হবার পর মায়াপুর বর্তমানে একটি দর্শনীয় স্থান হয়েছে, সন্দেহ নেই। ২৬ মাঘ থেকে ২৯ মাঘ এ কদিনের মধ্যে কিরণ নবদ্বীপে কৃষ্ণদাস বাবাজী, সিদ্ধেশ্বরী মাতাজী ও নিত্যানন্দদাস বাবাজীকে দর্শন করেন। পয়লা ফাল্গুন কিরণ ও ব্রজনাথ নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা

করেন ; ঐ দিন রাতে মাধাইপুরে অবস্থান করেন। দোসরা ফাল্গুন সারাদিন পরিক্রমার পর বিল্বপুকুরে রাত্রিবাস হল। তেসরা কাজীর বাড়ি, মায়াপুর ইত্যাদি ঘুরে স্বরূপগঞ্জে গিয়ে রাত কাটালেন তাঁরা। ফাল্গুনের চার তারিখে দৈনিক পরিক্রমা অন্তে চাঁপাহাটীতে এসে বিশ্রাম নিলেন। পাঁচুই ফাল্গুন বিদ্যানগর, জাননগর ও মাধাইপুর হয়ে নবদ্বীপে ফিরে এসে পরিক্রমার সমাপ্তি হল। নবদ্বীপে আরও কিছুদিন বাস করতে ইচ্ছে হল কিরণের, ব্রজনাথ দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু ১১ ফাল্গুন নবদ্বীপ হরিসভায় গিয়ে কিরণ সেখানকার সিতিকণ্ঠ মশাইয়ের কাছে অমৃতলাল সেনগুপ্তের লেখা চিঠিতে খবর পেলেন যে গোঁসাইজী শীঘ্রই জগন্নাথধাম রওনা হবেন এবং কিরণ যদি সঙ্গে যেতে চান তবে যেন সত্বর কলকাতা চলে আসেন। এ সংবাদ পেয়ে কিরণের মন চঞ্চল হয়ে উঠল, তিনি ঐ দিনই নবদ্বীপ ছেড়ে কলকাতা রওনা হলেন। পথে গঙ্গাতীরে একটি ঘর ভাড়া করে রাত কাটিয়ে ১২ ফাল্গুন ভোরবেলা নৌকা করে গোয়ারী পৌঁছালেন ; গোয়ারী থেকে ঘোড়ার গাড়িতে হাঁসখালি এসে ট্রেনে চেপে সেদিন সন্ধ্যাসন্ধি কলকাতা ফিরে এসে যেন স্বস্তি পেলেন কিরণ।

কিরণ কলকাতা গোঁসাইজীর আবাসে এসে দেখলেন পুরী যাত্রার তোড়জোড় হচ্ছে, প্রায় পঞ্চাশজন গোঁসাইয়ের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন ; কিরণ-ও সেই দলে ভিড়ে পড়লেন। ২৪ ফাল্গুন গোঁসাইজী সদলে পুরীধাম যাত্রা করবেন স্থির হল। তেরোই ফাল্গুন রাত্রে গোঁসাইজী কিরণের কাছে নবদ্বীপ ভ্রমণের কথা জানতে চাইলেন, ধুলট কেমন হল জিজ্ঞেস করলেন। ধুলটের সময়ে ও পরিক্রমার কালে কী মহানন্দে ও অবিরাম কীর্তনের স্রোতের মধ্য দিয়ে দিন কেটেছে কিরণ তা বললেন। বৈষ্ণবদের মত গলায় কণ্ঠি ও ললাটে তিলক না থাকায় কিরণকে যে সময় সময় কত অসুবিধা ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে সে কথা শুনে গোঁসাইজী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা দেখা দিয়েছে তা নিয়ে আপশোষ

করলেন ; বললেন, 'বাহ্যিক আচার নিষ্ঠা নিয়েই সব ব্যস্ত, ভিতরে কারো দৃষ্টি নেই, অথচ বাংলার বাইরে রামায়েত ও অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অতটা সঙ্কীর্ণতা দেখা যায় না, তাঁরা প্রথম প্রথম বাঙ্গালীদের একটু অবজ্ঞা করলেও একটু মেশামেশি হলে আর সে ভাব থাকে না।' এই রাতেই গোঁসাইজী কিরণকে তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেচে বহু কথা বললেন, তাঁকে অনেক ভরসা দিলেন। গোঁসাইজীর এই আশ্বাস বাণী শুনে কিরণ অভিভূত হয়ে পড়লেন, গোঁসাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর সমস্ত মন ভরে উঠল।

পুরীধাম যাত্রার দিন যত এগিয়ে আসছে গোঁসাইজীর সঙ্গে যাবেন বলে যাঁরা স্থির করেছেন তাঁদের চিত্ত ততই উদ্বেল হয়ে উঠছে। এমন সময় ১৭ ফাল্গুন রাত্রে কিরণকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন গোঁসাইজী, 'কিরণ, তুমি কবে বাড়ি যাবে?' প্রশ্ন শুনে কিরণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল, তিনি অবাক বিস্ময়ে গোঁসাইজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তো আপনার সঙ্গে নীলাচলে যাব বলে মনে করেছি।' গোঁসাইজী বললেন, 'না, তোমার এখন আমাদের সঙ্গে যাওয়া হবে না। তুমি শীঘ্র বাড়ি যাও, তোমার মা তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। নীলাচলে গিয়ে ঠিক-ঠাক হলে আমি যোগজীবনকে তোমার কাছে চিঠি দিতে বলব। যোগজীবনের চিঠি পেলে, তখন তুমি নীলাচলে যেয়ো।'

গোঁসাইজীর সুস্পষ্ট নির্দেশ শুনে কিরণের মনে যে ভাব হল তা সহজেই অনুমেয় ; এ নির্দেশ না মেনেও উপায় নেই আবার গোঁসাইয়ের সঙ্গছাড়া হয়ে থাকতে হবে জেনে এবং তাঁর সঙ্গী হয়ে নীলাচলে যাবার দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে বলে কিরণের অন্তরে যে ঝড় উঠল তার খানিকটা নিশ্চয়ই তাঁর চোখেমুখে ফুঠে উঠেছিল। তাই যেন গোঁসাইজী নিজে থেকেই তাঁকে আশ্বাস দেবার জন্য বলতে লাগলেন, 'অমন এলোমেলো ভাবে কোন কাজ করা ঠিক নয়। সব দিক গুছিয়ে চলা ভাল। যাতে আনন্দ পাবে, কেবল যে তাই করতে

হবে, তার কোন অর্থ নেই। হাতের কাছে যে কাজ পড়বে শত ক্লেশ হলেও তৎক্ষণাৎ সে কাজ সম্পাদন করতে হবে। দুঃখ ও সুখ সমভাবে গ্রহণ করতে হবে। অনাসক্তভাবে অথচ প্রফুল্ল মনে সব কাজ করা উচিত। প্রফুল্ল চিত্তে কাজ করলেই যথার্থ 'কর্মক্ষয়' হয়, নতুবা অনিচ্ছায় কাজ করলে আরো কর্মে জড়িয়ে পড়তে হয়। সব কাজই ঠিক সেবার ভাবে করবে। এখন যদি সংসারের কাজ না করে অন্য ভাবে যা ভাল লাগে তাই নিয়ে দিন কাটাও তবে পরিণামে কর্মে জড়িয়ে পড়তে হবে। আর এখন যদি কর্ম করে কর্ম ক্ষয় কর তবে পরিণামে আলগা ভাবে দিন কাটাতে পারবে। কর্ম ক্ষয় না হলে কিছুই হবে না। সংসার চায় টাকা, সংসার চায় বসন-ভূষণ-মান-সম্ভ্রম-প্রতিষ্ঠা; কাজেই সংসার তোমার এই ফকিরীতে সন্তুষ্ট হবে কেন? আগে গিয়ে সংসারকে সন্তুষ্ট কর, তবেই ভগবান সন্তুষ্ট হবেন।' কিরণের ভবিষ্যতে যে বেশি কিছু কর্মভোগ নেই গোঁসাইজী সে রকম আভাষ-ও যেমন দিলেন তেমনি বললেন, 'এখন কর্ম কর। কর্ম এড়িয়ে চলতে চেষ্টা কোর না। আবার খামখা সেধে কর্ম নিজের ঘাড়ে এনো না।'

পরবর্তী জীবনে আচার্য দরবেশজী গোঁসাইজীর কর্ম সম্বন্ধে এই অনুশাসনের প্রত্যেকটি বাক্য প্রায় অক্ষরে অক্ষরে নিজে পালন করেছেন, আবার তাঁর অনুগত জনদের বিভিন্ন সময়ে ঠিক একই উপদেশ আরও বিশদ, আরও প্রাঞ্জল করে বলে গেছেন। দরবেশ দর্শনের ১৪।১১ নম্বর পত্রাংশে তিনি বলছেন, 'শ্রীগুরু যাহা বলেন তাহা নীরবে ও নিরাপত্তিতে করে যাওয়াই যথার্থ কর্ম। অন্য সমস্তই অকর্ম ও বিকর্ম। এ সমস্ত গীতার কথা।' ঐ গ্রন্থের ১৪।১৫ নম্বর পত্রাংশে তিনি বললেন, 'অর্থোপার্জন ও পরিবার প্রতিপালন কোনো বাজে বা বৃথা কাজ নয়। উহাকে-ও ভাগবৎ নির্দিষ্ট কর্ম এই ভাবে গ্রহণ করিলে কর্ম ও ধর্ম এক হইয়া যায়।' এই বাণীর তাৎপর্য নিজের অভিজ্ঞতার আলোতে বোঝাতে গিয়ে তিনি ১৪।৫২ নম্বর পত্রাংশে

লিখেছেন, 'আমি নিজে বৈষয়িক কার্য ও ব্যবসায় করিতে করিতে যেদিন বুঝিলাম, ভগবান যখন আমার জন্য এই কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তখন আনন্দের সঙ্গে এই কাজ করাই আমার সাধনের অঙ্গ, ; ঠিক সেই দিন হইতে আমার কর্ম শেষ হইল না (কেননা দেহধারীকে কর্ম করিতেই হইবে) কিন্তু কর্মজনিত গ্লানি দূর হইল।' কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম—কর্মের এই তিনটি রূপ নিয়ে প্রায়ই গোল বাঁধে। বিকর্ম অল্পেই বোঝা যায়—যে কাজ করতে গেলে বা করতে করতে সংস্কারবশতই হোক কিম্বা কাজের প্রকৃতি বা ধরণের জন্যই হোক মানসিক একটা গ্লানি বা অস্বাচ্ছন্দ্য আসে, পাপ-বোধ বা অপরাধবোধ আসে, তাকে বিকর্ম বলে জানতে হবে। বিকর্ম চিনতে অন্তত নিজের ভুল হয় না। কিন্তু কর্ম ও অকর্মের চেহারার মিল এত বেশি যে কর্মের—সৎকর্মের পোষাক পরে অকর্ম অনেক সময় বড়ই ধোঁকা দেয়। দরবেশ দর্শনের ১৪।২৫ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী বড় সুন্দর করে এদের প্রভেদ-টা দেখিয়েছেন, বলেছেন, 'হাতের কাছে যে কাজ আসে, তাই কর্ম। খোঁজ লইয়া চেষ্টা করিয়া যে কাজে যাইতে হয় তাহাই অকর্ম।' 'সৎ কর্ম-ও অনেক সময় বন্ধনের কারণ হয়' তখনই উহা অকর্মের পর্যায়ে পড়ে। দরবেশজীর আহ্বান পেয়ে তাঁর শিষ্য ডাঃ নীরদ বর্মণ একবার প্রয়াগে কুম্ভমেলায় এলেন ; একদিন সকালে দরবেশজী শুনলেন কে যেন তাঁবুর বাইরে থেকে 'ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু' বলে ডাকছে। কাকে ডাকছে জিজ্ঞেস করায় নীরদ জানালেন যে তাঁর কাছে ওষুধ নিতে এসেছে মেলায় আগত একজন তীর্থযাত্রী। দরবেশজী মন্তব্য করলেন, 'এখানেও তোমার ডাক্তারী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো!' নীরদ দরবেশজীর বিরক্তি দেখে একটু অবাক হলেন ; তিনি ডাক্তার, যদি মেলায় তাঁর সেবা দিয়ে কারোর উপকার করতে পারেন সে-তো ভাল কাজ, সৎ কাজ—এ নিয়ে যে আপত্তি উঠতে পারে তাঁর সে ধারণাই ছিল না। দরবেশজী বেশ পরিষ্কার করে কর্ম ও অকর্মের

পার্থক্য বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, 'ধর, তুমি পথে যেতে যেতে দেখলে একটি ছেলে রাস্তার পাশে পুকুরে পড়ে ডুবে যাচ্ছে আর বেশ কজন লোক ছেলেটিকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—সেখানে তুমি-ও যদি আবেগের বশে পুকুরে ঝাঁপ দিতে যাও তবে সেটা হবে অকর্ম, কারণ তোমার আগেই ছেলেটিকে বাঁচাতে যা করা দরকার অন্যে তা করেছে, তোমার সাহায্য ওখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যদি দেখ, ছেলেটিকে বাঁচাতে আশে পাশে আর কেউ নেই সেখানে তোমার কর্তব্য হল তখখুনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়া—এটাই তখন তোমার কর্ম, এ স্থলে কর্মে অবহেলা করাই হবে অধর্ম।' দরবেশ দর্শনের ১৪।৩৮ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী তাই বলছেন, 'সীমা ছাড়াইয়া অতিরিক্ত উৎসাহ কর্মীর হইতে পারে, কিন্তু কর্মযোগীর নহে!' আবার ১৪।৩৪ নম্বর পত্রাংশে এই উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করছেন, 'যাহারা শরীরকে গ্রাহ্য না করিয়া কর্মের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে—তাহাদের কর্ম শুধু কর্ম-ই, উহা বন্ধনের কারণ হয়। জ্ঞানপথ ও যোগপথের মত যে কর্ম মোক্ষ আনিয়া দেয়, এই কর্ম সেই কর্ম নহে।'

যাই হোক, গোঁসাইজীর কথা শুনে কিরণের মনে হল যে গোঁসাই বুঝি তাঁকে চিরকালের মত সংসারের হাতে সঁপে দিচ্ছেন, তাঁর মধুময় সঙ্গ আর কিরণের জীবনে বুঝি ঘটে উঠবে না। তাই তিনি বললেন, 'আমার বহুতর কর্মভোগ আছে, তা জানি। কিন্তু প্রাণে একটা আকাঙ্ক্ষা হয় যে যতদিন আপনি দেহে থাকেন ততদিন কাছে কাছে থাকি। এর পর আমার অদৃষ্টে যে কর্ম ভোগ আছে তা সব আনন্দের সঙ্গে ভোগ করব। আর এখনই যদি সংসারে জড়িয়ে পড়ি তবে আমার কর্ম শেষ হতে না-হতে আপনি হয়ত চলে যাবেন।' এই প্রসঙ্গেই কিরণকে গোঁসাইজী বলেছিলেন যে এক বাড়িতে বাস করাই সঙ্গ নয়; অন্যত্র সে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এত মিনতিতেও গোঁসাই কিরণকে পুরী যাবার অনুমতি দিলেন না, বললেন, 'আচ্ছা এখন বাড়ি যাও, মা বড় ব্যস্ত হয়েছেন।'

কিরণ ১৮ ফাল্গুন কলকাতা ছেড়ে ১৯ শে বাড়ি পৌঁছালেন তাঁর পুরী যাওয়া হল না বলে তাঁর গুরুভাইয়েরা অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন, কিন্তু কিরণের নিজের যেন আর কোন আশাভঙ্গের বেদনা রইল না। বাড়িতে এসে মা-কে প্রণাম করতে তাঁকে খুব খুশী দেখাল, অথচ তিনি যেন একটা সঙ্কোচ বা লজ্জার ভাব গোপন করে কিরণের কাছে সহজ হতে পারছেন না, এরূপ মনে হল। কিরণ জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তুমি অমন করছ কেন, কি হয়েছে?' কিরণের মা বললেন, 'বাবা আমি একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছি। তুমি গোঁসাইয়ের সঙ্গে পুরী যাচ্ছ শুনে আমার বড় ভয় হয়েছিল। আমি তো পুরী গিয়েছি, সে বড় ভয়ানক রাস্তা। তোর বাবা সব তীর্থ সেরে শেষটায় তোর দাদার উপর সংসারের ভার দিয়ে তবে আমাদের নিয়ে পুরী গেছলেন, কী জানি, আর যদি ফিরে আসতে না পারেন। এমন কঠিন রাস্তায় ছেলেমানুষ তোকে পাঠাতে আমার বড় ভয় হল তাই আমি গোঁসাইয়ের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম যাতে তোকে সঙ্গে করে না নেন। তাই তিনি তোকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার জন্যই তোর পুরী যাওয়া হল না।' মা যখন কথা বলছিলেন তখন কিরণদের বাড়ির এক গোমস্তা কাছে দাঁড়িয়েছিল, এই গোমস্তাই মায়ের হয়ে গোঁসাইকে চিঠিটা লিখে দিয়েছিল। মায়ের কথা শুনে গোমস্তা বললে, 'না কর্তা-মা, সে চিঠি পেয়ে তো ছোটবাবু বাড়ি আসেন নি। সে চিঠি পরশু দিনের আগের রাত্রে লিখেছি আর পরশু দিন ডাকে দিয়েছি। পরশু দিন কলকাতা থেকে রওনা না হলে বাবু আজ বাড়ি এলেন কি করে? চিঠিটা হয়তো আজ কি কাল কলকাতা পৌঁছাবে।' গোমস্তার কথা শুনে কিরণ অবাক হয়ে গেলেন। খালিয়ার বাড়িতে যে রাতে তাঁর মা গোঁসাইজীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখাচ্ছেন ঠিক সে সময়েই গোঁসাই কলকাতা বসে মায়ের ব্যস্ততার কথা বলে কিরণকে বাড়ি যেতে ব্যবস্থা দিচ্ছিলেন। সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে কিরণের মা

কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'গোঁসাই এমন সর্বজ্ঞ ও দয়াল যে আমার দুঃখ বুঝতে পেরে এমনি তোকে পাঠিয়ে দিলেন। এমন মহাপুরুষের আশ্রয় তুই পেয়েছিস, আমার আর কোন ভাবনা নেই। তুই তাঁর কাছে গিয়েই থাক।' মায়ের কথা শুনে কিরণ বড় আনন্দ পেলেন।

গোঁসাইজী নীলাচলে, তিনি ডেকে না পাঠালে কিরণের তাঁর কাছে যাবার কোন উপায় নেই। ম্রিয়মান হয়ে দিন কাটান তিনি। পুরী পৌঁছাবার পর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কিরণকে লেখেন, 'ভাই, তুই তো এলি না, আমরা পরমানন্দে ঠাকুরের সঙ্গে নানা স্থান ঘুরে দর্শন করছি। ঠাকুর চব্বিশ ঘণ্টা কী একটা ভাবে মাতোয়ারা হয়ে আছেন।' চিঠি পড়ে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করা কঠিন হয় কিরণের, কিন্তু তাঁর হাত-পা বাধা, যোগজীবনজীর চিঠি না এলে তাঁর তো পুরী যাওয়া চলে না।

গোঁসাইয়ের কথা, পুরীর কথা মনে হলেই মনটা কেমন যেন টনটন করে ওঠে তবু কর্তব্য কাজ, সংসারের কাজ সবই করে যেতে হয়; সহজ হয়ে চলতে হয়, স্বাভাবিক ভাবে সব কিছুতেই যোগ দিতে হয়। কিরণ ২৮শে ফাল্গুন আড়িয়ল রওনা হয়ে গেলেন, সরোজবালা তখন সেখানে। মাঝে মাঝে কিরণ আড়িয়লের আশে পাশে দেববিগ্রহাদি দর্শন করতে যান, কখনো কখনো সন্ধ্যা কীর্তনে যোগদান করেন। ১৭ চৈত্র কিরণের ছোট মা, সরোজবালা ও আরও অনেককে নিয়ে তিনি লাঙ্গলবন্ধে অষ্ঠমী স্নানের জন্য এলেন। ব্রহ্মপুত্রের জলে এই স্নান বহুদিনের পুরোণো প্রথা। কিরণ এত বড় মেলা, এত বিপুল লোক-সমাগম আগে আর কখনো দেখেন নি। অনেক সাধু, বৈরাগী-বৈষ্ণবের ভিড়। কিরণ ও সরোজ জোড় বেঁধে ঐ পুণ্য সলিলে তীর্থস্নান করলেন। নৌকা করেই আড়িয়ল রওনা হলেন সবাই, পথে কাইলার ট্যাক ও তালতলায় রান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা হল। ১৮ চৈত্র সন্ধ্যার পর আবার আড়িয়লে।

আড়িয়ল থাকতেই কিরণ ২৫ চৈত্র ও ১৩০৫ সালের ৬ বৈশাখ

এই হু'দিন হোলী গানের পাল্লায় আড়িয়ল গ্রামের দলের সরকার হয়ে যোগ দিলেন। প্রথম দিনে গানের লড়াই সোনারঙ্গের দলের সঙ্গে, কিরণ আসরে বসেই ও পক্ষের অনেক গানের জবাব লিখে দিলেন। লড়াইয়ের বিচারে হু'দল সমান সমান হল। দ্বিতীয় দিনের পাল্লা ছিল দিবন্দী গ্রামের সঙ্গে, সেদিন কিরণদের অর্থাৎ আড়িয়ল গ্রামের জয় হল। কিরণের খুব নাম হল এই কবিগানের লড়াইতে।

১৩০৫ সালের ৭ বৈশাখ কিরণ আড়িয়ল ছেড়ে খালিয়া চললেন, পথে মাদারিপুরে গুরুভাই যজ্ঞেশ্বর সেনের বাসায় যেতে ইদিলপুরের গুরুভাই বিপিন বাবুর সঙ্গে দেখা হল। পরদিন সকলে কুমারখালির কুঞ্জ সাহার সঙ্গে মাদারিপুর থেকে নৌকায় কুঞ্জদের বাড়ি এলেন। কুমার খালিতে সবাই মিলে কীর্তনানন্দে মেতে গেলেন। ৮ বৈশাখ রাত্রে খালিয়া পৌঁছালেন কিরণ। বৈশাখের প্রথমেই সরোজকে খালিয়ায় নিয়ে আসার কথা ছিল, কিন্তু সরেজের মা অসুস্থ হয়ে প্রায় শয্যাগত ছিলেন বলে সরোজবালার পক্ষে কিরণের সঙ্গে আসা সম্ভব হয় নি। খালিয়ায় এসে কিরণের মন আরও বেশি উচাটন হয়ে উঠল, গোঁসাইয়ের কাছ থেকে কোন আহ্বান আসছে না, পুরী যাবারও কোন উপায় হয় না। মন যখন বড় খারাপ লাগে গুরুভাইদের কাছে যান, তাতে তবু কিছু শান্তি পান। রোজ রাতে গুরুভ্রাতা রেবতী রায়ের বাড়িতে সমবেত সাধনের আসর বসে, মাঝে মাঝে কীর্তন হয়। প্রতীক্ষার দীর্ঘ দিন যেন আর কাটতে চায় না। এরই মধ্যে একদিন রাত্রে সাধন বৈঠক থেকে ফেরার পথে গোপাল ঠাকুরের মঠের শিবলিঙ্গ জড়ানো অবস্থায় একটি সাপ দেখতে পেলেন, সাপের মাথয় মণি জ্বলছে। তিনি সর্পবেষ্ঠিত শিবলিঙ্গের সামনে সাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম করলেন। আর এক রাতে, বাড়ি আসার সময় রাস্তায় খালিয়ার কেদার ভদ্রের পরলোকগত বোনের প্রেতাত্মা সামনে এসে দাঁড়াল এবং তার

ভাইকে বলে যাতে তার পিণ্ড দেবার ব্যবস্থা হয়, সে জন্য প্রার্থনা জানাল। কিরণ কেদার ভদ্রকে পাথেয়ের টাকা দিয়ে গয়া পাঠিয়ে প্রেতের সদ্‌গতির বন্দোবস্ত করে দেন।

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম দিকে খবর এলো, কিরণের শাশুড়ী ঠাকুরাণী ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, সরোজবালা এবার খালিয়া আসতে পারবেন। কিরণ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ সরোজকে নিয়ে আসার জন্য আড়িয়ল যাত্রা করলেন। পথে মাদারিপুরে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাসায় রাত কাটিয়ে পরদিন স্টীমারে করে আড়িয়ল পৌঁছালেন রাত্রে। ৯ই জ্যৈষ্ঠ সরোজাকে সঙ্গে নিয়ে আবার ফেরার পথ ধরলেন। সরোজ ডুলিতে ও কিরণ হেঁটে বহর পর্যন্ত এলেন, বহর থেকে স্টীমারে করে যাত্রা; পথে দু'বার স্টীমার পাল্টে সন্ধ্যার একটু আগে দু'জনে মাদারিপুর যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাসায় এলেন। সেখানে খাওয়া দাওয়া করে নৌকায় করে কুমারখালি এসে কুঞ্জ সাহাদের বাড়িতে রাত কাটালেন। ১০ জ্যৈষ্ঠ দুপুরে নৌকায় খালিয়া পৌঁছালেন।

খালিয়ায় দিন আর কাটতে চায় না। পুরীর কোন খবর আসে না। সব ঠিক ঠাক হলে গোঁসাই ডেকে পাঠাবেন বলেছিলেন কিন্তু তিনি নীরব। কিরণের অভিমান হয়। গোঁসাই কি তবে তাঁর কথা একেবারে ভুলে গেছেন? চিঠি দেবার কথা বলেছিলেন সে কি তবে শুধু স্তোক বাক্য? আবার ভাবেন, গোঁসাইয়ের কত অসংখ্য শিষ্য, কতজন তো তাঁর কাছেই রয়েছেন পুরীতে। এঁদের মধ্যে কিরণকে তিনি মনে করবেন, কিরণকে যা বলেছিলেন তা খেয়াল রাখবেন, এ আশা করাই তাঁর মূর্খতা। কিরণ গোঁসাইয়ের এমন কে, যে পুরীর আনন্দোৎসবের মধ্যে তিনি কিরণকে কবে কী বলেছিলেন তা স্মরণ করে রাখবেন? দিনরাত এ সব ভেবে ভেবে কিরণ প্রায় উন্মত্তের মত হয়ে গেলেন। তাঁর মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। কিরণের মা তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে পুরী যেতে বলতে লাগলেন বার বার কিন্তু পুরীর চিঠি না পেলে যে তাঁর যাওয়ার যো নেই, মাকে তা

বোঝানো দায় হল। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে যা হয়, নানারকম জল্পনা কল্পনা কিরণের মনে ভিড় করে আসতে লাগল; ভাবলেন, যার গুরুদেব শিষ্যকে এমনি ভুলে থাকতে পারেন, সেই শিষ্যের বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। যে অযোগ্য শিষ্যের জন্য মহাপুরুষকে একটা কৌশলের সাহায্যে ফেলে রেখে যেতে হল, সে শিষ্যের, সে পাষণ্ড শিষ্যের নরকেও কোন স্থান হবে না। এমন শিষ্যের আত্মহত্যা করাই একমাত্র পথ, একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। আত্মহত্যা করার জন্য কৃতসংকল্প হলেন কিরণ; ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বাজারে গিয়ে এক টাকার আফিং কিনে নিয়ে এলেন, পরদিনই পৃথিবীর কাছ থেকে চির বিদায় নেবেন তিনি।

১৩০৫ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ অন্যান্য দিনের মত উষা লগ্নে দেখা দিল। মর্ত্যজীবনে কিরণের আজ শেষ দিন। ভোর বেলা স্নান করে এসে কিরণ ফুল দিয়ে মালা দিয়ে গোঁসাইজীর ফটো বড় সুন্দর করে সাজালেন, মনে মনে গোঁসাইয়ের চরণে বিদায় গ্রহণ করে দণ্ডবত করলেন। চেয়ে দেখেন, ছবিতে গোঁসাইয়ের মুখ কান্তি যেন কত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তিনি যেন মৃদু মৃদু হাসছেন। সে হাসি আজ আর ভাল লাগল না, কিরণের অভিমান তা দেখে যেন আরও বেড়ে গেল। তিনি গোঁসাইয়ের সুমুখ থেকে চলে এলেন। গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী জনার্দনের মন্দিরে দণ্ডবত করা হল, পরে মাকে গিয়ে প্রণাম করলেন বললেন, 'মা, জীবনে কত অপরাধ করেছি তোমার কাছে, সে সমস্ত আজ ক্ষমা কর।' মা হেসে বললেন, 'তুই আমার কাছে কোন অপরাধই করিস নি। কেন, আজ এত করে ক্ষমা চাইবার কী হল। তুই কি এখনই পুরী যাচ্ছিস নাকি? গেলে আমার কোন আপত্তি নেই। গোঁসাইতো তোর ষষ্ঠী পূজার দিনই তোকে গ্রহণ করেছেন, তুই তো তাঁরই জিনিষ, আমার কাছে শুধু গচ্ছিত রয়েছিস। তোর জন্য আমার কোন ভাবনা নেই।' মায়ের কথা শুনে কিরণের প্রাণটা অনেকটা জুড়িয়ে গেল যেন, অনেকটা হালকা লাগল নিজেকে। মায়ের কাছ থেকে ঘরের

বাইরে এসে দাঁড়াতেই ডাক পিয়ন এসে কিরণের হাতে একটা টেলিগ্রাম দিল, তাড়াতাড়ি খাম খুলে দেখেন পুরী থেকে যোগজীবনজী তার করেছেন, Gosai ask you to come here.

টেলিগ্রামটি পেয়ে কিরণের চিত্ত ও মন এক অপূর্ব আনন্দে যেন অবশ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য ; মনের সাড় একটু ফিরে আসতেই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। ঠাকুর তো তবে তাঁকে ভুলে যাননি, যথার্থই তো তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন! ধন্য, কৃতকৃতার্থ মনে করলেন তিনি নিজেকে। পরদিনই পুরী রওনা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কিরণ। পরে কিরণ জানতে পারেন যে পুরী পোঁছাবার অল্প দিন পরই গোঁসাইজী যোগজীবনজীকে বলেছিলেন কিরণকে আসবার জন্য একটা চিঠি লিখতে। যোগজীবন চিঠি লেখার কথা একদম ভুলে গেলেন। এর মধ্যে কিরণ যেদিন আত্মহত্যার সংকল্প করে আফিং যোগাড় করলেন সেদিন রাত্রে গোঁসাইজী হঠাৎ যোগজীবনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরণকে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছিলি ?' যোগজীবন আপশোষ করে জবাব দিলেন, 'সে কথা আমার আদৌ মনে ছিল না। কাল সকালেই কিরণকে চিঠি লিখব।' তখন গোঁসাইজী খুব ব্যস্ততা দেখিয়ে বললেন, 'আর চিঠি দেবার সময় নেই। কাল সকালে উঠেই কিরণকে আসবার জন্য একটা জরুরী টেলি করে দিবি।' এ জন্যই প্রাতে যোগজীবনজী ঐ টেলিগ্রামটি পাঠান এবং দুপুর নাগাত ওটা কিরণের হাতে আসে।

এতদিনের উন্মুখ প্রতীক্ষা ও নিরাশ অভিমানের পালা শেষ হতে কিরণের আর তর সইল না, ২০ জ্যৈষ্ঠ তিনি পুরী যাত্রা করলেন। ওদিন মাদারিপুর গিয়ে যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাসায় রাত কাটিয়ে ২১ তারিখ ষ্টীমারে গোয়ালন্দ হয়ে রাতের ট্রেনে কলকাতা পৌঁছালেন। ২২ জ্যৈষ্ঠ রাত্রে 'হিন্দু' ষ্টীমারে সমুদ্র পথে চাঁদবালী হয়ে পুরীর পথ ধরলেন কিরণ। তখন পুরী যাবার রেললাইন হয় নি। ২৩ জ্যৈষ্ঠ

সারাদিন সমুদ্র যাত্রা। জীবনে এই প্রথম সমুদ্র দেখলেন কিরণ, সাগরতরঙ্গে ষ্টীমারের দোলন একদিকে যেমন মনোরম, তেমনি আবার বেশ ভয় ভয় লাগে। কিরণের বেশ ভাল লাগল, অন্যান্য যাত্রীদের মত তাঁর সমুদ্র পীড়া হল না। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সমুদ্র যাত্রার পর চাঁদবালী এসে এক দোকানঘর ভাড়া নিয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন তিনি। পরদিন সকালে ক্যানেলের পথে ছোট ষ্টীমারে কটকের দিকে আবার যাত্রা শুরু হল। ক্যানেলের দু'পাশের মনোরম দৃশ্য, কপাটের সাহায্যে ক্যানেলের জল আটকে রাখার অভিনব ব্যবস্থা—এ সমস্ত দেখতে দেখতে দীর্ঘ পথ কেটে গেল। ষ্টীমারের খাবারের দোকানে বিশেষ ফরমাশ দিয়ে লুচি ও আলুর ছোকা বানিয়ে নিয়ে কিরণের খাবার ব্যবস্থা করতে হল। প্রায় দেড়দিন ষ্টীমারে কাটিয়ে ২৫ জ্যৈষ্ঠ দুপুর একটায় কিরণ কটক পৌছালেন। ষ্টীমারে বসে কজন কটকবাসী উড়িয়ার সঙ্গে কিরণের আলাপ হয়েছিল। তাদেরই একজনের আমন্ত্রণে তার বাড়িতে গিয়ে আহার ও আশ্রয় যোগাড় হল তাঁর। ২৬ তারিখ ভোরবেলা পায়ে হেঁটে কটক থেকে আট মাইল দূরে মহানদীর ওপাড়ে বারং ষ্টেশনে এলেন কিরণ। বারং থেকে পুরী পর্যন্ত ক্ষুদ্র একটি রেল লাইন তখন ছিল। বারং থেকে ট্রেনে পুরীর দিকে যাত্রা শুরু হল। ট্রেনের কামরায় ঈশ্বর দে নামক এক সহযাত্রীর সঙ্গে কিরণের আলাপ ও ভাব হল। কিরণ পুরীতে নতুন যাচ্ছেন জেনে ঈশ্বর তাঁকে সঙ্গে করে পৌছে দেবেন বলে ভরসা দিলেন। তাঁর কাছেই কিরণ শুনতে পেলেন যে পুরীতে গোঁসাইজীকে সবাই জটিয়াবাবা বলে জানে, আর তারা বলে যে পুরীধামে জটিয়াবাবাব মত মহাত্মা আর ইদানীং আসেন নি। বেলা প্রায় দু'টার সময় ট্রেনে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে এলো, কিরণ ও ঈশ্বর দু'জনেরই বড় খিদে পেয়েছে তখন। ষ্টেশনের বাইরের খাবার দোকান থেকে কিছু কিনে আনবার উদ্দেশ্যে কিরণ গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। খাবার কিনে ভিড় ঠেলে প্লাটফরমে আসতে না আসতেই

ট্রেন ছেড়ে দিল ; কিরণ চলন্ত গাড়ির দিকে দৌড়ে যেতে ঈশ্বর চেঁচিয়ে কি যেন বললেন, কিরণ শুধু 'সত্যবতী' 'সত্যবতী' এই কথা ছাড়া অন্য কিছু আর বুঝতে পারলেন না। কিরণ হতভম্ব হয়ে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে দুজনের জন্য কেনা খাবার পুরোটাই খেয়ে নিলেন, ঠাণ্ডা জল খেলেন, তারপর ভাবতে বসলেন ঐ পরিস্থিতিতে কী করা দরকার। কিরণের ছোট বিছানা ও একটা ঝোলা ঈশ্বরবাবুর জিম্মায় নিরাপদে থাকবে, এ সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। ষ্টেশনের এক বাবুকে ধরে জানতে পারলেন যে সত্যবতী ঐ লাইনের পরবর্তী একটি ষ্টেশনের নাম ; রাত দশটায় যে ট্রেন ভুবনেশ্বরে আসবে সে ট্রেনে গিয়ে রাত বারোটায় কিরণ সত্যবতী পৌঁছাতে পারবেন। সে ট্রেনের অনেক দেরী, কিরণ তখন শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর দেবের শ্রীমন্দির দর্শন করার এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত মনে করলেন না। একজন পাণ্ডাও জুটে গেল, কিরণ ভুবনেশ্বর দর্শন করতে বেরিয়ে পড়লেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীন, কারুকার্য পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরকেও অনেকটা হার মানায়। এই অপরূপ মন্দির দর্শনে কিরণের খুব আনন্দ হল ; মন্দির ও ভুবনেশ্বরদেবের লিঙ্গমূর্তি দর্শন করে তাঁর ট্রেন ফেল করার দুঃখ ঘুচে গেল। ভুবনেশ্বর মন্দিরেও পুরীর মত প্রসাদ কিনতে পাওয়া যায়। কিরণ সারাদিন মন্দিরে কাটালেন, প্রসাদ পেলেন ও সন্ধ্যারতি দর্শনের পর রাত নয়টা নাগাত ষ্টেশনে ফিরে এলেন।

ভুবনেশ্বরে রাত দশটার গাড়িতে চেপে কিরণ রাত বারোটায় সত্যবতী ষ্টেশনে এসে গাড়ির কামরায় বসেই ঈশ্বরবাবুকে প্ল্যাটফরমে দেখতে পেয়ে তাঁকে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠতে বললেন। কিন্তু ঈশ্বরবাবু সে চেষ্টা না করে কিরণকে ষ্টেশনে নেমে পড়ার জন্য বারংবার বলতে লাগলেন। নামবেন কেন তা না বুঝেও ওঁর পীড়াপীড়িতে কিরণ গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়লেন, গাড়িও চলে গেল। ঈশ্বরবাবু কিরণকে বোঝালেন যে তিনি যদি সকালের গাড়িতে সোজা

পুরী চলে যেতেন তবে কিরণকে ষ্টেশন থেকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে রাত দু'টার সময় আবার আসতে হত। কিরণ যে গাড়িতে সত্যবতী এলেন সে গাড়িতে দু'জনে পুরী গেলে সেই রাত দু'টায় পৌঁছে পুরী সহরে পৌঁছানো মুস্কিল হত। এসব ভেবেই তিনি ভুবনেশ্বরেই কিরণকে সত্যবতী ষ্টেশনে নামবার কথা বলে এসেছিলেন। সত্যবতীতে ঈশ্বরবাবুর পরিচিত পাণ্ডা আছে। তার ওখানে থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। পুরীতে দিনের বেলা পৌছানোই ভাল। ঈশ্বরবাবুর কথায় কিরণ প্ল্যানটা বুঝতে পেরে খুশী হলেন। দুজনে সাক্ষীগোপালের পাণ্ডার বাড়িতে ঘুমিয়ে সে রাতটা কাটালেন। পরদিন সকালে স্নান সেরে সাক্ষীগোপালের মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করে কিরণ যেন কৃতার্থ বোধ করলেন। দুপুরে পাণ্ডার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া সেরে ষ্টেশনে এসে ট্রেন ধরে বেলা চারটায় পুরী ষ্টেশনে পৌছলেন তাঁরা। গাড়ি থেকেই জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন হল কিরণের। ভুবনেশ্বরে ট্রেন ফেল করার ফলেই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে পুরীর রাস্তার প্রধান দুটি তীর্থ—ভুবনেশ্বর ও সাক্ষীগোপাল— দর্শন হয়ে গেল কিরণের। এই অভাবিত যোগাযোগের মধ্যে গোঁসাইজীর কৃপার নিদর্শন পেয়ে কিরণের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

তখনকার পুরী ষ্টেশন সহর থেকে তিন মাইল দূরে ছিল। কিরণ ঈশ্বরবাবুর সঙ্গে একটা মানুষ-টানা গাড়িতে সহরে এলেন। ঈশ্বরবাবু তাঁকে বড়দাণ্ডে নীলমণি বর্মণের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। বাড়ির দরজায় প্রথমেই অমৃতলাল সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা হল কিরণের, অমৃত চীৎকার করে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। ক্রমে অন্য সব গুরুভাইদের সঙ্গে দেখা হল। যোগজীবনজা, দিদিমা মুক্তকেশী দেবী ও শান্তিসুধার চরণ বন্দনা করলেন কিরণ। বিকেল সাড়ে পাঁচটা তখন। কিরণ শুনলেন গোঁসাইজী তখনই দর্শনে বের হবেন। তিনি ধীরে ধীরে গোঁসাইজীর ঘরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লেন। মধুর হেসে গোঁসাই বললেন, 'কি, এসেছ?' একথা

শুনেই কিরণের এতদিনের অবরুদ্ধ অভিমান আর যেন বাঁধ মানল না, আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। আস্তে আস্তে এতদিনের সব কথা, সব ভাবনার কথা গোঁসাইকে জানালেন তিনি। গোঁসাই শুনে হেসে বললেন, 'যার শেষ ভাল, সে-ই ভাল। এখন ত পুরীতে আসা হল। কর্তব্য কিছুমাত্র লঙ্ঘন করনি ভেবে এখন আনন্দে পুরী বাস করতে পারবে।'

পুরীতে পৌঁছাবার পরদিন ১৩০৫ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ কিরণ গোঁসইজীর সঙ্গে গিয়ে সমুদ্র স্নান করলেন। পরে তিনি একাকী শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বিমলামায়ী ও মন্দিরের অন্যান্য সমস্ত দেবদেবী দর্শন করলেন, কৃতার্থ বোধ করলেন। এই দিনটি প্রথম মহাপ্রসাদ পেয়ে ধন্য হলেন তিনি। এই মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে গোঁসাইজীর উক্তি হল, 'মহাপ্রসাদ ও জগন্নাথ দেব এক। মহাপ্রসাদ আহার করিলে পুনর্জন্ম হয় না। উহা দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপুরুষদেরও আর জন্ম হয় না।' গোঁসাইজী পুরীতে গিয়ে প্রথম যেদিন সমুদ্র স্নান করেন সেদিন বলেছিলেন, 'স্বর্গদ্বারই স্নানের উপযুক্ত স্থান, অন্যস্থানে স্নান করা ভাল নয়। পুরীতে পাকাল প্রসাদ শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। সমুদ্র-স্নান করে পাকাল না খেলে শরীর অসুস্থ হয়।'

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন কিরণের প্রায় নিত্যকর্মের মত হয়ে গেল। তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেকদিনই তিনি পুরীধামের অন্যান্য দেববিগ্রহ ও তীর্থস্থলীর মধ্যে কোথাও না কোথাও দর্শনে যেতেন। ২৯ জ্যৈষ্ঠ তিনি হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, টোটা গোপীনাথ দর্শন করেন। আবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ গুণ্ডিচাবাড়ি ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ঘুরে এলেন। ৪ আষাঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর গম্ভীরা দর্শন করতে গিয়ে প্রভুর কাঁথা ও করঙ্গ স্পর্শ করে কিরণ অভিভূত হলেন, ঐ দিন রাধাকান্ত ঠাকুরও দর্শন হল। গোঁসাইজী প্রথম পুরীধামে এসে যখন গম্ভীরা দর্শন করতে যান তখন মন্তব্য করেছিলেন যে সেবকেরা ঐ স্থানের প্রভাব নষ্ট করে ফেলেছে, এখন যেটি গম্ভীরা বলে পরিচিত ওখানে পূর্বে একখানি কুটীর ছিল ;

তাতেই মহাপ্রভু অবস্থান করতেন ; এখন সেখানে দালান হয়েছে।

কিরণ গোঁসাইজীর সঙ্গে বাস করবেন বলে কত আর্তি প্রকাশ করে পুরীধামে এসেছেন, সদ্‌গুরু সাক্ষাত ভগবান গোঁসাইজীর কাছ ছাড়া হয়ে তিনি নিয়মিত দেববিগ্রহাদি দর্শন করে বেড়াচ্ছেন, এ ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠা বিচিত্র নয়। গুরুতে অনুরাগ জন্মালে এবং সাক্ষাত ভাবে দেহধারী গুরুর সঙ্গের সুযোগ থাকলে অন্যত্র গিয়ে বিগ্রহাদি দর্শন করা-কে অবান্তর বলে মনে হতে পারে, অনুচিত বলে ভাবাও অন্যায় মনে হয় না। কিন্তু এ প্রশ্নের একটা তাৎপর্যময় উত্তর গোঁসাইজী নিজেই দিয়েছেন। একবার বৃন্দাবন যাবার পথে ট্রেনের কামরায় বসে সঙ্গী শিষ্যদের বৃন্দাবন-বাস কালে অবশ্য কর্তব্য হিসাবে প্রত্যহ অন্তত একবার কোন ঠাকুর মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করতে হবে বলে গোঁসাইজী নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই উপদেশ সম্বন্ধে বিধু ঘোষ মশাই তাঁর কজন গুরুভাইকে বলেন যে গুরুনিষ্ঠা থাকলে ভগবান অথবা তাঁহার বিগ্রহাদির প্রতি ভক্তি না করলেও কোন ক্ষতি নেই। বিধুবাবুর মন্তব্য গোঁসাইজীর কর্ণগোচর হলে তিনি বললেন, 'ভগবতত্ত্ব গুরুতত্ত্বেরই অন্তর্গত। গুরুভক্তি লাভ হলে ভগবান বা তাঁর বিগ্রহাদির প্রতি ভক্তি না হয়েই পারবে না। যদি কেউ বলেন যে তাঁর গুরুভক্তি লাভ হয়েছে অথচ তিনি ভগবদ্বিগ্রহাদি মানেন না, তবে বুঝতে হবে তাঁর গুরুভক্তিই লাভ হয়নি।' গোঁসাইজী নিজে যেমন কোন তীর্থে উপস্থিত হয়ে সেখানকার সমস্ত দেববিগ্রহ দর্শন করতেন তাঁর শিষ্যদের-ও অনুরূপ নির্দেশ দিতেন। দরবেশজী-ও পরিণত জীবনে তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের তীর্থস্থানে গিয়ে দেবস্থান দর্শন করতে বলতেন। কাশীধামে তাঁর কাছে যখনই কোন শিষ্য আসতেন তাঁকে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা অবিলম্বে দর্শন করাবার জন্য ব্যগ্র হতেন দরবেশজী।

পুরীধামে গুরুর আশ্রমে গুরুভাইদের নিয়ত সাহচর্যে বড় আনন্দে দিন কাটে কিরণের। গোঁসাই যেদিন সমুদ্র স্নানে বা দর্শনে

যান সেদিন কিরণ তাঁর সঙ্গী হন। ৬ আষাঢ় সমুদ্র স্নান করবার সময় গোঁসাইয়ের পায়ে আঘাত লাগে। রথযাত্রার আগের দিন ৭ আষাঢ় কিরণ পাণ্ডার সঙ্গে গিয়ে শূন্য রথ একটু টেনে এলেন। ৭ আষাঢ় রথযাত্রার দিন, দ্বিতীয়া তিথির সঞ্চার সময়ের মধ্যে জগন্নাথদেবকে রথে তোলা হল না; গোঁসাইজী বললেন যে এবার রথ হল না, গোঁসাইজীর পায়ে আঘাত লেগেছিল বলে তাঁকে রথ দেখতে নিয়ে যাবার জন্য একটা তাঞ্জাম ভাড়া করে আনা হয়েছিল। কিরণ ও তাঁর গুরুভাইয়েরা গোঁসাইজীকে ঐ তাঞ্জামে তুলে কাঁধে করে খানিকক্ষণ বেড়ালেন। এটাই তাদের রথযাত্রা হয়ে গেল। পরে রথে স্থাপিত বিগ্রহকে কিরণ দর্শন ও আলিঙ্গন করে ধন্য বোধ করলেন। ৯ আষাঢ় প্রাতে বলরামের রথ ও বিকেলে সুভদ্রার রথ একটু টেনে এলেন তিনি।

১৩০৫ সালের ১০ আষাঢ় কিরণ পুরোনো অভ্যাস তামাক খাওয়া ছেড়ে দিলেন। এই দিন থেকে ত্রিসন্ধ্যা স্নান শুরু করলেন তিনি। এই তামাক খাওয়া কিরণ আবার ধরেছিলেন বহুদিন পরে। গোঁসাইজীর দেহত্যাগের পর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী কিছুদিন গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে কুটীর বানিয়ে সাধন করতেন। কিরণ একবার কিছুদিন তাঁর সঙ্গে পাহাড়ে ছিলেন। সে সময় ব্রহ্মচারীজী পুনরায় কিরণকে তামাক খাওয়া ধরিয়েছিলেন, বোধ হয় একা একা তামাক খেয়ে তেমন সুখ হত না বলে। ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য কিরণের সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র ধানবাদের ক্ষিতীশ চাটুজ্যেকে দরবেশজী বলেছিলেন, 'তামাক তো ছেড়েই দিয়েছিলাম, তোর ঠাকুর একটু খা, একটু খা বলে বলে আবার আমাকে তামাক খাওয়া ধরিয়ে ছাড়ল।'

সতেরোই আষাঢ় তারিখ কিরণের সাধন পাওয়ার পর চতুর্থ বছর শুরু হল। এই বছরটি কিরণের সাধন জীবনে একটি বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল অধ্যায়ের সময়। ক্রমে ক্রমে এর পরিচয় পাওয়া যাবে। এই দিন

রাত্রে কিরণের স্বপ্নদোষ হল। পরদিন আঠারোই আষাঢ় কিরণ গোঁসাইজীকে উহা জানালেন, অনুতপ্ত কিরণ তাঁর সারা জীবনের যত দুষ্কার্যের কথা গোঁসাইয়ের চরণে নিবেদন করলেন, অবিরাম কান্নায় দেহ মনের যত আবিলতা ধুয়ে ফেলতে চাইলেন। গোঁসাইজী সহানুভূতির সঙ্গে মিষ্টি কথায় অনেক সান্ত্বনা দিলেন কিরণকে, বললেন 'তোমার জীবন বিফল নয়। তোমার ষষ্ঠী পূজার দিন রাত্রে ভগবান তোমাকে গ্রহণ করেছেন। ···তুমি মহাদেবের চিহ্নিত দাস, তাই তিনি স্বয়ং এসে তোমাকে শিবপূজা দিয়েছেন। ব্যস্ত হয়ো না। তোমার কাম থাকবে না। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা কর, সমুদ্র স্নান কর, এবং লোকনাথ ও জগন্নাথ দর্শন কর।' গোঁসাইজী কামের প্রতিকারের জন্য কিরণকে একটা বিশেষ কৌশল বলে দিলেন, একটা আলাদা মন্ত্রও বলে দিলেন। এই বিশেষ কৌশলটির লতা- সাধন বলে তন্ত্রে উল্লেখ আছে। তন্ত্রে যদিও এই সাধনের খুব প্রশংসা আছে কিন্তু প্রণালী লেখা না থাকায় তান্ত্রিকেরা ভুল প্রয়োগ করে থাকেন। গোঁসাইজী বলেছিলেন যে শাস্ত্রে অনেক সময় সাধন প্রণালী বড় একটা লেখা থাকে না, উহা গুরু পরম্পরায় শিখতে হয়। তন্ত্রের সাধন বলে কিরণের এর প্রতি একটা বিরাগ ভাব ছিল প্রথম প্রথম। কিন্তু গোঁসাই জোর দিয়ে বললেন, 'তিন বছর এই সাধন কর, সমস্ত আশা চারিতার্থ হবে।'

এই লতা-সাধন কিরণ পুরো তিন বছরই করেছিলেন। এই সাধনের একটি বিশেষ অনুশাসন হল স্ত্রীলোক স্পর্শ না করা এবং কোন কারণে স্পর্শ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ স্নান করা। বলা বাহুল্য যে কিরণ এই তিন বছর বিবাহিত হয়েও স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করেছিলেন। এই সাধনের সময় বিভিন্ন সময়ে যে সব অবস্থার মধ্যে তাঁকে পড়তে হয়েছে এবং কাম প্রবৃত্তি কী ভাবে বারংবার তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে তা তিনি 'মদীয় জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলীর পঞ্জিকা' পুস্তিকায় মাঝে মাঝে উল্লেখ করেছেন। এই সাধন গ্রহণ করার কদিন পরই

১৩০৫ সালের ১ শ্রাবণ তারিখের কথা তিনি লিখছেন, 'বড়ই আনন্দে সময় কাটে। আরও আনন্দ হইত যদি কাম না থাকিত। ঠাকুরের দেয়া কৌশল মত চলিতে গিয়া কাম যেন আরও বহু পরিমাণে বাড়িয়াছে। কামে মোর হত চিত।' আবার ৭ শ্রাবণের মনের অবস্থা, 'বড় পাপ। প্রাণটা যেন নরক। ঠাকুর রক্ষা কর, আর এ জ্বালা সয় না।' ৮ ভাদ্র কিরণ পুরী থেকে কিছুদিনের জন্য বাড়ি চলে আসেন, তখন গোঁসাইজী তাঁকে পুনঃ পুনঃ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন। খালিয়া ফিরে আসার কদিন পর ১১ কার্তিক কিরণ লিখেছেন, 'বড় কষ্ট, কাম চিন্তায় চিত্ত অস্থির, অথচ কোন মেয়ে মানুষের কথা ভাবতে যেন বমি আসে।' এর পর ২৯ কার্তিক কিরণের মন্তব্য, 'ভয়ঙ্কর সাধন দিয়াছেন ঠাকুর, আর বুঝি রক্ষা নেই। স্মরণাগতং মাং গুরুদেব রক্ষ।' মাঘ মাসের ৬ তারিখের লেখায় দেখা যায় যে অবস্থার ঈষৎ পরিবর্তন হয়েছে, বলছেন, 'ভিতরে স্ত্রীজাতির প্রতি দারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা, স্পর্শ হইলে স্নান করিতে হয়। এই সময়টা বাহিরে পরমানন্দ ও ভিতরে দারুণ শুষ্কতা চলিতেছে।' ১৯ মাঘের উপলব্ধি, 'কাম ও নাম—এই দুইটার উপরই প্রখর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।' ফাল্গুন মাসের ১৯ তারিখ কামের জন্য উত্যক্ত হয়ে কিরণ যেন দিশাহারা বোধ করলেন, লিখলেন, 'এত আনন্দ এত কীর্তন কিন্তু ভিতর কামের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে। আর যেন সইতে পারি না। কোথায় ঠাকুর! আমি কি শেষে তোমারই দেয়া সাধন করে পশু হয়ে যাব? আর টিকতে না পেরে আজ রাত্রে কাকেও কিছু না বলে বাড়ি থেকে পালালাম।' ২৪ ফাল্গুন কিরণ গোঁসাইয়ের কাছে পুরী চলে এলেন, ২ চৈত্র তিনি লিখলেন, 'নীলাচলে আজ প্রথম ঠাকুরের নৃত্য দর্শন করিলাম। কিন্তু এত আনন্দেও আমার প্রাণটা এত নরক কেন? কেবল কাম কাম কাম। আর তো বাঁচি না। কী নূতন প্রণালী ঠাকুর দিলেন! কই, এতে তো কাম গেল না, এবং বেড়েছে। তিন বছর এই নিয়মে চলতে হবে, পারব

তো ?' ৩০ চৈত্র গোঁসাইজীকে নির্জনে পেয়ে কিরণ অবিরাম কাঁদতে লাগলেন, বললেন, 'কামে চিত্ত অস্থির অথচ স্ত্রীলোক দর্শন মাত্র ঘৃণা হয়, ইচ্ছা হয় মেরে ফেলি।' গোঁসাইজী একটু জোরের সঙ্গে বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ? আমি তো বলেছি, তোমার এ সব থাকবে না, তোমাকে দিয়ে আমার ঢের কাজ আছে। তোমায় যে ভাবে ইচ্ছা তৈরী করে নিতে হবে। নিজেকে ছেড়ে দাও। কেবল তোমার নির্দিষ্ট সাধন করে যাও। তিন বছর পরে তুমি নতুন মানুষ হয়ে যাবে।' গোঁসাইজীর এই আশ্বাস বাণীর পরেই কিরণের কাম নিয়ে ব্যতিব্যস্ততা কমতে লাগল মনে হয় ; কারণ ও বিষয় তিনি আর কিছুই উল্লেখ করেন নি। গোঁসাইজীর দেহত্যাগের পর কিরণ পুরী ছেড়ে আসেন। প্রায় বছর খানেক বাদে ১৩০৬ সালের ৩০শে ফাল্গুন তিনি কাশীধামে থাকার সময় তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, 'দিন বেশ যাচ্ছে। কাম যেন নেই বলেই মনে হয়।' ১৩০৮ সালের ১৭ আগাঢ় কিরণের লতা-সাধন পর্ব তিন বছর অন্তে সমাপ্ত হল। ঐ তারিখে তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করে কলকাতা হয়ে বারাণসী গেছলেন। বারাণসী থেকে ভাদ্র মাসের তেসরা তিনি খালিয়ার বাড়িতে ফিরে আসেন এবং দীর্ঘদিন পর পত্নী সরোজবালার সঙ্গে এক বিছানায় আবার শয়ন করতে শুরু করেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে কিরণকে যে উদ্দেশ্যে ঐ বিশেষ সাধন গোঁসাইজী দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। কিরণের কাম এই সাধন করার ফলে লোপ পেয়ে যায় নি। কিন্তু যে কাম সাধকের উদ্বেগ সৃষ্টি করে, তাঁকে বিচলিত ও বিপন্ন করে তোলে কিরণের সে কাম আর ছিল না। এই সাধনের অন্তত প্রথম দিকে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে বিতৃষ্ণা বা ঘৃণার ভাব তাঁর হয়েছিল, সাধন অন্তে সেই অস্বাভাবিক অনুভূতির ও অবসান ঘটল।

লতা সাধনের প্রসঙ্গে কিরণের দেহ ও মনের যে সমস্ত অভিব্যক্তি উদ্ধৃত করা হল তা থেকে একটা কথা স্বভাবতই মনে আসে যে

কিরণ পরবর্তী জীবনে নিজে সাধন দিতে আরম্ভ করায় পর তাঁর শিষ্যদের বিশেষত বিবাহিত শিষ্যদের কাম সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়েছেন তাঁর নিজের ও বিষয়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা যেন তেমন খাপ খায় না। কিরণ যখন লতা সাধন পান তখন তিনি বিবাহিত, পরিমিত কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সহজ, স্বাভাবিক ও শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা তাঁর আয়ত্তে ছিল। অথচ এই প্রবৃত্তিটিকে তিনি এত গুরুত্ব দিলেনই বা কেন, কামের সঙ্গে অহেতুক এই ক্লেশ কর সংগ্রামেই বা লিপ্ত হলেন কেন? এটা কি নিছক তাঁর সাধক জীবনের সংস্কারজাত একটা বিজিগীষা, না তাঁর কামের প্রবণতা এত বেশি হয়েছিল যে তাকে বশে আনার জন্য তাঁর ঐ রকম একটা অসাধারণ প্রণালী অবলম্বন করে অনেকটা অস্বাভাবিক একটা অবস্থায় মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল? এ প্রশ্নের যে কোন একটা উত্তর মেনে নিয়ে খুশী হওয়া যেত যদি না গোঁসাইজী স্বয়ং কিরণকে এই সাধনের জন্য বেছে না নিতেন এবং এই অস্বাভাবিক পন্থায় চলার জন্য তাঁকে উৎসাহ না দিতেন। তাই মনে করায় যথেষ্ট কারণ আছে যে এই লতা সাধনের পেছনে একটি গূঢ় কারণ ছিল যা গোঁসাইজী জানতেন বলেই তিন বছরের এই ব্রতটির সাহায্যে তিনি কিরণের সাধন পথ সরল ও সুগম করে দিয়েছিলেন। কিরণের সাধন জীবনের একটি দুর্গম ও নীরস অধ্যায় অনেকটা যেন তাঁর অজ্ঞাতেই তিনি তর তর করে পার হয়ে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় পর দরবেশজী তাঁর কজন শিষ্য-শিষ্যকে লতা সাধন অন্তত আংশিক ভাবে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রভাত ভৌমিক তাঁর বিয়ের আগে এ সাধন পান, আর শচীদেবী দরবেশজীর আদেশে আমরণ কুমারীব্রত অবলম্বন করেই ছিলেন। তাঁর বিবাহিত কোন শিষ্য বা শিষ্যাকে দরবেশজী লতা সাধন দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

দরবেশজী বলেছেন যে তাঁর সাধন পাওয়ায় তিন বছর পর তাঁর

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম গেঁথে গিয়েছিল। একদিন রাত একটার সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল কী যেন একটা হয়েছে, দেখেন শ্বাসের সঙ্গে নাম মিলে গেছে। ঠিক কোন তারিখে তাঁর এ অবস্থা লাভ হয়েছিল, তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন নি। কিন্তু ১৩০৫ সালের ১৭ আষাঢ়ের পরের এক বছরের কোন দিনে এটা ঘটেছিল নিঃসন্দেহ, ঐ বছরের ৩০ চৈত্র কাম সম্বন্ধে গোঁসাইজীর সঙ্গে তাঁর শেষ কথা হয় এবং এর পর থেকেই তিনি অনেক শান্ত বোধ করেন। সাধন মার্গের এই বিশেষ অবস্থা অর্থাৎ প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হওয়ার অবস্থা লাভের অব্যবহিত আগের পর্বেই কিরণের কাম নিয়ে উদ্বেগের দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই একটা নিদারুণ শুষ্কতার অধ্যায় পেরিয়ে কিরণকে ঐ সরস অবস্থায় পৌঁছোতে হয়েছিল। সুতরাং এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে লতা সাধনের সময়ের বিরক্তি-কর ও অস্বস্তিকর প্রথম দিকটায় কিরণ তাঁর সাধন জীবনের অবশ্যম্ভাবী শুষ্কতার অভিজ্ঞতাটি ভুগেছিলেন। কামের জন্য তাঁর যে জ্বালা হয়েছিল তা এই শুষ্কতার নামান্তর মাত্র।

গোঁসাইজী বলেছেন যে শ্বাস প্রশ্বাসে যখন নাম হতে থাকে তখন জ্বালা আরম্ভ হয়, ক্রমে নামের সঙ্গে সঙ্গে এই জ্বালা এতই বেড়ে যায় যে মনে হয় 'শরীরের অণু-পরমাণু একেবারে পুড়ে গেল। বিন্ধ্যাচলে সাধন করায় সময় গোঁসাইয়ের এই জ্বালার অবস্থা হয়েছিল এবং পরে তিনি তাঁর গুরুর আদেশমত জ্বালামুখী চলে যান এবং ক্রমে এই জ্বালার নিবৃত্তি হয়। সাধনের একটা অবস্থায় এই যে জ্বালা ভুগতে হয়, তার বহিঃপ্রকাশ সাধকভেদে বিভিন্ন হতে পারে।

এ সম্বন্ধে গোঁসাইজী বলেছেন, 'সাধন পথের এ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। এই যন্ত্রণা অগ্নিপরীক্ষা। ইহাতে যত পোড়া খাইবে তত বিশুদ্ধি লাভ হইবে। এ যন্ত্রণা নানারূপে সাধকের হৃদয়কে দগ্ধ করে। প্রকৃতি ও সংস্কার অনুসারে অধিকার করে।

* * *

এ যন্ত্রণায় আমি দুইবার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম। পরম-হংসজী রক্ষা করলেন। অগ্নি জ্বলিত।' সাধক ভেদে কারো মান-সিক যন্ত্রণা ভোগ হয়, কারো দৈহিক, কারো বা সাংসারিক নানা দুর্দৈবের মধ্য দিতে যেতে হয়। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর এই জ্বালা দেহেই বেশি হত বলে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ পড়লে মনে হয়। হরিদাস বসুর দুর্ভোগ প্রধানত তাঁর সংসার ও কর্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই ঘটে-ছিল বলে তিনি প্রকাশ করেছেন। কিরণ নিতান্ত ভাগ্যবান বলতে হবে, কারণ শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম মিশে যাবার সময়টিতে তিনি গোঁসাই-য়ের সাক্ষাতে কাটিয়েছেন এবং সর্বদা তাঁর উপদেশ মত চলতে পেরে অতি অল্প ক্লেশ ভুগে এই দুঃসময়ের কাল কাটিয়ে উঠেছেন। কিরণের পক্ষে এই জ্বালা কামের প্রবল আক্রমণের রূপে প্রকাশ পেয়েছিল বলেই সম্ভবত গোঁসাইজী লতা সাধানের মাধ্যমে তাঁকে এ অবস্থাটি উত্তীর্ণ করে নিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে আর একটা দিক দেখবার আছে। কিরণের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে লতা সাধনের নির্দিষ্ট তিন বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর কাম যেন প্রায় নেই বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। গোঁসাইজী-ও বলেছিলেন যে তিন বছর পর কিরণ একেবারে নতুন মানুষ হয়ে যাবেন। অনুমান করা চলে যে কিরণ ঐ তিন বছর পর কামের উপদ্রব থেকে একেবারে রেহাই পেয়েছিলেন। গোঁসাইজী বলেছেন যে, যখন যে রিপু একেবারে নষ্ট হবার উপক্রম হয় তখন তা খুব প্রবল হয়ে ওঠে, নির্বাণের পূর্বে প্রদীপের মত। ও সময়ে রিপুর উত্তেজনা এতই বৃদ্ধি হয় যে অনেকের সাধন ভজনের উপরও অবিশ্বাস এসে পড়ে। এই সময়টি বড়ই বিষম। সর্বদাই প্রায় উন্মত্তের মত থাকতে হয়। এই সময়ে গুরুদত্ত নাম যদি একেবারে ত্যাগ না করে তাহলে কিছুকালের মধ্যেই সাধক নিরাপদে উত্তীর্ণ হয়ে উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করে। গোঁসাইজীর কৃপায় সাধক কিরণ প্রতি শ্বাসে শ্বাসে নাম হওয়ার দুর্লভ অবস্থা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কাম রিপুর

বিরক্তিকর উত্তেজনার হাত থেকে-ও মুক্তি লাভ করেছিলেন। যুগপৎ এই দুইটি সুন্দর অবস্থা লাভ অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা, সন্দেহ নেই। গোঁসাইজী তাঁর চিহ্নিত দাস কিরণকে যেন হাত ধরে অতি সন্তর্পণে সাধনের এই বন্ধুর পথটুকু পার করে নিরাপদ ভূমিতে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। নিরাপদ ভূমি কী এবং আরও যে সব অভিজ্ঞতার পথে সেখানে পৌঁছাতে হয়েছিল কিরণকে, তা ক্রমে প্রকাশ পাবে।

গোঁসাইজীর পুরীর আশ্রমে কিরণের দৈনন্দিন কর্মসূচী দেখলেই বোঝা যায় যে সাধন জীবনের এই খরস্রোতের অধ্যায়টিতে গোঁসাইজী তাঁকে কী রকম আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ রাতে উঠে শৌচান্তে কিরণ বিধুবাবু, সরলনাথ প্রভৃতির সঙ্গে উষাকীর্তনে যোগ দেন। কীর্তনের পরই কিরণ সমুদ্র স্নানে যান এবং স্নানান্তে সেখানেই প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করেন। পরে সমুদ্রের ধার দিয়ে হেঁটে বালি ভেঙ্গে লোকনাথ দর্শনে যান। লোকনাথ দেব ও পার্বতী মায়ী দর্শনের পর বানর ও কুণ্ডের মাছদের ছোলা ও খই খেতে দিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে জগন্নাথদেবের মন্দিরে এসে পৌঁছান। জগন্নাথ দেব, বিমলা মায়ী ও লক্ষ্মী দেবীর দর্শন অন্তে মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন প্রদক্ষিণ ও স্পর্শ করে কিরণের মন্দিরের নিত্যকর্ম শেষ হয়। কোন কোন দিন ষড়ভুজ মহাপ্রভুও দর্শন হয়। মন্দির থেকে বাসায় এসে চা খান কিরণ। দুপুরে প্রত্যহ জগন্নাথ-বল্লভ বাগানের পুকুরে স্নান করে এসে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা বাসাতেই করেন, পরে পাখাল প্রসাদ পান। দুপুর বেলা গোঁসাইয়ের ঘরে সৎপ্রসঙ্গে বড় আনন্দে কাটে। বিকেলে শৌচান্তে আবার স্নান করেন এবং গোঁসাইজীর সঙ্গে গিয়ে দর্শনাদি করেন। সন্ধ্যাবেলা সায়ং সন্ধ্যা সমাপনান্তে গোঁসাইজীর কাছে সান্ধ্য কীর্তনে যোগদান করেন; ভাগ্য প্রসন্ন হলে কোন কোন দিন গোঁসাইয়ের নৃত্য দর্শন হয়। গোঁসাইজী-ই প্রত্যহ হরির লুট বিতরণ করেন। মহাপ্রসাদ রোজ আসে বিকেল একটা থেকে দুটার মধ্যে;

প্রসাদ এলেই কিরণ তা পেয়ে থাকেন। যদি কোন দিন মহাপ্রসাদ পৌঁছাতে পাঁচটা-ছটা বেজে যায় তবে রাত্রেই কিরণ প্রসাদ গ্রহণ করেন—অন্য কিছু খান না। প্রত্যহ রাত্রে গোঁসাইয়ের ঘরে ঘুমোন কিরণ, মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে চোখ চেয়ে সেই নিবাত নিষ্কম্প জ্যোতির্ময় শ্রীমূর্তি দর্শন করেন, আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন। রুটীনে ঠাসা এই প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা কিরণের, কেমন যেন একঘেয়ে শোনায়—কিন্তু সত্যিই কি তাই? গোঁসাইজীর নির্দেশে এই যে ছক বাঁধা পথে চলা এ গোঁসায়ের কৃপা স্পর্শে অপূর্ব পুলকের আবেশ মাখানো লাগে; প্রতিদিনকেই নতুন দিন বলে মনে হয়, একই কাজ-ও যেন কত নতুন সাজে বিচিত্র হয়ে ওঠে। তবু প্রথম প্রথম কিরণের মন-ও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইত। প্রায় সাত মাইল হাঁটতে হত তাঁর রোজ সকালবেলা, দর্শনাদির জন্য। কয়েকবার শারীরিক ক্লেশের কথা বলে গোঁসাইয়ের কাছে অব্যাহতি পাবার উদ্দেশ্যে গিয়েছেন কিরণ, কিন্তু বলা আর হয়ে ওঠেনি। কিরণ ও ভাব নিয়ে যেতেই গোঁসাইজী ত্রিসন্ধ্যার উপকারিতার কথা বর্ণনা করতে শুরু করতেন, বলতেন, 'নিত্য সমুদ্র স্নান, দর্শন ও ত্রিসন্ধ্যা করে কিরণের কেমন দিব্য চেহারা হয়েছে, দেখ তোমরা।' কিরণের মুখ বন্ধ হয়ে যেত। একদিন মধ্যরাত্রে গোঁসাইজী বললেন তিনি তখখুনি ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে চান। অত রাতে বামুন কোথা পাওয়া যায়, গোঁসাই বললেন 'কিরণ সৎব্রাহ্মণ, সে ত্রিসন্ধ্যা করে, তাকেই ডেকে ভোজন করাও।' তাই করা হল। কিরণ গোঁসাইকে বললেন, 'প্রসাদ দিন।' গোঁসাইজী বললেন, 'তা-ও কি হয়, ব্রাহ্মণকে কি এঁটো দিতে পারি?' খাবার পর কিরণ উচ্ছিষ্ট পরিস্কার করতে চাইলে গোঁসাই বললেন, 'তুমি ব্রাহ্মণ, ভোজন করিয়েছি। তোমাকে এঁটো নিতে দিতে পারি না।' অন্য একজন শিষ্যকে দিয়ে কিরণের এঁটো পরিষ্কার করানো হল। এমনি নানা কৌশলে কিরণের বিদ্রোহী মনকে বশীভূত, অনুগত করে তুললেন গোঁসাইজী; কিরণের

জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যে পথ, সে-পথের উপযোগী করে, নিজের মনোমত করে গড়তে লাগলেন তাঁকে।

শুধু নিত্যকর্মের এই নিগড়েই বাঁধলেন না গোঁসাইজী কিরণকে, সাধনের নানা অনুভব, দর্শন ইত্যাদি ও হতে লাগল তাঁর। ১৩০৫ সালের ২২ আষাঢ় কিরণ স্বপ্নে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দর্শন করলেন। গোঁসাইজী বলতেন, দর্শন দু'প্রকার, মুক্তাবস্থায় দর্শন এবং মুক্তিপথে নিয়ে যাবার জন্য সময় সময় দর্শন দিয়ে থাকেন—সাধকের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যাতে বাড়ে। পথে চলার সময় ভগবান দয়া করে যে দর্শন দেন তাকেই দর্শন বলে। মুক্তাবস্থায় যে দর্শন তা সাধারণত সাধকের ইচ্ছামাত্রই ঘটে থাকে—এ দর্শনকে তাই প্রাপ্তি বলা হয়ে থাকে। সাধক জীবনে দর্শন সাধন পথে চলা-কে অনেক সুগম করে—চলাটা ঠিক হচ্ছে কিনা তার নিশানা-ও মেলে এতে। ২৪ আষাঢ় কিরণ খুব গভীর রাত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়ে রত্নবেদীতে দর্শন করে বড় আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেন। ২৫ আষাঢ় কিরণকে একটি তাঁর মনের মত কাজ দিলেন গোঁসাইজী। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'শ্রীবৃন্দাবন শতক' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের একটি বাংলা তরজমা করেছিলেন গোঁসাইজীর শিষ্য ছোট সতীশ মুখুজ্যে। গোঁসাইজী ঐ বাংলা অনুবাদের কবিতায় রূপ দিতে বললেন কিরণকে। কিরণ ঐ প্রথম দিনেই তিনটি শ্লোকের কবিতা করে গোঁসাইকে শোনালেন, গোঁসাই, 'বেশ হয়েছে' বলে তাঁকে উৎসাহ দিলেন। এই উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে কিরণের কবিপ্রতিভার স্বীকৃতি দিলেন যেন গোঁসাইজী। সাত বছর বয়স থেকে কবিতা লিখছেন কিরণ, তাঁর জীবনের প্রথম রচিত কবিতা ঃ

কাতরে মিনতি করি
শীতল চরণ ধরি'
দুঃখ হর করুণা-নিধান,
পূর্ণ কর মম আশা

দাও শক্তি দাও ভাষা
গাহিবারে তব স্তুতি-গান।

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে তাঁর কবিপ্রতিভায় পরিণত ফসল 'মন্দির' কাব্য গ্রন্থে এটি স্থান পেয়েছে। গোঁসাইজীর উদ্দেশ্যে কবিতা ও গান রচনা করেছেন তিনি গোঁসাইয়ের কাছে সাধন পাবার আগে থেকেই। কিরণের রচিত ভজন ও কীর্তন গান একসময় পূর্ববঙ্গের বাউল-বৈষ্ণবের কণ্ঠে ধ্বনিত হত। এ বিষয়ে তাঁর ভজন গানের সংগ্রহ পুস্তিকা 'গানের খাতা'র ভূমিকায় দরবেশজী ১৩২০ সালে লিখেছেন, 'বহুপূর্বে আমার রচিত সঙ্গীতাবলী পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে গীত হইতে শুনিয়াছিলাম। অনেকেই তৎকালে আগ্রহ সহকারে গানগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন। যখন গানগুলি রচিত ও আদৃত হইয়াছিল, তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প, বালক বলিলেও চলে। * * * কয়েক বৎসর পূর্বে আমি একবার শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাইবার পথে শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে যখন আরত্রিক দর্শন করিয়া বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, তখন দেখিলাম একস্থানে কয়েকটি বাঙ্গালী বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া হরিগুণ গান করিতেছেন। নিকটবর্তী হইয়া শ্রবণ করিলাম, উঁহারা আমারই রচিত একটি সঙ্গীত গান করিতেছেন, সঙ্গীতটি কিন্তু ঠিকমত হইতেছিল না ; স্থানে স্থানে পদ বিকৃত করিয়া তাঁহারা গানের সৌন্দর্য বহু পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, লোকপরম্পরায় বাবাজীরা ঐ গান অবগত হইয়াছেন। তখন মনে হইল, গানগুলি প্রকাশিত হইলে এরূপ দুর্দৈব ঘটিবার সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যাইবে।'

এই জন্যই এ সব গান রচনার বহু বছর পরে সেগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কিরণের গান তাঁর অজ্ঞাতে কীভাবে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হত তার একটি সুন্দর কাহিনী বলেছিলেন তাঁর শিষ্য কলকাতার নন্দকিশোর চাটুজ্যে মশাই। বাংলা ১৩৪২ সাল,

দরবেশজী কলকাতায় এসে ডাঃ প্রভাত ভৌমিকের আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাসায় উঠেছেন। তাঁর শিষ্য ডাঃ কুঞ্জবিহারী গুপ্ত নন্দকিশোরকে বললেন তাঁর চেনাশোনা কোন ভাল গাইয়ে থাকলে যেন দরবেশজীর কাছে নিয়ে আসেন, কারণ সন্ধ্যাবেলা ওঁর কাছে একটু ভজন গান হলে খুব ভাল হয়। নন্দকিশোর নিজে গানবাজনায় খুব পারদর্শী নন, কাজেই গাইয়ে লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুব কম। তবু কুঞ্জ গুপ্তের কথায় তিনি তাঁর চাকুরীজীবনের পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, ভদ্রলোকটি হাওড়ার বিখ্যাত 'নদের নিমাই' কীর্তন সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ভাল গাইতেন। নন্দকিশোরের অনুরোধে তিনি ভজন শোনাতে রাজী হলেন, সালকিয়া থেকে তাঁকে গিয়ে নিয়ে এলেন নন্দকিশোর। সন্ধ্যার পর দরবেশজীর সামনে আসর বসল, গাইয়ে ভদ্রলোক প্রথমেই একটি রামপ্রসাদী সুরের গান ধরলেন,

পুড়ে মলেম বিষয় বিষে,
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে।

ভদ্রলোকের গলা ভাল কিন্তু শুধু তার জন্যই নয় যেন অন্য কোনও কারণে গানটি শুনে দরবেশজী বিশেষ অভিভূত হয়েছেন এটা বোঝা গেল। গানটি শেষ হতেই দরবেশজী প্রকাশ করলেন যে ওটি তাঁরই রচনা। গায়ক ও দরবেশজীর উপস্থিত শিষ্যেরা কেউ-ই জানতেন না যে গানটি তাঁরই রচিত। গায়ক বললেন যে তিনি অন্য লোকের কাছে গানটি শুনে শিখেছেন। বলা বাহুল্য এই অভাবনীয় যোগাযোগের জন্য সেদিন সবাই বেশ খুশী হয়েছিলেন। এ গানটি পরে 'বিজলী সঙ্গীত' বইয়ে স্থান পেয়েছে। গোঁসাইজীর আদেশে রচিত শ্রীবৃন্দাবন শতকের কিরণকৃত কাব্যানুবাদ মূল সংস্কৃত সহ পরে পুস্তকাকার প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ গ্রন্থের ১২৬টি শ্লোকের মধ্যে ৯৬টির কিরণ-কৃত কাব্যরূপ গোঁসাইজী দেহে থাকতেই শুনে অনুমোদন করেন।

আষাঢ় মাসের ৬ তারিখ সমুদ্র স্নান করতে গিয়ে গোঁসাইজীর পায়ে আঘাত লেগে ভেঙ্গে যায়, তিনি এজন্য এতদিন আসনেই ছিলেন, ১২ শ্রাবণ প্রথম বাইরে বেরোলেন। এদিন দুপুর বেলা তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে দর্শনে গেলেন, কিরণ তাঁর অনুগামী হয়ে এদিনই প্রথম গোঁসাইয়ের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করলেন। সচল জগন্নাথের সমক্ষে অচল জগন্নাথ দর্শন—এ দেবদুর্লভ দর্শন যুগযুগান্তরের সুকৃতির ফলে ঘটে থাকে। গুরু-ব্রহ্মের উপস্থিতিতে দারু-ব্রহ্ম বা গোঁসাইয়ের ভাষায় ব্রহ্ম-দারুর দর্শন লাভের সৌভাগ্য লাভ করে কিরণ যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন।

১৩০৫ সালের ১৬ শ্রাবণ, ঝুলন-চতুর্দশী, কিরণের জন্মতিথি। সেদিন রাতে কিরণ যথারীতি জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে দর্শন করতে করতে বিমলা মায়ীর মন্দিরে এলেন, চেয়ে দেখলেন মন্দিরে বিমলা-মায়ীর আসনে মা ঠাকুরাণী যোগমায়া দেবী যেন বসে আছেন। কিরণ দৌড়ে গিয়ে মায়ের পা দু'টি জড়িয়ে ধরলেন। মন্দিরের পাণ্ডারা হৈ হৈ করে কিরণকে ধরে ফেলল, মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহ স্পর্শ করেছেন বলে তাঁকে মারতে উদ্যত হল। কিরণ জটিয়া বাবার আশ্রমের লোক বলে চিনতে পারায় তাঁকে আর মারল না পাণ্ডারা, কিন্তু বিগ্রহের নতুন করে অভিষেক করতে হবে বলে কিরণের পাঁচ সিকা দণ্ড সাব্যস্ত হল। কিরণের কাছে পয়সা ছিল না, একজন পাণ্ডা তাঁর সঙ্গে এলো। কিরণ যোগজীবনজীর কাছ থেকে চেয়ে তাকে পাঁচ সিকা পয়সা দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। ঘটনার কথা শুনে গোঁসাইজী বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'এত অস্থির, ভাব সম্বরণ করতে পার না। কোনো মন্দিরের গর্ভঘরে তুমি আর যেয়ো না।'

সদ্‌গুরু সাধনের সাধকদের পক্ষে এই ধরণের দর্শন ও দর্শন-জনিত ভাবের আবেগ নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু সাধকদের ভিতরটা এই আবেগ সম্বরণ করার মত দৃঢ় যতদিন না হয় ততদিন বেশ সন্তর্পণে চলতে হয়। এই ভাবের বহিঃপ্রকাশ যেমন সাধকের ক্রমোন্নতির

পথে সাময়িক বাধা সৃষ্টি করতে পারে তেমনি আবেগের বশে তাঁর পক্ষে বেসামাল হয়ে এমন আচরণ করতে হতে পারে যাতে অন্যের কাছে উদ্বেগ বা উপদ্রব বলে মনে করার কারণ ঘটে। দরবেশ দর্শনের ১২।৭ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী বলেছেন, 'স্বপ্ন বা জাগ্রত অবস্থায় যে কোনো দর্শনাদি হোক না কেন, অতিশয় প্রিয় ব্যক্তির নিকটও উহা বলিবে না। ঐ বিষয়ে ভয়ানক কৃপণ হইতে হইবে।' দর্শনের পরে ভাব সামলাতে না পারলে সাধকের দর্শনের বিষয় অন্যের জানাজানি হওয়ার স্বতঃই আশঙ্কা থাকে, ফলে ঐ দর্শন তো বন্ধ হয়েই যায়, ভাবগ্রাহী নয় এমন লোকের সংস্পর্শে যে সরস অবস্থার ফলে দর্শনটি সম্ভব হয়, সেই অবস্থা-ও'অন্তত কিছুকালের জন্য হারাতে হয়। তা ছাড়া দর্শন ও দর্শন জনিত ভাব সাধকদের অত্যন্ত আস্বাদ্য বস্তু, সন্দেহ নেই। এই আস্বাদনের লোভে-ও ভাবের পোষকতা করার একটা প্রয়াস সাধকের হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সাধনের যে কোন অবস্থা তা সে যতই আকাঙ্ক্ষণীয় হোক না কেন, তার জন্য আগ্রহ নিয়ে বসে থাকা বা তা লাভের জন্য যে কোন প্রচেষ্টা যে সাধক জীবনে ক্ষতিকর তা দরবেশজী বারংবার বলেছেন। গোঁসাইজী কিরণকে যে ধমক দিলেন তা এই আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে বুঝতে হবে। এই ভাবের আনুকূল্য করে তা সম্বরণের জন্য চেষ্টা না করার জন্য সন্তোষনাথজীকে তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী যে শাসন করেছিলেন সে কাহিনী গোঁসাইজীর সাধনের ইতিহাসে যুগোত্তীর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। সাধন লাভ করার অব্যাবহিত পর থেকে সন্তোষনাথজীর নানা অনুভূতি ও দর্শনাদি হতে লাগল। তিনি সাব্-রেজেষ্ট্রার ছিলেন। অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ গুরুদেবের দর্শন পেয়ে কাজ ছেড়ে বেরিয়ে ঐ দর্শনের পুরুষের পিছনে পিছনে ছুটে চললেন। নিতান্ত বেসামাল অবস্থা। ব্রহ্মচারীজী তখন সশরীরে শ্যামপুরে অর্থাৎ সন্তোষনাথের গ্রামেই আছেন। রাস্তা থেকে ঐ রকম অবস্থায় যখন তাঁকে

ব্রহ্মচারীজীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল তখন ব্রহ্মচারীজী যা বলেছিলেন তা নিত্য স্মরণ করার বিষয়; তিনি বললেন, 'দর্শন আমাদের লক্ষ্য নয়, দীক্ষা কালে ঠাকুর যে উপদেশ দিয়েছেন তা পালন করাই আমাদের লক্ষ্য। ঐ সকল দর্শনের সময় খুব নাম করতে হয়, নামশূন্য অবস্থায় দর্শনে অনেক বিপদ হয়। সর্বদা নামে মগ্ন থাকাই আমাদের কাজ। ঐ সকল দর্শন একটা উচ্চ অবস্থার-ও পরিচায়ক নয়, এতে আকৃষ্ট হলে, এতে আসক্তি জন্মালে বিশেষ অনিষ্ট হয়। আমাদের সাধনে দেব-দেবী দর্শন-ও একটা সিদ্ধ অবস্থা নয়। নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি। দীক্ষা কালের উপদেশ জীবনে পরিণত করাই প্রকৃত সিদ্ধি।' ব্রহ্মচারীজী আরও উপদেশ দিলেন, 'আপনি অফিসের কাজে মনোযোগী হবেন। কীর্তন বা ভাব-উচ্ছ্বাসে মাতামাতি করবেন না। যদি ঐ অবস্থা আসে তবে কিছুদিন কীর্তনাদিতে যোগ না দেওয়া ভাল।' কিন্তু সন্তোষনাথজী নামের আনন্দে ও সাধনের আকর্ষণে গুরুদেবের উপদেশ পুরোপুরি মেনে চলতে যেন পারলেন না, নানারকম অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশ ভাবের তরঙ্গে বেসামাল হয়ে ভেসে যেতে শুরু করলেন, তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য কর্ম করা, অফিস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এ খবর জেনে ব্রহ্মচারীজী কাশীধাম থেকে সন্তোষনাথজীকে লিখলেন, 'ভাবুকতা ধর্ম নয়, উহা ধর্মজীবন লাভের অন্তরায়। মহাপুরুষেরা বলেন, অতিরিক্ত ভগবৎ ভজনেও নাকি তামস জন্মে। তুমি আজকাল কী ভাবে চলিতেছে, কী করিতেছ তাহা একবার ভাবিয়া দেখিও। আমার কথায় যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অবশ্য নিত্য ক্রিয়া সন্ধ্যা, পাঠ ও হোম ব্যতীত আর কিছু করিও না। প্রাণায়াম কুম্ভক একেবারে ছাড়িয়া দাও। দশ কুড়িবার মাত্র নাম করিবে। * * * পত্র পাঠ করিয়া নাম করা ছাড়িয়া দিবে। হাসি, গল্পও কথাবার্তায় সময় কাটাইবে।' পত্র লিখেই ব্রহ্মচারীজী ক্ষান্ত হলেন না, অন্য শক্তি-ও প্রয়োগ করলেন। কারণ সন্তোষনাথজী তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, 'নাম করা

ছাড়িয়া দিবে এই কথাগুলি পাঠ করিতেই নাম আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল।' দশ পনর দিনের মধ্যে তাঁর স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ফিরে এল, তাঁর জীবন যাত্রা সহজ হয়ে গেল। এর মধ্যেই তিনি গুরুদেবের যে দ্বিতীয় পত্রটি পেলেন তার বক্তব্যই বর্তমান আলোচনার সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয়। ব্রহ্মচারীজী লিখলেন, 'যে দুর্লভ অবস্থা লাভ করিয়া তুমি একশত টাকার চাকুরী, পরিবারবর্গের বিষম দুর্ব্যবহার, সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা বিসর্জন করিয়া বসিয়াছিলে, যে আনন্দে মগ্ন থাকায় লোকের গঞ্জনায় অপবাদে উদাসীন হইয়াছিলে সেই পরম স্বার্থ আনন্দ আমার একটি মাত্র কথায় তৃণের মত অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়াছ, ইহাতে আমি মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছি। তুমি আমার আশীর্বাদ পাত্র হইলেও নমস্য। আমাকে তুমি আশীর্বাদ করিও যেন তোমার দৃষ্টান্ত দৃষ্টিতে রাখিয়া গুরুদেবের অনুগত হইতে পারি। * * * এক বেলা প্রাণায়াম করিও, কুম্ভক বেশি করিও না। রুটীন মত চলিবে, নাম আসনে বসিয়া কর ধরিয়া করিও, এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা করিয়া ক্রমে ক্রমে সহাইয়া লইবে। অজ্ঞাতসারে যে নাম হইবে তাহাতে আর বাধা দিবে কিরূপে, তবে চেষ্টা করিয়া বেশি করিও না। সকল দিকেই একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে।' এই সামঞ্জস্য রক্ষা করার কথাই দরবেশজী দরবেশ দর্শনের ১৫।২৮ নম্বর পত্রাংশে বলেছেন, 'এই পৃথিবীতে সমস্ত বিষয়েরই একটা মাত্রা আছে। এমন কি ধর্ম-সাধনারও একটা মাত্রা আছে। গরু যেমন খোটায় পোতা, চারিদিক ঘুরিয়া মনের আনন্দে ঘাস খায়; কিন্তু দড়ি ছিঁড়িয়া দৌড় দিলেই ডাঙ্গসের আঘাত খাইতে হয়। আমরাও যতক্ষণ মাত্রা ঠিক রাখি, ততক্ষণ সবই সুন্দর। মাত্রা ছাড়াইলেই প্রকৃতি দেবী উহার প্রতি-শোধ গ্রহণ করেন।' সাধন ও সাধন-লব্ধ ভাবাবেগ-ও তেমনি সামঞ্জস্য রক্ষা করে না এগোলেই মুস্কিল হয়ে পড়ে, ভাবের উচ্ছ্বাস সাধনের পক্ষেই বিঘ্নকর হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই যত সাবধানতার উপদেশ। তবে আশ্বাসের কথা, গোঁসাইয়ের সাধনে সদ্‌গুরু নিজেই

শিষ্যের এই বিঘ্নশঙ্কুল অবস্থাটি সন্তর্পণে পার করে দিয়ে থাকেন। ব্রহ্মচারীজী যেমন সন্তোষনাথজীর বেলায় করেছিলেন দরবেশজী-ও তেমনটি করতেন। দরবেশ দর্শনের ২০।৬৮ নম্বর পত্রাংশে তিনি অসীমানন্দজী সম্বন্ধে লিখেছেন, 'অন্নদার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইও না, সাধক জীবনের ইহা একটি অবস্থা। প্রথম প্রথম দেহ ভিতরের বেগ ধাবণ করিতে অক্ষম হয় বলিয়াই এরূপ অজ্ঞানতা আসে। * * * তবু তো অন্নদার অনেক অবস্থা চাপিয়া রাখা হইয়াছে ; কারণ তাহার কিছু কর্ম অবশিষ্ট আছে।' এ কথা বলে রাখা দরকার যে এখানে যে ভাবাবেগে কথা আলোচিত হল তা নবীন সাধকের প্রথম দিকের ভাবোচ্ছ্বাসের সম্বন্ধে। সাধকের পরিণত জীবনে যখন শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং সাধক-ও যখন ভাবের উপরে আধিপত্য করার সম্পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন তখন-ও সময় সময় তাঁদের নিতান্ত অনিচ্ছায় সাধনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে কোন বিশেষ ঘটনায় বা পরিস্থিতিতে ভাব বাইরে নানা শারীরিক বিকারের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় কথা পৃথকভাবে বিচার্য। কিরণের উত্তর জীবনে যখন সে অবস্থা এসেছিল সে সময়কার আলোচনা প্রসঙ্গে তা আস্বাদন করার সুযোগ হবে।

ঝুলন চতুর্দশীর দিন কিরণের নিজের জন্মতিথিতে বিমলামায়ীর মন্দিরে ঐ অভিনব দর্শনটি হল, তার পর দিন ১৭ শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমা তিথি গোঁসাইজীর জন্মতিথি তাঁর পুরীর আশ্রমে উপস্থিত শিষ্য শিষ্যারা পালন করলেন। আঠারোই শ্রাবণ এই উপলক্ষে প্রায় এক হাজার কাঙ্গাল, সাধু ও বৈষ্ণবদের খিচুড়ী ও মালপোয়া দিয়ে সেবা করানো হল। সকলে তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করে জটিয়া বাবার জয়ধ্বনিতে চারদিক মুখর করে তুলল। আকাশে খুব মেঘ করেছিল, কিন্তু বৃষ্টি নেমে কারোর ভোজনের কোন বিঘ্ন ঘটাল না। ১৩০৫ সালের ২৩ ও ২৪ শ্রাবণ গোঁসাইজী নির্জনে কিরণকে অনেক আশ্বাস দিলেন। ২৫ শ্রাবণ জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রে গোঁসাইজী কিরণকে স্পষ্ট করে বললেন, 'তোমার

সব ভার ভগবান গ্রহণ করেছেন। তোমা দ্বারা অনেক কাজ হবে। বহু তৃষিত আত্মা তোমার সঙ্গে চরম সার্থকতা লাভ করবে। তুমি ধন্য, কেবল সুসময়ের অপেক্ষা কর।' কিরণের মন প্রাণ এক অতুল আনন্দ-রসে সিক্ত হয়ে গেল। জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব। গোঁসাইজীকে নিয়ে তাঁর শিষ্য ও শিষ্যারা মহোৎসবে মেতে গেলেন, গোঁসাইকে হলুদ মাখানো হল, চান করানো হল। সঙ্গে সঙ্গে নন্দোৎসব-বিহিত গান ও নৃত্য। গোঁসাইজী-ও সকলের এই প্রাণখোলা উল্লাসে সানন্দে যোগ দিলেন।

১৩০৫ সালের ২৮ শ্রাবণ প্রবল জ্বর হল কিরণের, সমস্ত রাত মাথার যন্ত্রণায় কাটল। পরদিনই জ্বর একদম ছেড়ে গেল। কিরণ রাত্রিবেলা গোঁসাইয়ের সঙ্গে গিয়ে জগন্নাথ দেবের কালীয়-দমন বেশ দর্শন করে এলেন। কিন্তু ৩০ শ্রাবণ নিয়মিত স্নানাহারের পর খুব কাঁপুনি সহ খুব জ্বর হল কিরণের। জ্বরটা ম্যালেরিয়া। পয়লা ও দোসরা ভাদ্র জ্বরের ঘোরে প্রায় বেহুঁসের মত পড়ে রইলেন তিনি। তেসরা ভাদ্র গোঁসাইজী কিরণের বিছানা যে ঘরে তার দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখলেন এবং একটা এলোপ্যাথিক ওষুধের **Prescription** মুখে মুখে বলে দিলেন, সারদাকান্ত লিখে নিলেন। সে ওষুধ ডাক্তারখানা থেকে তৈরী করিয়ে আনা হল এবং একদাগ সেদিনই খেলেন কিরণ। পরদিন আর জ্বর হল না। ৬ ভাদ্র কিরণ অন্নপথ্য করলেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগেই বোধহয় কিরণের মনটা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল, মায়ের কথা বড্ড মনে পড়তে লাগল। তাঁর বাড়ি গিয়ে মা-কে দেখবার জন্য একটা যেন অস্থিরতা হল। গোঁসাইজীকে বলায় তিনি ১০ ভাদ্র বেসপতিবার কিরণকে বাড়ি রওনা হতে নির্দেশ দিলেন। পুরো আড়াই মাস নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে গোঁসাইজীর সঙ্গ করবার পর ১০ ভাদ্র পুরীধাম ত্যাগ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তিনি। এবার কিরণের ভ্রমণসঙ্গী তাঁর গুরুভাই বিহারী ঘোষ। পুরী থেকে ট্রেনে বারং পর্যন্ত এসে পায়ে হেঁটে ও নৌকায় মহানদী পেরিয়ে কটকে পৌছলেন

দুজনে। পরদিন ১১ ভাদ্র সকাল নটায় চাঁদবালীতে জাহাজে চেপে সমুদ্রপথে যাত্রা। তিনদিন জাহাজে ও ক্যানেলের ষ্টীমারে কাটিয়ে ১৫ ভাদ্র বেলা বারোটায় কলকাতায় পৌঁছালেন তাঁরা। কিরণ তাঁর মামার কালীঘাটের বাসায় উঠলেন। ১৬ ভাদ্র থেকে ২০ ভাদ্র পর্যন্ত কলকাতায় থেকে ২১ তারিখ রওনা হয়ে ২৩ ভাদ্র খালিয়ায় এসে যাত্রার সমাপ্তি ঘটল।

১৩০৫ সালের ২৬ ভাদ্র কিরণ তাঁর গ্রামের সুবাদে দাদা ও গুরুভাই রেবতীকান্ত রায় মশাইয়ের দ্বিতীয়বার বিয়ে উপলক্ষে বরযাত্রী হয়ে কলকাতা এলেন। বিয়েতে বরপক্ষকে আড়াইশ টাকা পণ দিতে হয়েছিল। ৩১ ভাদ্র রেবতী ও তাঁর নববিবাহিতা পত্নীসহ কিরণ খালিয়ায় ফিরলেন। খালিয়ায় দিনগুলি কোনরকমে কেটে যায়, কিরণ কামের চিন্তায় বড় কাতর বোধ করলেন। এর মধ্যে ১২ আশ্বিন রাত্রে ভাঙ্গ খেয়ে খুব কষ্ট ভোগ করতে হল। মাঝে মাঝে কীর্তনাদি হয় গ্রামের কারো কারো বাড়িতে। কিরণ কীর্তনে যোগ দিয়ে আনন্দ পান। উনিশে অঘ্রান কিরণের বড়বৌদি গোলাপসুন্দরীর কলেরায় মৃত্যু হল, কিরণই মুখাগ্নি করলেন। পরে শ্রাদ্ধ-ও করতে হল তাঁর। সমস্ত পৌষ মাসটা বিভিন্ন জায়গায় কীর্তনে যোগ দিলেন তিনি। বাইরের এই সব কার্তন-উৎসবে আনন্দে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে অথচ মনের অভ্যন্তরে একদিকে যেমন অসহ্য শুষ্কতা অন্যদিকে কামের চিন্তায় অদ্ভুত উদ্বেগ কিরণকে অহরহ পীড়িত করতে থাকে। ১৪ মাঘ সদরদী বিহারী ঘোষদের গ্রামে মহোৎসব হল। ঐদিন ও তার পরদিন অষ্টপ্রহর কীর্তন, জলকেলি ও গুরুভাইদের মধুর সঙ্গে কিরণ অনেকটা সরস ও সতেজ বোধ করে ১৬ তারিখ বাড়ি ফিরে এলেন।

১৩০৫ সালের ৮ ফাল্গুন কিরণের মা চিরজীবনের মত বাড়ি ছেড়ে কাশীবাস করতে রওনা হয়ে গেলেন। কিরণের দাদা মা-কে পৌঁছে দিতে গেলেন। যে মায়ের টানে পুরী থেকে কিরণ চলে এসেছিলেন তাঁর অবর্তমানে বাড়িতে আর যেন মন টেঁকে না। কয়েকদিনের

মধ্যেই কিরণের শুষ্কতা যেন অসহ্য হতে লাগল, কামের উপদ্রব এই শুষ্কতার সুযোগ নিয়ে যেন অদম্য হয়ে উঠল। আত্মবিশ্বাসও অনেকটা যেন হারিয়ে ফেললেন তিনি। ১৯ ফাল্গুন মনের জ্বালায় অধৈর্য হয়ে কিরণ কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে চললেন। একটা চিঠি লিখে রেখে পুরীর পথে মাদারিপুর হয়ে ২১ তারিখ কলকাতা গিয়ে মাখনদের বাসায় উঠলেন। মাখন খালিয়ার চিঠি লিখে জানালেন যে কিরণ পুরী যাবার পথে কলকাতা গিয়ে পেঁ ৗছেছেন।

১৩০৫ সালের ২৩ ফাল্গুন কোলাঘাট থেকে সোজা পুরী পর্যন্ত রেল পথ খোলা হল। এই প্রথম দিনের ট্রেনের অন্যতম যাত্রী হয়ে কিরণ সেদিন রাত্রে কোলাঘাট থেকে পুরী রওনা হলেন। এবার তাঁর সঙ্গী দুইজন গুরুভ্রাতা, প্রিয়নাথ ঘোষ এবং মহেশ দে। ২৪ তারিখ সন্ধ্যায় খুরদা রোডে ট্রেন বদল করতে হল; রাত ১১টায় পুরী পৌছালেন তাঁরা। যেন কত কাল পরে গোঁসাইজীকে দর্শন করে কিরণের মন ভরে উঠল, বিক্ষিপ্ত চিত্ত তাঁর শান্ত হয়ে গেল।

পুরীতে তখন গোঁসাইজীর সেই বৃহৎ দানযজ্ঞ চলছে। এই নতুন লীলায় দর্শক, কখনও বা সেবক হয়ে কিরণ ধন্য মনে করলেন নিজেকে। ২৬ ফাল্গুন গোঁসাইয়ের সঙ্গে সমুদ্র দর্শনে গেলেন কিরণ, পথে অনেক প্রার্থীকে কাপড় দান করা হল। ২৭ তারিখ শিবরাত্রি; গোঁসাইজীর সঙ্গে লোকনাথ দর্শনে গিয়ে গোঁসাইয়ের অবিরাম দান-লীলা দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হন কিরণ। এই দিন থেকে কিরণ তাঁর আগের বারের পুরী বাসের সময়কার দৈনদিন কার্য-সূচী পালন করতে শুরু করলেন। সেই সমুদ্র স্নান, লোকনাথ ও জগন্নাথ দর্শন আবার কিরণের প্রাত্যহিক ভজন তালিকায় এসে গেল। ২৮ ফাল্গুন ও ২৯ ফাল্গুন রীতিমত প্ল্যান করে দুই হাজার ব্রাহ্মণকে বস্ত্র ও মোটা চাদর দান করা হল গোঁসাইজীর নির্দেশে—এজন্য কাগজের টিকেট তৈরী করে তাতে রবার স্ট্যাম্প লাগিয়ে পূর্বাহ্নে

ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। সে এক বৃহৎ ব্যাপার। এমার মঠের প্রশস্ত চত্বরে এই দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল।

২৯ ফাল্গুন রাত্রে আশ্রমে ফিরে গিয়ে কিরণ কলকাতা থেকে পাঠানো মাখনের এক টেলিগ্রাম পেলেন। মাখনের কঠিন বসন্ত রোগ হয়েছে তাই কিরণের অবিলম্বে কলকাতা যাওয়া দরকার। মাখনের আহ্বান, কিরণের পক্ষে না গিয়ে উপায় নেই। অথচ গোঁসাইজীর চরিপাশে পুরীতে প্রবাহিত সেই আনন্দ স্রোত তা ছেড়ে যেতে মন চায় না। কিরণের মনে হল যে তিনি মহা পাপিষ্ঠ—নইলে এমন প্রতিবন্ধক এসে তাঁকে গোঁসাইয়ের সঙ্গচ্যুত করতে চাইছে কেন? পরদিন সকালে পাঠের পর গোঁসাইজীকে মাখনের টেলিগ্রামের কথা বলে কলকাতা যাবার অনুমতি চাইলেন তিনি। গোঁসাইজী বললেন, 'আমি হলে একটা টেলি দিয়ে জেনে নিয়ে তবে যেতুম। হয়ত জল-বসন্ত। তুমি যেতে না যেতে ভাল হয়ে যেতে পারে। কি করতে যাবে। দেখ সংসারের লোকেরা কেমন! সকলে ভাবে তুমি অকর্মণ্য রয়েছ, তাই তোমায় নিয়ে টানাটানি করে।' কিরণ তখখুনি মাখনকে তার করে তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন। পয়লা চৈত্র তারের জবাব এল, মাখনের রোগ জলবসন্ত, প্রায় সেরে এসেছে; কিরণের যাবার কোন দরকার নেই। এই ফাঁড়াটা কেটে গেল কিরণের, গোঁসাইয়ের কাজ ছাড়া হতে হল না তাঁকে। ঠিক এমনি ভাবে কিরণকে আর একবার বাঁচিয়েছিলেন গোঁসাইজী, কিরণের যাতে পুরী ছেড়ে যেতে না হয়। এবারের পুরী ত্যাগের তাগিদ ছিল আরও বেশি জরুরী। ১৩০৫ সালের ৭ চৈত্র কিরণের দাদা খালিয়া থেকে সোজা যোগজীবনজীকে চিঠিতে জানালেন যে কিরণ সাবালক হয়েছে, অনতিবিলম্বে তাঁদের পৈতৃক জমিদারীতে অন্যতম অংশীদার হিসাবে কিরণের নাম পত্তন করবার জন্য দেশের বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন। যোগজীবন কিরণকে বাড়ি যাবার জন্য জোর তাড়া দিলেন, অবশ্যকর্তব্য কর্মে কোন ছুতায় অবহেলা করা অনুচিত

হবে। আর একবার নিজের ছুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন কিরণ। পুররী এই বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এক পাও কোথাও যেতে তাঁর প্রাণ চায় না। ভয়ে গোঁসাইজীকে কিছুই জানালেন না তিনি, পাছে তাঁর নির্দেশে সত্যিই পুরী ছাড়তে হয়। একদিন ছ'দিন করে বেশ কদিন কেটে গেল। কিরণ বাড়ি যাবার কোনই গা করেন না দেখে ১৯ চৈত্র যোগজীবনজী গোঁসাইজীর সামনে কিরণকে অনুযোগ করে বললেন, 'কিরণ, বাড়ি যাচ্ছ না কেন?' গোঁসাইজী জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ি যাবে কেন?' যোগজীবনজী উত্তর দিলেন, 'ওর দাদা যেতে লিখেছেন, জমিদারীতে ওর নাম পত্তন হবে।' গোঁসাইজী বললেন, 'তাতে যেতে হবে কেন? শান্তিপুরের প্রামানিক মশাইকে দেখেছি, বিদেশ থেকে ডিমাই কাগজে নাম দস্তখত করে পাঠালেন, তাতেই কাজ হয়ে গেল।' কিরণ যেন অথৈ সমুদ্রে কূলের নিশানা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে আমি-ও তাই করব?' গোঁসাইজীর সেই আদেশ নয় অথচ নির্দেশের ভাষায় উত্তর হল, 'আমি হলে তাই করতুম।' কিরণ এবারে যেন যথেষ্ট ভরসা পেয়ে জানতে চাইলেন ক'খানা কাগজে সই করে পাঠাতে হবে। গোঁসাইজী বললেন যে খান আঠাশেক কাগজেই কাজ চলবে। কিরণ এবার নির্ভয় হয়ে বুঝতে পারলেন এ যাত্রা-ও তাঁর আর পুরী ছেড়ে যেতে হল না। ২১ চৈত্র কিরণ আঠাশখানা ডেমি কাগজ কিনে আনলেন এবং গোঁসাইজীর আদেশ মত আঠারখানা কাগজে তেরছা ও দশখানায় নীচের দিকে দস্তখত করে দাদার নামে রেজেষ্টারী ডাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বলা বাহুল্য কিরণের ঐ স্বাক্ষর করা কাগজেই নাম পত্তনের কাজ তাঁর অনুপস্থিতিতেই হয়ে গেছল। সবচেয়ে মজার কথা কিরণের কাছ থেকে ঐ সুচিন্তিত ভাবে দস্তখত করা কাগজ পেয়ে তাঁর দাদার ধারণা হল যে কিরণ যথার্থই বৈষয়িক ব্যাপারে বেশ চৌকস হয়ে গেছেন। নাম পত্তনের সময় খাশ তালুক হলে ডেমি কাগজের পাশে

এবং মধ্যসত্ত্ব তালুক হলে ঐ কাগজের নীচের দিকে দস্তখত করা নিয়ম। কিরণের দাদা কিরণকে লিখলেন, 'আমি ভাবছিলাম, তুমি সংসারের কিছুই জান না। আমাদের যে আঠার খানা খাস এবং দশখানা মধ্যসত্ত্ব তালুক আছে এ খবর তুমি রাখ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম।' এই প্রসঙ্গ তুলে দরবেশজী উত্তরকালে বলতেন, 'কার বাহাদুরী, আর কে পায়!' এখানে উল্লিখিত ঘটনা দু'টিতে আর একটা ব্যাপার লক্ষ করলে গোঁসাইজীর একটি অপূর্ব মাহাত্ম্য চোখে পড়ে। এই দু'বারের কোন বারই তিনি জিজ্ঞাসিত হয়ে-ও কিরণকে কোন স্পষ্ট আদেশ করলেন না, প্রতিবারই জানালেন যে তিনি নিজে হলে কী করতেন। দরবেশজী বলতেন যে গোঁসাইজী কখনও এ কর সে কর এরূপ নির্দিষ্ট বাক্যে শিষ্যগণকে হুকুম করতেন না; এমনটি করলে ভাল হয় কিম্বা আমি হলে এরকম করতাম—এই ভাবে নিজের ইচ্ছা ও নির্দেশ ব্যক্ত করতেন।

গোঁসাইজীর সঙ্গ করবার নয়, তাঁর দেহান্ত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করার যে প্রার্থনা কিরণ জানিয়েছিলেন তাঁর প্রাণবল্লভ গুরু সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। বার বার তাঁকে আত্মীয়তার ও বন্ধুতার আহ্বান এবং বিষয়ের পিছু-ডাক থেকে গোঁসাইজী রক্ষা করলেন, নিজের কাছে আগলে রাখলেন। গোঁসাইয়ের স্নেহ-ছায়ায় তাঁর মমতার আবেষ্টনীতে আশ্রয় পেয়ে নির্ভার হয়ে রইলেন কিরণ।

নীলাচলে, গোঁসাই-বিরাজিত শ্রীক্ষেত্রে আনন্দমুখর উৎসবময় দিনগুলি যেন সঙ্গীতের ছন্দে ডানা মেলে উড়ে চলে। কিরণ সমস্ত মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় নিয়ে সেই পুলক-প্রবাহের ধারায় স্নান করেন, কখনও বা ভেসে চলেন। ২ চৈত্র পুরীধামে আসার পর সর্বপ্রথম গোঁসাইজীর নৃত্য দর্শন করে মুগ্ধ হন কিরণ। কোনদিন গোঁসাইজীর অনুগামী হয়ে সমুদ্র দর্শন ঘটে তাঁর, কোনদিন আবার সেই দেবদুর্লভ সঙ্গে জগন্নাথ দেব দর্শন করার সৌভাগ্য জোটে। ১০ চৈত্র গোঁসাইয়ের সঙ্গে গিয়ে সমুদ্র স্নান সেরে নিত্যকর্ম লোকনাথ ও জগন্নাথ দর্শন করে

আসার পথে রাধারমণ চরনদাস বাবাজীর ঝাঝপেটা মঠে গেলেন কিরণ। বাবাজী সস্নেহে কিরণকে লুচি, আলুর ছোকা ও চা খেতে দিলেন, প্রত্যহ যাতে কিরণ ফেরার পথে ওখানে যান সেজন্য সাদর আহ্বান জানালেন বাবাজী। ১৩ চৈত্র গোঁসাইজীর সঙ্গে গিয়ে মণিকোঠার ভিতরে জগন্নাথ দেব দর্শন করলেন কিরণ, ওদিন রাত্রে দোল যাত্রার আগের দিনের 'বুড়ীর ঘর পড়ানো' অনুষ্ঠান দেখতে গেলেন গোঁসাইজী, কিরণ তাঁর সঙ্গে রইলেন। ১৪ চৈত্র দোল উৎসব, গোঁসাইজীর অদ্ভুত লীলা প্রকট হল সেদিন। সকাল থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত কীর্তন ও গোঁসাইজীর অভূতপূর্ব নৃত্য-লীলা, আবীর নিয়ে ছড়াতে লাগলেন তিনি চতুর্দিকে। পুরীর বাজারে ক্রমে সেদিন আর আবীর রইল না। গোঁসাইজীর এমন ভাব আর কোনদিন দেখেন নি কিরণ, হোলি উৎসবের সমস্ত উল্লাস ও মাধুর্য যেন গোঁসাইয়ের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল সেদিন।

১৫ চৈত্র ভোরে সমুদ্র স্নানের পর কিরণ গোঁসাইজীর সঙ্গে লোকনাথ দর্শনে গেলেন। সেদিন রাত্রে গোঁসাইজী প্রকাশ করলেন যে জগন্নাথ দেব তাঁকে সাধুদের ভাণ্ডারা দিতে আদেশ করেছেন। ভাণ্ডারার জন্য আয়োজন আরম্ভ হল। অবিরাম, অনর্গল দান করে চলেছেন গোঁসাইজী ; পুরীর মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখে যাচ্ছে। ১৬ চৈত্র রাত্রিতে গোঁসাইজীর ঘরে এক প্রেতের চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায় কিরণের। গোঁসাইজী বললেন ঐ প্রেত টাকার লোভে একজন অতিথি ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছিল, এখন মুক্তির জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এসেছিল। ১৭ তারিখ কিরণ হরিদাসের সমাধি, কবীর, নানক ও বিদুরের মঠ দর্শন করে এলেন।

রাধারমণ চরণ দাস বাবাজীর ওখানে মাঝে মাঝে যান কিরণ। সকালবেলা লোকনাথ দর্শন করে দীর্ঘপথের ক্লান্তিতে ওখানে কিরণ বিশ্রাম-ও পান, প্রভাতী চায়ের আকর্ষণ-ও নেহাত কম নয়। বাবাজী কিরণকে অনেক কথা বলেন, কথা প্রসঙ্গে গোঁসাইজীর সম্বন্ধে-ও কখনও

কটাক্ষ করেন। ১৮ চৈত্র কিরণ এমনি চরণদাস বাবাজীর কাছে এসে বসেছেন, বাবাজী কেন যেন অবিরাম গোঁসাইজীর নিন্দা করে কথা বলতে শুরু করলেন। আগে থেকেই কিরণের মেজাজ খারাপ হয়েছিল, আজ তিনি আর আত্মসম্বরন করতে পারলেন না। বাবাজীর আশ্রমে বসে তাঁর শিষ্য মণ্ডলীর মাঝখানেই তিনি বাবাজীর গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন, বৃদ্ধ বাবাজীর দাঁত ভেঙ্গে গিয়ে রক্তপাত হল। হয়ত কিরণের গুরুভক্তি যাচাই করবার উদ্দেশ্যেই তাঁর উপস্থিতিতে গোঁসাই-জীর উপর কটাক্ষ করতেন বাবাজী, কিন্তু তার পরিণতি যে এতদূর গড়াতে পারে তা হয়ত তাঁর ভাবনায় আসে নি। বাবাজীর আদেশেই কিরণের উপর কেউ মারমুখো হয়ে উঠতে পারল না সেখানে, অক্ষত-ই বেরিয়ে এলেন তিনি। পরে নরেন্দ্রের পাড়ে গিয়ে কিরণ একা একা কাঁদলেন, যথেষ্ট আত্মশোচনা হল তাঁর ঐ হঠকারিতার জন্য। ওদিন বিকেলে চরণদাস বাবাজী গোঁসাইজীর কছে এসে কিরণের আচরণের কথা জানালেন। গোঁসাইজী তখখুনি ডেকে পাঠালেন কিরণকে। সারদাকান্ত কিরণকে ডাকতে এলেন, কিন্তু যোগজীবন তাঁকে যেতে দিলেন না। গোঁসাইজী কি কঠোর শাসন করেন, সে জন্য সকলের ভয় হল। বাবাজী বিদায় নিতে কিরণ ভয়ে ভয়ে গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন; গোঁসাইজী বললেন, 'এখনই গিয়ে চরণদাসের পা ধরে ক্ষমা চাও।' কিরণ বলবেন, 'তা আমি পারব না।' কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলে-ও কিরণ জানেন যে গুরুনিন্দা শুনে নিন্দুকের প্রতি যে ব্যবহার তিনি করেছেন তা এমন কিছু গর্হিত নয় যে সেজন্য ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু গোঁসাইজী কিরণকে রেহাই দিতে রাজী হলেন না। কিরণের উত্তর শুনে তিনি বললেন, 'তবে আমি গিয়ে তোমার হয়ে বাবাজী পা ধরে ক্ষমা চাই'—এই বলে তিনি দণ্ড নিয়ে উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করতেই কিরণের প্রাণে বড় লাগল। তাঁর হয়ে গোঁসাইজী ক্ষমা চাইতে যাবেন—এ তিনি কী করে হতে দেবেন! কিরণ তখখুনি দৌড়ে গিয়ে রাস্তায় চরণদাস বাবাজীকে ধরে ফেলে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন।

বাবাজী তাল সামলাতে না পেরে রাস্তায় পড়ে গেলেন, ভাবলেন কিরণ বুঝি তাঁকে আবার মারতে গেছেন। কিরণ ক্ষমা চাইতে ও গোঁসাইয়ের আদেশের কথা জানাতে বাবাজী সব বুঝতে পেরে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন কিরণকে। ধন্য সাধু চরণদাস বাবাজী, ধন্য গোঁসাইয়ের চ্যালা কিরণচন্দ্র !

গুরুদত্ত মালা তিলকাদির সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করায় কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী একবার মানিকতলায় মাতাজীকে যথেষ্ট তিরস্কার করেছিলেন। তেমনি একবার শ্রীধর বারদীর ব্রহ্মচারীজীকে গোঁসাই সম্বন্ধে অসমীচীন উক্তি করার জন্য গালাগাল পর্যন্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে গোঁসাইজীর উপদেশ হল, 'সকলের নিকটেই যথেষ্ট বিনয়ী হবে। * * * গুরুদত্ত বস্তুর উপর, সাধন ভজনের উপর কেহ অবজ্ঞা করলে গুরুনিষ্ঠা কেউ নষ্ট করার চেষ্টা করলে সে স্থলে বজ্রের ন্যায় কঠোর হতে হয়, তার প্রতিবিধান করতে হয়। আর তা নইলে ব্যবহার সর্বদাই পুষ্পের মত কোমল হবে—এই-ই ঋষিবাক্য।'

সেই বিরাট সাধুভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হল ১৩০৫ সালের ২০ চৈত্র। চার সম্প্রদায়ের চার হাজার সাধুকে ভোজন করানো হল গোঁসাইজীর আদেশে; প্রত্যেককে একখানা করে কাপড় ও একটা করে লোটা দান করা হল। অন্য সকলের সঙ্গে কিরণও খুব খাটলেন সারাদিন-রাত, এ বড় আনন্দের খাটুনি। পুরীধামে গোঁসাইজীর যে দানলীলা প্রকটিত হয়েছিল তার সম্যক তাৎপর্যের বিবরণ তেমন করে যেন, কেউ-ই দেন নি। দান করা একটি সৎ কাজ বা পুণ্যের কাজ এবং সেজন্য গোঁসাইজী দানের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন—এ কথা ভাবলে ব্যাপারটাকে বড় খেলো করা হয়। দান করা একটি সদনুষ্ঠান বটে কিন্তু তা ভগবৎ ভক্তের পক্ষে প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ ভক্তগণের ভজনের অঙ্গ হিসাবে দান কার্য অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত হয় না। গোঁসাইজী নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কলিতে নাম ও দান। যাঁহারা ধর্ম-অর্থাদির অনুষ্ঠান করবেন দানই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সাধন।

যাঁহারা ভগবানের আরাধনা করবেন তাঁদের কেবলমাত্র নাম।"
গোঁসাইজী তাই নিজের পুণ্যের জন্য কিংবা তাঁর অনুগত জনের শিক্ষার জন্য দান-লীলার আয়োজন করেছিলেন—এ ব্যাখ্যায় মন কিছুতেই সায় দিতে চায় না। পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তির যিনি ভাণ্ডারী, যাঁর শিষ্যগণ সকলেই পঞ্চম পুরুষার্থকেই লক্ষ্য বলে জানেন ও চলেন তিনি চতুর্বর্গ-অভিলাষীর সাধ্য দান অনুষ্ঠান নিয়ে এই প্রায়-অবিশ্বাস্য লীলার অবতারণা করবেন, এ নিতান্তই বহিরঙ্গ ভাবের বিচার। এ লীলায় অবশ্যই কোন গূঢ় তাৎপর্য আছে। ১৩০৫ সালের ২৫ চৈত্র অযোধ্যার মহাত্মা মাধোদাসের শিষ্য নারায়ণদাস গোঁসাইজীর কাছে এসে দশটা টাকা ভিক্ষে চেয়ে নিয়ে গেলেন। এই নারায়ণ দাস ও মাধোদাসের কথা শ্রীশ্রীসদগুরু সঙ্গের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত আছে। নারায়ণ দাস টাকা নিয়ে চলে চলে যেতে গোঁসাইজী কিরণ ও উপস্থিত অন্য শিষ্যদের বললেন যে নারায়ণ দাস ক্রোড়পতি, কেন যে ভিক্ষে চেয়ে নিলেন তা তিনিই জানেন। সরলনাথের এ কথা শুনে কৌতুহল হল, তিনি নারায়ণদাসকে ধরে তাঁর আচরণের কারণ জানলেন। রাতে সরলনাথ কিরণকে জানালেন যে নারাণয়দাস বলেছেন, গোঁসাইজী এই দানের ভিতর দিয়ে সকলকে জগন্নাথের কৃপা বিতরণ করেছেন, যে এ দান পাবে তার বড় ভাগ্য। নারায়ণদাসের-ও তাই লোভ হয়েছিল। নারায়ণ দাসের এই উক্তিটির মধ্যেই গোঁসাইয়ের পুরীর দানলীলার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। এ সবার জানা আছে যে মহাপ্রভু তাঁর প্রকট লীলায় উচ্চৈঃস্বরে নামগান করতেন, তাঁর সেই নাম স্থাবর অস্থাবর যে সমস্ত প্রাণীর শ্রুতিগোচর হয়েছিল তারাই গোঁসাইজীর প্রকট লীলায় তাঁর কাছ থেকে সদগুরু সাধন পাবার উপযুক্ত হয়ে জন্মে তাঁর প্রত্যক্ষ কৃপা লাভ করেছিল। তেমনি গোঁসাইজী তাঁর প্রকট লীলায় যাঁদের কৃপা করতে চেয়েও সম্যক উপযুক্ততার অভাবের জন্য নিজে তৎক্ষণাৎ কৃপা করতে পারেন নি এই দান লীলার মাধ্যমে তিনি

তাদের পরোক্ষ ভাবে মহাপ্রভুর নাম শোনাবার মতই কৃপা করে গেলেন। এই ভাগ্যবানেরা জন্মান্তরে সদগুরু সাধনের উপযুক্ত আধার হয়ে এই সাধন পেয়েছেন, পাচ্ছেন ও পাবেন।

১৩০৫ সালের ৩০ চৈত্র কিরণের নীলাচল বাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় তিথি, মনে হয় কিরণের সমস্ত সাধন জীবনেরও এটি একটি তাৎপর্যময় দিন। এদিন রাত্রে গোঁসাইজী কিরণকে জানালেন যে তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করাবেন, যেভাবে তাঁর ইচ্ছা কিরণকে সে ভাবে তৈরী করে নেবেন। পূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে যে এদিনের পর কাম নিয়ে কিরণের আর অভিযোগ করার কারণ ঘটেনি। কিরণকে যেন এদিন গোঁসাইজী একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলেছিলেন, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?' যথার্থই এ যাবত কিরণের গোঁসাইয়ের উপর বিশ্বাস বলতে যা বোঝায় তা হয়নি কারণ সাধন জীবনে যে অবস্থায় বিশ্বাস আসে সে অবস্থাটিতে কিরণ এখন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন নি। গোঁসাইজীকে এতদিন কিরণ অবশ্যই শ্রদ্ধা করেছেন, ভক্তি করেছেন, তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন কিন্তু বিশ্বাস জন্মে নি কিরণের গোঁসাইয়ের উপরে। গোঁসাইজী বলেছেন, সংশয় বা অবিশ্বাস আত্মার একটা অবস্থা। একমাত্র নাম দ্বারা সংশয় নষ্ট হয়। সাধন পথে চলতে চলতে একটু একটু করে শ্রদ্ধা বাড়ে, অনুরাগ বাড়ে ইষ্টে এবং গুরুতে ভালবাসা ও টান-ও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় কিন্তু বিশ্বাস এই রকম ধাপে ধাপে অর্জনের সামগ্রী নয়। সাধনার একটা পরিণত অবস্থায় হঠাৎ বিশ্বাস লাভ হয়ে যায়—এ বিশ্বাসের কম বেশি বা বাড়া-কমা নেই। বিশ্বাস আত্মার একটি পূর্ণ ও অবিভাজ্য অবস্থা। গোঁসাই-জীর বাক্য এই যে, 'গুরুতে বিশ্বাস হইলেই ধর্মলাভ হয়, কিন্তু উহা সহজে হয় না। বিশ্বাস হইবার একমাত্র পথ এই যে, গুরু যাহা উপদেশ দেন তাহা আচরণ করা। আচরণ করিতে করিতে হৃদয়ের বিকাশ হইলেই বিশ্বাস হইবে।' স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সাধনের রাজ্যে বিশ্বাস একটি কৃপা-লব্ধ অবস্থা-এ অবস্থা লাভ-ই করা যায়, সাধন দ্বারা অর্জন করা যায়

না। সদগুরু সাধনে বিশ্বাস ঠিক ঠিক কখন লাভ হয় সাধকের, এ সম্বন্ধে পুরুলিয়া, রামচন্দ্রপুরের পদ্মনাভ চক্রবর্তী (দরবেশজীর শিষ্য) বলেছিলেন যে বি-শ্বাস অর্থাৎ শ্বাস জয় হয় যে অবস্থায় তখনই বিশ্বাস জন্মে। অজপা সাধনে প্রত্যেক শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামটি গেঁথে গেলেই শ্বাস জয় হয়ে যায়, এ অবস্থায় পৌঁছাবার আগে পর্যন্ত গুরুতে প্রকৃত বিশ্বাস হয় না। বলা বাহুল্য ১৩০৫ সালের ৩০ চৈত্রের আগে কিরণের প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হওয়ার অবস্থা হয় নি; গোঁসাজীর প্রতি বাক্যে বিশ্বাস-ও তাঁর সত্যিকারের অর্থে তখন-ও জন্মায় নি। এই প্রসঙ্গে কিরণের ১৩০৫ সালের ২ আষাঢ় তারিখের লেখা একটি চিঠির মর্ম অনুধাবন করা যেতে পারে। চিঠিখানি পুরীধামে গোঁসাইজীর আশ্রমে বাস করার সময় কিরণ তাঁর স্বগ্রামবাসী গুরুভ্রাতা রেবতীকান্ত রায় চৌধুরীকে লিখেছিলেন। ঐ পত্রে গোঁসাইজীর প্রকটলীলার একটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা-অন্তে কিরণ লিখেছেন, "গোঁসাইয়ের লীলাখেলা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। কিন্তু এমন পাজী মন যে ইহাতে-ও খাঁটি বিশ্বাস আসিতেছে না। আমাকে আপনি আশীর্বাদ করিবেন।' তবে এই ঘটনার অল্পকাল পরেই কিরণের ঐ অবস্থা লাভ হয়েছিল, এর আভাষ প্রসঙ্গক্রমে আগেই পাওয়া গেছে, পরের আলোচনায় আরও বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হবে।

১৩০৬ সাল শুরু হল, পুরীধামে গোঁসাইজীর প্রকট লীলার শেষ অঙ্ক সমাপ্তপ্রায়। কিরণ সদ্গুরু ভগবানের নরলীলার এই অন্তিম অধ্যায়ে প্রায় ছায়ার মত তাঁর পার্শ্বচর হয়ে আছেন, চোখ মেলে দর্শন করছেন আর নিজেকে তাঁর প্রিয়ের মনোমত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, আপনাকে প্রিয়তমের প্রিয় করে তুলতে চাইছেন। চৌঠা বৈশাখ গোঁসাইজী তাঁর এবারকার লীলায় সাক্ষাতভাবে শেষ বারের মত সাধন দিলেন, এদিন রাত একটায় কালিঘাটের অবিনাশ বাড়ুজ্যের সাধন হল। ১০ বৈশাখ গোঁসাইজী কিরণকে তাঁর সংসার

ও পরিবারের প্রসঙ্গে অনেক কথা বললেন ; শেষটায় এই ভবিষ্যৎ বাণী করলেন, 'তুমি ফকীর হবে, কিন্তু বড়মানষের মত চাল বজায় থাকবে। তখন যদি অনাসক্ত ভাবে চলতে পার, তবেই পাড়ি দিলে, আর ভাবনা থাকবে না।' কিরণ কাতরভাবে বললেন, 'আমায় তো আপনি রক্ষা করবেন-ই, আমায় তো আপনি একটু-ও বিপথে চলতে দেবেন না। তবে আর আমার ভয় কী ?' গোঁসাইজী হেসে স্নেহপূর্ণ নয়নে কিরণের দিকে তাকালেন ; কিরণ তাঁর প্রশ্নের জবাব পেলেন, বড়ই ভরসা পেলেন। ১১ বৈশাখ রাত্রে কথাপ্রসঙ্গে কিরণ জিজ্ঞেস করলেন গোঁসাইজীকে, 'ঠাকুর দর্শনে আনন্দ হয় না কেন ?' গোঁসাইজী বললেন, 'পূর্ব পূর্ব জন্মের অপরাধের জন্য আনন্দ হতে বঞ্চিত হতে হয়। ক্রমে এই সব কেটে গিয়ে ধামের মহিমা বোঝা যায়। তীর্থে রিপুর উত্তেজনা-ও বাড়ে। পাপ পুরুষেরা পাপে মগ্ন করতে চেষ্টা করে, পরে ষোলকলা পূর্ণ হলে ছেড়ে যায়।' ১২ বৈশাখ বেশ একটা মজার কিন্তু তৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল। গোঁসাইজীর শিষ্য কিরণদের গ্রামের রেবতীকান্ত রায় গোঁসাইজীর হস্তরেখা দেখলেন। গোঁসাইজী জিজ্ঞেস করলেন, 'বলতে পার, পূর্বজন্মে আমি কী ছিলাম ?' রেবতী বললেন 'গোয়ালা ছিলেন।' মহেন্দ্র মিত্র গোঁসাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক বলেছে তো ?' গোঁসাইজী সহাস্যে উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ, বলেছে। তবে ঠিক আগের জন্মের কথা বলতে পারে নি, তার আগের জন্মের কথা বলেছে।' হাস্য কৌতুকের মধ্যে এই হাত দেখা পর্বটি ঘটলেও গোঁসাইজী এরই মধ্যে আত্মপরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। গোঁসাইজী সদ্‌গুরুরূপে স্বয়ং অবতরী ছিলেন অর্থাৎ তিনি ভগবানের কোন অবতার ছিলেন না, নিজেই ভগবান ছিলেন। তাঁর আগে ভগবান স্বয়ং এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যরূপে এবং ঠিক তার আগে দ্বাপরযুগে কৃষ্ণরূপে, গোয়ালার ঘরে।

এ সময়টাতে কিরণের সাধন বেশ চড়া গ্রামে বাঁধা হয়েছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৫ বৈশাখের একটি ঘটনা থেকে। এদিন

রাত দু'টা পর্যন্ত তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে সাধনে রত ছিলেন, জগন্নাথদেব সেদিন তাঁকে বড়ই কৃপা করেছিলেন, এ কথা কিরণ তাঁর রোজনামচায় উল্লেখ করেছেন। ১৬ বৈশাখ একটা অভিনব ঘটনা ঘটল। কদিন আগে ১১ বৈশাখ গোঁসাইজী পাপপুরুষের আক্রমণ ও অত্যাচার সম্বন্ধে কিরণকে সতর্ক করেছিলেন। ১৬ তারিখ রাত্রে ঘুমের মধ্যে কিরণ অনুভব করলেন, কে যেন তাঁকে চেপে ধরেছে। এ অবস্থায় কিরণের অবিরাম নাম হচ্ছিল কিন্তু তবু যে চেপে ধরেছে সে তাঁকে ছাড়ছে না, হঠাৎ কিরণ জোর করে উঠে বসলেন এবং কাছে উপবিষ্ট গোঁসাইজীকে ঘটনাটা খুলে বললেন। গোঁসাইজী বললেন, 'পাপপুরুষ তোমাকে অধিকার করার চেষ্টা করছে। পাপপুরুষ যখন দেখে যে এ ব্যক্তি আমাদের হস্তচ্যুত হয়ে যাচ্ছে তখন এরূপ করে। তোমার লতা সাধন, সমুদ্র স্নান, ত্রিসন্ধ্যা, প্রত্যহ লোকনাথ দেব ও জগন্নাথ দেব দর্শন—এ সবের জন্য পাপ আর তোমার মধ্যে তিষ্ঠোতে পারছে না। তাই ওদের শেষ চেষ্টা হচ্ছে। কোন ভয় নেই।' গোঁসাইজী পুরীতে নিজের পাশে পাশে কিরণকে রেখে ত্রিসন্ধ্যা, দেব-দর্শন, লতা সাধন ইত্যাদি বিবিধ ভজনাঙ্গের মাধ্যমে কিরণের সাধন জীবনের একটা দুরধিগম্য পথ যে কত অল্পায়াসে এবং কত অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিয়ে দিলেন, গোঁসাইজীর এই কথার মধ্যে তা নিঃসংশয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয় পাপ পুরুষদের এই আক্রমণ-ই তাঁদের শেষ প্রচেষ্টা হয়েছিল কিরণকে অধিকারে রাখার। এর পরেই কিরণের সাধন ভজন অনেক নির্বিঘ্ন ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল।

সাধকের জীবনে এই পাপপুরুষের আক্রমণ ও সাধককে নিজেদের অধিকারে রেখে তাঁর উন্নতির পথে বাধা জন্মানোর চেষ্টার কথা প্রায় প্রত্যেক ধর্মপ্রণালীর সাধকদের মুখেই শোনা যায়। কেউ একে শয়তানের অত্যাচার বলে থাকেন, বৌদ্ধেরা একেই মার বলে বর্ণনা করেছেন। এই পাপপুরুষের অত্যাচার নানা ভাবে বিভিন্ন

সাধকের জীবনে ঘটে থাকে। সদ্‌গুরু সাধনে সাধকের এ অবস্থা গুরুকৃপাতেই অতিক্রম হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে দরবেশজীর শিষ্য ডাঃ নীরদবরণ বর্মণ (নারায়ণদাসজী) তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। কলকাতায় ডাক্তারী করার সময় নীরদ একবার অদ্ভুত এক মানসিক ও স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হন। সাধন করতে আসনে বসলেই কে যেন ঠেলে ফেলে দিতে চাইত। একা একা কোন ঘরে থাকতে ভয় পেতেন, একাকী কোথাও যেতে পারতেন না। রোগীর বাড়ি যেতে হলে একজন সঙ্গী দরকার হত। আহার প্রায় বন্ধ, রাত্রে ঘুম আসে না। মানসিক অবসাদ, কোন কিছুই ভাল লাগে না, সংসার এমন কি সমস্ত পরিজনদের উপর বিতৃষ্ণা এসে গেল নীরদের। দীর্ঘ কয়েক মাস এই রকম উৎকট অবস্থায় থেকে তিনি প্রায় অচল অকেজো হয়ে গেলেন। রোজগার কমে গেল, সংসার আর চলে না।. নীরদের বাবা জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়ে জানলেন যে বৃহস্পতি গ্রহের কোপের জন্যই এই অবস্থা। দরবেশজীকে কাশীতে এ কথা লিখে জানাতে তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমার বাবাকে বলতে পার যে তোমার বৃহস্পতি-গুরু প্রসন্নই আছেন, তাঁর কোপ শান্তির জন্য কিছু করার দরকার নেই।' পরে তিনি আবার লিখলেন যে নীরদ যদি শীঘ্র রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে চান তবে যেন সংসার ফেলে রেখে অন্তত দু'মাসের জন্য কাশীতে তাঁর কাছে চলে যান। নীরদ কাশীতে যেতে-ও ভয় পান, কলকাতায় তাঁর গুরুভায়েরা অনেকটা জোরজবরদস্তি করে তাঁকে কাশীতে দরবেশজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দরবেশজী নীরদের নিত্য গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা দিলেন এবং আশ্রমের বাইরে যেতে হলে সর্বদা আর একজনকে পাহারা দেবার জন্য সঙ্গে দিতেন। কিন্তু অসুস্থতা কমে না, আশ্রমে কেউ হাসলেও নীরদের মনে হয় লোকগুলো হাসে কী করে! আতপ চালের অন্ন খাওয়া ও মাছ না খাওয়া নীরদের প্রতি দরবেশজীর নির্দেশ ছিল। নীরদ

দরবেশজীকে বললেন যে এই সাধনের জন্য তিনি এই ভোগ ভুগছেন, মাছ মাংস না খেলে দেহে যথেষ্ট প্রোটীন জোটে না বলেই এই শারীরিক অসুস্থতা। নীরদ জেদ ধরলেন যে তিনি মাছ খাবেন। দরবেশজী সহানুভূতি করে বললেন, 'বাবা আশ্রমে তো মাছের ব্যবস্থা চলবে না। কলকাতা ফিরে গিয়ে বরং মাছ খেয়ো।' কলকাতায় অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস্ করার সময়েতেই দরবেশজীর আদেশে নীরদ একটু একটু হোমিও চিকিৎসা আয়ত্ত করতে শুরু করেছিলেন। এবার আশ্রমে আসার পর দরবেশজী তাঁকে ডাঃ বোরিকের মেটেরিয়া মেডিকা পড়তে দিলেন, নীরদ মাঝে মাঝে বইখানা পড়তে চেষ্টা করেন। একদিন হঠাৎ দরবেশজী জিজ্ঞেস করলেন, 'মেটেরিয়া মেডিকা থেকে তোমার নিজের অসুখের লক্ষণ মিলিয়ে কী ওষুধ তোমার উপযোগী মনে হয়?' নীরদ জবাব দিলেন, 'এসিড্ ফস্'। হেসে দরবেশজী বললেন, 'ঠিক, তোমার ওষুধ তুমি নিজেই বের করেছ। ঐ ওষুধ ২০০ এক ডোজ খাও।' এইবার চিকিৎসা শুরু হল এবং নীরদ ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে এগিয়ে চললেন, দু'মাসের মাথায় যখন তিনি কলকাতা ফিরলেন তখন সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও পুরোনো কষ্টকর উপসর্গের অনেকটাই উপশম হয়েছিল। এই সময়েই দরবেশজী নীরদকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর এই উৎকট শারীরিক ও মানসিক ভোগ পাপ পুরুষের আক্রমণের জন্যই ঘটেছিল এবং কাশীতে তখন না এলে এত সহজে তিনি ঐ ভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন না। তিনি আরও বলেছিলেন যে নীরদকে অমন ম্রিয়মান অবস্থায় দেখে তিনি গোঁসাইজীকে বলেছিলেন, 'আর কেন, এবার ছেলেটিকে রেহাই দিলেই হয়।' গোঁসাইজী তাই এত অল্পে নীরদকে বাঁচিয়ে দিলেন। পাপ-পুরুষের আক্রমণে যে দৈহিক ও মানসিক বিকার আসে তা প্রারব্ধ জনিত ভোগ নয়, সাধন জনিত একটা উপরি অবস্থা। সাধন দ্বারা মোকাবিলা হতে পারে কিন্তু সাধারণত সাধন ধরে থাকাই এ সময় প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। গুরু-ই এ সময় সাধককে রক্ষা করে

থাকেন, পুরুষকারে এ অবস্থায় কোন বিশেষ সাহায্য হয় না।

আবার কিরণের পুরী-ধামের অধ্যায়ের ঘটনাবলীতে ফিরে আসা যাক। ১৩০৬ সালের ১৭ বৈশাখ রেবতী রায়ের সঙ্গে কিরণের জোর বচসা হয়েছিল, ১৮ তারিখ রেবতী গোঁসাইয়ের কাছে কিরণের নামে নালিশ করলেন। রাত্রে শুতে যাবার সময় গোঁসাইজী কিরণকে বললেন, 'রেবতী তোমায় অন্যায় বলেছে, তবু তোমার তাকে কটুকথা বলা উচিত হয়নি কারণ সে তোমাকে যথার্থই ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসে। তুমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ো।' কিরণ তখখুনি বিছানা থেকে উঠে গিয়ে রেবতীর কাছে ক্ষমা চাইলেন, রেবতী মহা খুশী। ১৯ বৈশাখ কিরণ ব্রজনাথ ও অমৃতলালের সঙ্গে সিদ্ধ মহাবীর ও চক্রতীর্থ দর্শন করলেন, চক্রতীর্থে স্নান-ও হল। ২২ বৈশাখ রাত্রে গোঁসাইজী কিরণকে খুব অভয় দিলে এবং বিশেষ ভাবে আশীর্বাদ করলেন। গোঁসাইজীর দেহ ক্রমশ অসুস্থ হচ্ছে, সবাই খুব উদ্বিগ্ন। ২৪ বৈশাখ গোঁসাইজী সমস্ত দিন আসনে অজ্ঞানের মত পড়ে রইলেন, তাঁর অণ্ডকোষ খুব ফুলে লাল হয়েছে। ২৬ বৈশাখ আবার গোঁসাইয়ের জ্বর, দেহ অসুস্থ। এদিন রাত্রে গোঁসাইজীর অন্য সকলের সঙ্গে একত্রে আহার করতে বসলেন, কিরণ এমনটি আর কখনো দেখেননি। ২৮ বৈশাখ রাত্রে গোঁসাইজীর সঙ্গে সরোজবালাকে নিয়ে অনেক কথা হল কিরণের, গোঁসাই সরোজবালার অনেক প্রশংসা করলেন।

১৩০৬ সালের ৩১ বৈশাখ গোঁসাইজী তাঁকে বিষ প্রয়োগের কথা প্রকাশ করে বললেন সকলকে। জানালেন যে ২৪ বৈশাখ যেদিন তিনি অসুস্থ হয়ে আচ্ছন্নের মত পড়েছিলেন সেদিন দুপুরে একটি লোক এসে মহাপ্রসাদের নাম করে একটি বিষ মেশানো লাড্ডু দেয়। মহাপ্রসাদ, এখনই খান, এ কথা বলায় গোঁসাইজী সেই বিষের লাড্ডু খেয়েছেন। সেই থেকে গোঁসাইয়ের শরীর খারাপ হয়ে চলেছে। গোঁসাইজী আরও প্রকাশ করলেন যে তিনি পুরীতে থাকলে পশার নষ্ট হয় বলে পুরীবাসী এক সাধু এ বিষ দেবার ব্যবস্থা করেছে, অন্য

অনেক লোক-ও এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আছে। গোঁসাইজী বিষের কথা জেনে-ও ঐ লাড্ডু খেয়েছেন শুনে কিরণ ও অন্য সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

পুরীর উৎসবময় আশ্রমে গোঁসাইজীর উপর বিষ প্রয়োগ ও তাঁর অসুস্থতার জন্য যেন নিরানন্দের মেঘ নেমে এল। তবু যেন কেউ তখনো ধারণা করতে পারেন নি যে আরও দুর্দিন সামনেই এগিয়ে আসছে। গোঁসাইজী-ও নিত্যকার জীবনযাত্রায় কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখান না। পয়লা জ্যৈষ্ঠ বরানগর থেকে আগত একজন কথক ঠাকুর গোঁসাইজীর সামনে 'রুক্মিণী হরণ' প্রসঙ্গ কথকতা করলেন, গোঁসাইজী তাঁকে অনেক অর্থ ও বস্ত্রাদি দান করলেন। ২ জ্যৈষ্ঠ কিরণ চন্দন যাত্রা দর্শন করে এলেন। ৫ জ্যৈষ্ঠ গোঁসাইজীর স্পর্শ লাভ করে কৃতার্থ বোধ করলেন তিনি। গোঁসাইজীর দেহ ওদিকে ক্রমশই অসুস্থ হয়ে পড়ছে, কলকাতা তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কথাবার্তা ও আয়োজন করা হচ্ছে। ১৭ জ্যৈষ্ঠ শিষ্য উগ্রকণ্ঠ সাহা গোঁসাইজীকে পাখার হাওয়া করছিলেন; গোঁসাইজী, 'উঃ, জ্বলে গেল' বলে তাঁকে ধমক দিলেন; পরে বললেন, 'যে-সে বাতাস দিলে সইতে পারি না। ব্রহ্মচারী অমৃত কিরণ সারদা ও ব্রজ—এদের বাতাস দেয়া ভাল লাগে।' ১৯ জ্যৈষ্ঠ রাত্রে কিরণ যখন গোঁসাইজীকে হাওয়া করছিলেন তখন তিনি বললেন, 'তোমার বাতাস দেওয়া খুব ভাল লাগে।' কিরণ নিজেকে ধন্য মনে করলেন। শারীরিক সেবা-কে গুরুর তৃপ্তিকর করার একটি সঙ্কেত আছে, নামের সঙ্গে মিলিয়ে সেবা করলে গুরু কেন, যে কেউ অবশ্যই তৃপ্তি পেয়ে থাকেন। এই সঙ্কেত না জানার জন্যই অনেক আন্তরিক ও আয়াসসাধ্য সেবা-ও সেব্যের রুচিকর ও হৃদয়গ্রাহী হয় না। এই জন্যই দরবেশজী দরবেশ দর্শনের ৮।৭ নম্বর পত্রাংশে বলেছেন, 'শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিতে পারাই যথার্থ গুরুসেবা। গুরু সেবার অবস্থা না আসিলে সেবা করা যায় না।' দরবেশজী দেহে থাকার সময় যে বিশেষ কোন শিষ্য বা শিষ্যার সেবা

বা শারীরিক পরিচর্যা গ্রহণ করতেন তার জন্য তিনি ঐ নাম করার গুণ দেখেই সেবক বেছে নিতেন। প্রতিভাময়ী ঘোষের পরিচর্যা দরবেশজী অনেক গ্রহণ করেছেন। দরবেশ দর্শনের ২০।২৮ পত্রাংশে তিনি প্রতিভাময়ীকে লিখেছেন, 'তুই ও শচী এই দুইটাই আমার যথার্থ মেয়ে। তোমাদের কাছে আমি যেমন ধরা দিয়াছি ; এমন আর কাহারও কাছে নয়। তোরা কাছে না থাকিলে আমার খাইয়া পেট ভরে না।' কেন তিনি প্রতিভার কাছে এত আরাম পেতেন তার উত্তর-ও প্রসঙ্গান্তরে দরবেশ দর্শনের ১০।৩৬ নম্বর পত্রাংশে দেয়া আছে, 'মনে হয়, তুই আমাকে আগের মত ভালবাসিস না। নাম যেন স্মরণে থাকে—সহস্র কার্যের মধ্যে-ও নামকে মনে করিও। নহিলে আমি দাঁড়াইব কোথায় ?' স্বামী যোগানন্দজী দীর্ঘকাল দরবেশজীর সঙ্গে থেকে তাঁর সেবা করেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে দরবেশজীর যে কোন কাজ করার সময় এমন কি তাঁর বহির্বাস ধোরার সময়-ও তিনি নাম করতেন বা তাঁর নাম হত। এতে একদিকে তাঁর সেবা যেমন দরবেশজীর রুচিকর হত, অন্যদিকে সেবার সময় পরিশ্রম জনিত কোন ক্লান্তি বা অবসাদ তাঁর বোধ হোত না। দরবেশজীর সেবা গ্রহণের ব্যাপারে আপাতদৃষ্টিতে এই রকম পক্ষপাত করার জন্য তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কারোর কারোর অভিমান যে না হত না তা নয়, কিন্তু কী কারণে তিনি এ রকমটি করতে বাধ্য হতেন তা জানতে না চাওয়ার জন্যই তাঁরা কষ্ট পেতেন।

১৩০৬ সালের ২১ জ্যৈষ্ঠ পুরীতে গোঁসাইজী দানযজ্ঞের উপলক্ষে যে বিরাট ঋণ হয়েছিল তা পুরোপুরি শোধ হয়ে গেল। গোঁসাইজী বললেন, 'এবার আমার যাবার সময় হয়েছে।' পরদিন ২২ জ্যৈষ্ঠ পুরী থেকে ফেরার জন্য হোর মিলার কোম্পানীর জাহাজ ভাড়া হিসাবে ষোলশ টাকা যোগজীবনজী মণি মজুমদার মশাইকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। গোঁসাইকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা আসার সব ব্যবস্থা

পাকা হয়ে গেল। কিন্তু ঐদিন রাত ৯টা ২০ মিনিটের সময় গোঁসাইজী তাঁর এবারের মর্ত্যলীলা সংবরণ করলেন। ২৩ জ্যৈষ্ঠ তারিখের রোজ নামচায় কিরণ লিখছেন, 'কিছুই কিছু নয়। আমার ঠাকুর! আমার দেবতা! আমার প্রাণেশ্বর! তুমি কোথায়? নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর পাড় খরিদ করা হইল। সমাধি প্রস্তুত হইল। সাতশত টাকায় প্রকাণ্ড স্থান খরিদ। পরে ঠাকুরের দেহ শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া গিয়া বৈকাল ৫টায় সমাধি দেয়া হইল। সব ফুরাইল! আর কি মিলিবে না? ঠাকুর, প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম! জয় শ্রীশ্রীগুরুদেব! জয় সদ্‌গুরু মহারাজ!'

না, কিরণের বিচ্ছেদ-বেদনার বাণী গদ্যময় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না, তাই তিনি গানের মধ্যে তাঁর প্রাণের আকুতিকে রূপ দিতে চাইলেন; লিখলেন,

এস, সুন্দর মম নয়নানন্দ নন্দন-ফুলহার।
প্রাণ, রহে কি না রহে, তোমার বিরহে
দেখে যাও একবার।
বিরহ-ব্যথিত মরম জড়ায়ে
তোমার পরশ দেহ গো ছড়ায়ে,
হের, চমকিয়া চাই দু'বাহু বাড়ায়ে,
ঝরে আঁখি অনিবার।

এযে শুধু গানই নয়, অনেক স্মৃতির রসে, বেদনার অশ্রুতে ভেজানো মর্মবাণী, পরিণত জীবনেও কিরণের মনে এতে দোলা লেগেছে। দরবেশজীর কাশীর আশ্রমে তাঁর শিষ্য সুগায়ক কামাখ্যা মজুমদার একদিন এ গানটি সুর করে গাইছিলেন, কানে যেতেই দরবেশজী যেন আহত বোধ করে একটু রূঢ় স্বরেই বললেন, 'তোর কি গুরু ঠাকুর মরে গেছেন, যে ও গান গাইছ?' এ গানটা দরবেশজীর মনে বিরহ জাগিয়ে দিত। সততযুক্ত পুরুষের, যুক্ত-যোগীর-ও বিরহ? হ্যাঁ, তা হয় বৈ কি!

আম দরবার

যতদিন গোঁসাইজী দেহে ছিলেন, কিরণের একটা একটা নিরাপদ আশ্রয় ছিল, যেখানে যে অবস্থায়-ই থাকুন না কেন হাত বাড়ালেই একটা নিশ্চিত অবলম্বন পাওয়া যাবে এ বোধে তিনি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। গুরুদেবের দরবার বিশাল ও বিস্তৃত, সেখানকার অসংখ্য উজ্জ্বল সভাসদদের মধ্যে কিরণের উপস্থিতি অন্যের চোখে পড়ার মত না হলেও কিরণের কাছে সেই দরবারে তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট ছোট্ট কোনটুকুই নিরাপত্তার এক মস্ত দুর্গ হয়ে গেছল যেন ; আর যথার্থ অনুগতের কাছে সহস্র পরিজন বেষ্টিত হয়ে থাকলেও গুরু এককভাবেই দৃষ্টিতে ধরা দেন, প্রত্যেকের জন্যই একার হয়ে বিরাজ করেন। এই আশ্রয় থেকে চ্যুত হয়ে, সাময়িক ভাবে হলেও কিরণের চোখে যেন অন্ধকার নেমে এল। তত্ত্বের ভাষায় গুরু কখনো মরেন না, গুরুর মরদেহ চোখের আড়াল হলেই তিনি অদৃশ্য বা অপ্রাপ্য হয়ে যান না। কিন্তু অনুগতের কাছে, প্রেমিকের কাছে গুরুর মরদেহটা-ও কিছু অকিঞ্চৎকর নয়, মরদেহের জন্য যে টান তাতে মায়া মেশানো বলেই সে অসত্য নয়, অসুন্দর-ও নয়। কিরণের কাছে অভাব বোধটা তাই দ্বিগুণ হয়ে বাজল, একদিকে নিরাশ্রয়তার ভাবের বিহ্বলতা, অন্যদিকে এতদিনকার দেখা সেই বরতনুর অদর্শন জনিত শোক ; হ্যাঁ, নিতান্ত মায়িক শোক !

অথচ কিরণ এখন বড় হয়েছেন, একা একা চলতে পারেন এবারে, হাতের নাগালের মধ্যে সেই আশ্রয় নেই জেনেও চলতে পারবেন। দেহী গুরুর দরবারের বাইরে বিশ্বরূপী গুরুর যে অনন্ত উদার গণ্ডীহীন আচ্ছাদনহীন বিশাল দরবার সাজানো আছে সেই অপরিচিত দরবারে কিরণের এবার বিচরণের সময় এসেছে। অপরিচিত মনে হলেও

সে দরবারে-ও কিরণ নেহাত আগন্তুক নন, সেখানকার সভাসদেরা অনেকেই অচেনা হলেও তাদের সঙ্গে মিলেমিশে এবার চলতে হবে কিরণকে, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনটি খুঁজে নিতে হবে তাঁকে। এ যাবত কিরণ চলেছেন প্রত্যক্ষ কৃপার স্রোতে গা ভাসিয়ে। যে টুকু পুরুষকার ছিল তা সেই কৃপারই অভিব্যক্তি। এখনকার যেটুকু পথ তা দৃশ্যত পুরুষকারের পথ, বেশি অন্ধকার মনে হলে পরোক্ষ কৃপার আলোর ঝলকানি মাঝে মাঝে পাওয়া যাবে হয়ত, ক্লান্তি ও অবসাদ অসহ লাগলে কখনো কখনো কৃপার হাওয়া এসে তাজা করে দিয়ে যাবে, এ পর্যন্ত। 'পুরুষকার ও কৃপা—এ দুইটি একই রাস্তার দুই অংশ। প্রথমটি পার না হইয়া দ্বিতীয়টি কখনও পাইবে না।' দরবেশ দর্শনের ৬।৮৩ নম্বর পত্রাংশে এই বাণী পরিণত সাধক দরবেশজীর। কিন্তু এ অনেক পরের কথা, কিরণের এখনকার নিরাশ্রয় নির্বান্ধব আম-দরবারের পথে যাত্রার এই তো সবে শুরু।

১৩০৬ সালের ২৩ জ্যৈষ্ঠ গোঁসাইজীর সমাধি প্রবেশ, ১৮ জ্যৈষ্ঠ কিরণচন্দ্র পুরীধাম ত্যাগ করে যাত্রা করলেন, সঙ্গী রেবতী মোহন সেন, রেবতী রায়, উগ্র পোদ্দার ও প্রিয়নাথ ঘোষ। তিনি লিখছেন, 'পুরীতে যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে' তিনি রওনা হলেন। যথাসর্বস্ব বিসর্জন দেবার মত তাঁর মনের ভাব হলে-ও তিনি মোটেই নিঃস্ব হয়ে যান নি, গোঁসাইজী তাঁকে খালি হাতে একা একা চলার পথে ছেড়ে দেন নি। ইতোমধ্যেই কিরণ সাধক জীবনের নিরাপদ ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নামটি গাঁথা হয়ে গেছে তাঁর, এ খবর আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই প্রকাশ পেয়েছে। এই শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম মিশে যাওয়া কী ব্যাপার, সদ্‌গুরু সাধনে নিরাপদ ভূমি-ই বা কী এবং কেন—এ সম্পর্কে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য, অনুভবে না এলে এ সব তত্ত্বের বহিরঙ্গ আলোচনার মূল্য খুব বেশি নয়; আর যাঁর এ তত্ত্ব বোধ হয়েছে তিনি সঙ্গত কারণেই এ নিয়ে আলোচনার নামতে চান না। তবে আভাসে ইঙ্গিতে কখনো সখনো

এই রহস্যময় বস্তু-ও মহাজনদের কথায় বা আচরণে বুদ্ধির সীমানার মধ্যে অস্পষ্ট হলেও ধরা পড়ে যায়, এ প্রসঙ্গের ভিত্তি সেইসব মহাজন বাক্য।

অনেকেরই জানা আছে যে গোঁসাইজীর প্রদত্ত সাধন মার্গের প্রধান কথাই হল নাম-জপ এবং সেই জপ শ্বাসে প্রশ্বাসে করতে হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসই নামের জপমালা—আলাদা মালা বা মালায় সংখ্যা রাখার প্রয়োজন হয় না এই সাধনে। এই সাধনকে বলা হয় অজপা সাধন। জপের মালা বা সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই সেই অর্থে অজপা। আবার এর চাইতেও গূঢ়তর অর্থে অজপা বিশেষণটি খাটে। জপ করা বললেই একটা প্রয়াস বা প্রচেষ্টার কথা আসে। কিন্তু গোঁসাইজী বলেছেন যে এই সাধনে গুরুদত্ত নানটি অনন্তকাল ধরে আপনা আপনি সাধকের ভিতরে চলতে থাকে। অথচ সাধক যখন নিজের আয়াসে ও ইচ্ছায় নাম স্মরণ করেন তখন ভিতরের স্বতোৎসারিত নামই স্মরণ করতে বা ধরতে চেষ্টা করেন। প্রচলিত অর্থে এ সাধনে তাই জপ করা নেই; জপ সর্বক্ষণ চলতেই থাকে, অনুষ্ঠানের সময় এই জপকে অনুভব করার চেষ্টা হয় মাত্র। এই অর্থেই অজপা সাধন কথাটির স্বরূপ বোঝা যায়।

নাম জপ করার নানা রকম প্রণালী আছে; হাতের করে, আলাদা মালার সাহায্যে, উচ্চৈস্বরে কীর্তন করে ইত্যাদি। শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ করাও তেমনি একটা প্রণালী বা টেকনিক। গোঁসাইজী এই টেকনিকের আবিষ্কর্তা নন, তিনি নিজে তাঁর গুরুদেবের কাছে এই প্রণালী পেয়েছিলেন। তাঁর গুরুদেব নানকপন্থী সাধু ছিলেন, সদগুরু অবতার গুরু নানক যে আচরণের সাধন দিতেন তাতে এই শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করার নিয়ম ছিল, গ্রন্থ সাহেবের প্রায় পাতায় পাতায় এ তথ্য পাওয়া যাবে। শিখ ধর্ম সাধনার ধর্ম না থেকে সামাজিক ধর্মে পর্যবসিত হওয়ার পর এই প্রণালী শিখদের মধ্যে লুপ্ত হয়েছে বলা যায়, পুরানো নামক পন্থী সাধু ও যোগীদর ভিতরে কিছু

কিছু সাধকদের মধ্যে অজপা সাধনের প্রণালী প্রচলিত আছে। গোঁসাইজী দীক্ষা লাভের পূর্বেই এই সাধনের কথা মহাত্মা গম্ভীরনাথজীর মুখে শুনেছিলেন বলে প্রকাশ করেছেন। এই অজপা সাধনের টেকনিক দীর্ঘদিন পরে গোঁসাইজীই সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছেন। গোঁসাইয়ের সাধনের বাইরের অনেকে এই শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করার প্রণালীর কথা জানেন কিন্তু গুরু পরম্পরায় শিক্ষণীয় এর বিশেষ কৌশলটি জানেন না। সাধনের বাইরের লোকের কাছে এটা প্রকাশ করাও সমীচীন নয়, গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। দরবেশজীর শিষ্য স্বামী প্রনবানন্দজী একটি ভক্ত মহিলার অনুরোধে দেরাদুনে বসে এই কৌশলটি বলে বুঝিয়ে দেন। তাঁর এই আচরণ দরবেশজীর কর্ণগোচর হলে তিনি বেশ কটু ভাষায় প্রণানন্দজীকে তিরস্কার করেছিলেন।

গোঁসাইজীর সাধনে জপের যে নাম দেয়া হয়ে থাকে সেই নামে বিশিষ্ট শক্তি সমন্বয় করে দেয়া হয়, তা ছাড়া সাধন প্রদান করার সময় সাধন-প্রার্থীর দেহে-ও শক্তি সঞ্চয় করা হয়ে থাকে যাতে ঐ শক্তি সমন্বিত নাম ধারণের যোগ্য হয় সাধকের দেহ। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করার কৌশলটি তখন শেখানো হয় ঠিকই কিন্তু সকলেই ও কৌশলটি তৎক্ষণাৎ আয়ত্ত করতে পারেন না। ঠিকমত ঐ কৌশলটি দখলে আনা একদিকে সাধকের আয়াস সাধ্য অন্যদিকে গুরুর কৃপালভ্য। অধিকাংশ সাধকের অবশ্য অনেকটা অনায়াসেই শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করার পদ্ধতিটি আয়ত্তে এসে যায়, এজন্য ও ব্যাপারটিতে কৃপালব্ধ তা অনুধাবন করার কোন সুযোগ আসে না। অথচ গোঁসাইজী বলেছেন, 'শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করা খুবই শক্ত, সন্দেহ নাই। প্রথম প্রথম নাম খুব শুষ্কই বোধ হয়। আমাকে যখন গুরুদেব শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করতে বললেন, কিছুদিন চেষ্টা করেই আমার ভয়ানক বিরক্তি বোধ হতে লাগল। * * * অনেক সময় নাম করতে এত শুষ্কতা বোধ হত যে বৃথা নাম করছি মনে করে ছেড়ে দিতে

ইচ্ছে হত।' দরবেশ দর্শনের ৩।১৭ ও ৩।৪৭ নম্বর পত্রাংশের বক্তব্য থেকেও বোঝা যায় সাধন পাবার পরেও কারোর কারোর শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করার টেকনিক রপ্ত করতেই যথেষ্ট সময় ও উত্তম লাগে। কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে সাধনের বাইরের কোন কৌতুহলী ধর্মার্থী যদি এই কৌশলটি জানতেও পারেন, তাঁর পক্ষে যে অনায়াসে বা আদৌ এই প্রক্রিয়াটি আয়ত্ত করা সম্ভব হবে এমন নয়। গুরুকৃপাতেই শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা সাধকের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। দরবেশ দর্শনের ৬।১১৬ নম্বর পত্রাংশে তাই বলা হয়েছে, 'নামের কৃপা না হইলে শ্বাসে-প্রশ্বাসে ঠিক নাম হয় না; চেষ্টা দ্বারা দুই পাঁচ মিনিট চালানো যাইতে পারে—একথা সত্য।' এই সাধনে নামটি নিজেই শক্তিপূত—সুতরাং নাম শ্বাসে-প্রশ্বাসে যদি না-ও হয় তবেই যে সব মাটি হয়ে গেল তা নয়। দরবেশ দর্শনের ৩।২ এবং ৬।৪ নম্বর পত্রাংশে এ সম্বন্ধে দরবেশজী ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে সাধকের সর্বদা ঐ পদ্ধতিটি ধরে থাকতে হয় কারণ সাধন জীবনের লক্ষ্যই হল শ্বাস-প্রশ্বাসে সঙ্গে নামটি ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে একেবারে মিলিয়ে দেয়া, প্রণালীর অনুসরণ সেই অভ্যাস যোগের অবলম্বন।

এই শ্বাস প্রশ্বাস ধরে নাম করা অর্থাৎ নামের স্মরণ বা ধ্যান করতে করতে শারীরিক নানা পরিবর্তন ঘটে। মনে রাখা দরকার যে এই অজপা সাধনে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনটাই কাজে লাগে না, ইন্দ্রিয়ের রাজা মনই এই সাধনের প্রথম দিককার বান্ধব বটে, কিন্তু ক্রমশ মনের কার্যকারিতা-ও কমে আসে। সাধকের লক্ষ্য যেন প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসেই নাম স্মরণ হয়। সুস্থ দেহে প্রতি মিনিটে পনর বার শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ হয়; সাধারণ হিসাবে তাই চব্বিশ ঘণ্টায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা বের করে অজপা সাধনের মধ্যে-ও একটা সংখ্যা নিরূপণের ব্যবস্থা দেখা যায়। শ্রীশ্রীবিজয় মঙ্গল গ্রন্থে ঠাকুর বরদাকান্ত 'নাম' এর অধ্যায়ে এ রকম হিসেব দিয়েছেন, কিন্তু

এটি বেশ বিভ্রান্তিকর। অজপা সাধনের টেক্‌নিক্‌টি আয়ত্ত হয়ে আসতেই সাধক দেখতে পান যে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যাই ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। গোঁসাইজীর শিষ্য জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত মশাই তাঁর অজপা সাধন পুস্তিকায় বলেছেন, 'সিদ্ধ মন্ত্র প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জপ করা আয়ত্ত হইলে প্রতি মিনিটে ৫ হইতে ১০ বার মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য নির্বাহ হইয়া থাকে।' এই উক্তিটি অনেকাংশে যথার্থ অবস্থার নির্দেশ করে। কিন্তু মনে হয় মিনিটে পাঁচবারের চাইতে-ও কম বার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হওয়া এ সাধনের পথিকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। প্রথমত, প্রাণায়ামের রেচকের কুম্ভক রপ্ত হয়ে গেলে এবং কুম্ভকের অবস্থায় পাঁচ-ছয়বার নাম করতে পারলে মিনিটে মোটামুটি দুইটির বেশি শ্বাস-প্রশ্বাস হয় না। কুম্ভকে বারোবার নাম হলে মিনিটে মাত্র একবার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ঘটে। আবার পূরকের কুম্ভকে অনবরত নাম চলতে থাকলে একটি শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার অবসরে বত্রিশ এমন কি চৌষট্টি নাম-ও হওয়া সম্ভব। কুম্ভক রীতিমাফিক না করলেও নেহাত শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করতে করতে কুম্ভকের ক্রিয়া স্বতঃই হতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা-ও ক্রমশ কমতে থাকে। গোঁসাইজী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীকে বলেছিলেন, 'স্বাভাবিক কুম্ভক করে সর্বদা নাম করবে। ধীরে ধীরে প্রতি দমে কুম্ভকের সঙ্গে নাম করতে পারলে, এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকার পাবে।' এই প্রতি দমে স্বাভাবিক কুম্ভক করার ব্যাপারটা সাধকদের কেউই বিস্তৃত করে বলেন নি। না বলার কারণ যাই হোক, এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে নিয়মমাফিক কুম্ভকের চেষ্টাকৃত প্রক্রিয়া ছাড়া-ও একটা স্বাভাবিক কুম্ভকের ব্যবস্থা আছে এবং তাতে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা আরও কমে যায়। অতএব অজপা সাধকের পক্ষে নামের যেমন সংখ্যা রাখতে নেই তেমনি শ্বাস-প্রশ্বাসের যে সংখ্যা শরীর বিজ্ঞানে নির্দিষ্ট সেই সংখ্যায় হিসাব ধরেও নামের সংখ্যা গণনা করা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। এই শ্বাস-প্রশ্বাস ধরে নাম করতে

করতে সাধকের শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা কমতে কমতে শারীর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটা অস্বাভাবিক শারীরিক বিবর্তন ঘটতে থাকে। দরবেশজী তাঁর শিষ্য উত্তরপাড়ার ডাঃ জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীকে তাই একবার বলেছিলেন, 'তুমি ডাক্তার, এই সাধনে মানুষের শরীরের কী কী পরিবর্তন ঘটে তা তুমি বুঝতে চেষ্টা করো।' শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গের চতুর্থ খণ্ডে একেবারে শেষের অধ্যায়ে ব্রহ্মচারীজী অনেকটা সঙ্কেতে এই তথ্যটির আভাস দিয়েছেন এইভাবে, 'শ্বাসে-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিতে গেলেও ধ্যানের চরমাবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস-ই নাম, নাম-ই শ্বাস-প্রশ্বাস এইরূপ অনুভূতি জন্মে। তখন নামে কোনও অর্থবোধ-ও জন্মায় না, কোনও রূপের সংস্কারও জাগায় না। স্বভাব হইতে নাম আপনা আপনি হয়, আমি নিশ্চেষ্ট দর্শকের ন্যায় তাহার অনুভব মাত্র করিতে থাকি। এ অবস্থা বাক্য-ভাষায় আর কিছুই প্রকাশ করা যায় না। আর্য ঋষিরা ইহাকেই 'অবাঙমনসগোচর' বলিয়াছেন।' দরবেশ দর্শনের ৬।১১৩ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী লিখেছেন, 'এখন কেবল যাহাতে শ্বাসে প্রশ্বাসে নামটি মিলিয়া যায়, শ্বাস ব্যতীত নামের পৃথক আর কোন অস্তিত্ব না থাকে তাহারই চেষ্টা দেখ।' আবার ৬।১০১ নম্বর পত্রাংশে বলেছেন, 'বাহিরের এ শ্বাস কিছুই নয়, নাভির নীচ হইতে যে স্রোত আসে উহাই যথার্থ নামের পথ। ঐটি ধরিবার জন্যই বাহিরের শ্বাসকে অবলম্বন করিতে হয়। বাহিরের শ্বাসের সঙ্গে ঐ ভিতরের শ্বাস আসিলে আর বাহিরের যোগ রাখিতে চেষ্টা অনাবশ্যক।' আরও যেন একটু বিশদ করে বলা হয়েছে ৬।৪১ নম্বর পত্রাংশে, 'ইহার পর প্রকৃত শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত যখন নাম হইতে থাকিবে তখন ঐ বাহিরের শ্বাস ছুটিয়া যাইবে এবং শ্বাসের টানে দেহেরও কোন তরঙ্গ থাকিবে না।' দরবেশ দর্শনের ৩।৩২ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী এই প্রসঙ্গের প্রায় চরম তথ্য বিবৃত করেছেন, 'এই ব্রতকালে নাম মন্ত্রটি যদি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে বাঁধিয়া ফেলিতে পার, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস মরিয়া গিয়া

যদি নামরূপে নবজন্ম গ্রহণ করে তবেই ধন্য ও কৃতার্থ হইবে, জীবনের সকল অবস্থার মধ্যেই আনন্দের সন্ধান পাইবে।' অজপা সাধকের তাই প্রথম অবলম্বনীয় দৈহিক শ্বাস-প্রশ্বাস নামের পরিচর্যা করতে করতে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং নামরূপে নতুন এবং অভিনব সাজে আত্মপ্রকাশ করে। শরীরের যে প্রয়োজনে শ্বাস-প্রশ্বাসের দরকার, সেই প্রয়োজন তখন নাম দ্বারাই মেটে এবং বাইরের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড মূলক যে শ্বাস-প্রশ্বাস তার কোন প্রকাশ জৈবিক নিয়মে যদি তখন ঘটেও নাম ছাড়া নিছক বায়ুর সঞ্চরণ রূপে তা সম্ভব হয় না। এঅবস্থায় নামও শুধু ধ্যানের বিষয় অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাকট্ কিছু থাকে না, তার একট স্থূল বস্তুসত্তায় রূপান্তর ঘটে। পূর্বে যে নাম পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আয়ত্তের বাইরে ছিল তা এখন সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়কে দখলে এনে পঞ্চ তন্মাত্রের আস্বাদন করায় সাধককে।

অজপা সাধনে প্রত্যেক শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামটি গেঁথে ফেলাই সাধকের সাধ্য। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হওয়া এবং প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হওয়ার চরম অবস্থা এক জিনিষ নয়। প্রথমটি সাধন, দ্বিতীয়টি সাধ্য। সাধ্য মানে এই নয় যে সাধকের সাধনের জোরে সাধ্য লাভ হবে, ও অবস্থা লাভ নিতান্তই গুরু কৃপা সাপেক্ষ, তবে ঐটিই লক্ষ্য এবং এই অর্থেই সাধ্য। আগেই বলা হয়েছে যে কিরণ তাঁর সাধন পাওয়ার পাওয়ার তিন বছর পরে হঠাৎ ঐ অবস্থাটি লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রত্যেক শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম গাঁথা হয়ে গিয়েছিল, অথবা তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস নামময় হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থাটি কেমন এবং এই অবস্থা ঘটলে সাধকের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও অধ্যাত্মিক কী পরিবর্তন ঘটে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। গোঁসাইজী তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, 'যেদিন চব্বিশ ঘণ্টায় একটি শ্বাস-প্রশ্বাস বৃথা না হইয়া নাম চলিবে সেই দিনই সিদ্ধিলাভ হইবে। আমার বলা উচিত নয় কিন্তু কিন্তু তথাপি বলিতেছি—আমি সাধন পাইয়াছি পর তিন

বৎসর এইরূপ শ্বাস প্রশ্বাসে নাম ঠিক হইয়াছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন ঠিক হইয়া যায়।' দরবেশজী তাঁর দেহত্যাগের মাত্র কদিন আগে ১৩৫৩ সালে ৭ আষাঢ় বলেছেন, 'তোমারা শ্বাসে শ্বাসে নাম করবে। যার তা হয়েছে সেই ত রাজা। আমায় তিনবছর পর হয়েছিল। তখন খুব সাধন ভজন করতাম! পাশে মুড়ি থাকত, ক্ষিধে হলে খেতাম। একদিন রাত প্রায় একটার সময় হঠাৎ দেখি যেন কী হয়েছে। দেখি শ্বাসের সঙ্গে নাম মিলে গেছে। শ্বাসের হ্রস্ব দীর্ঘ আছে, নামেরও আছে। উহা মিল হওয়া চাই। শোয়াসা শোয়াসা সিমরহু সিমরহু।' এরই কদিন আগে তিনি অন্য প্রসঙ্গে বলে ছিলেন, 'আমার ভাবনা নেই। আমি রাজার ছেলে, আমি সর্বজিৎ। যে শ্বাসকে জয় করেছে সে-ই সর্বজিৎ।' এই যে সিদ্ধিলাভের কথা বলেছেন গোঁসাইজী এতে কোন শক্তিলাভ বোঝায় না, কারণ তিনিই আমায় বলেছেন, 'সিদ্ধি কি ? কতগুলি শক্তিলাভ করাই কি সিদ্ধি মনে কর ? ষড়ৈশ্বর্য অতি তুচ্ছ বিষয়। * * * যখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রতিক্ষণে আপনা আপনি ভগবানের নাম করবে, তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়েছে, জানবে। কোন একটি বিষয়ে লোভ ও আসক্তি থাকতে সে অবস্থা লাভ হয় না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লোভ ও অনাসক্ত হলেই হয়। এই অবস্থা হলেই প্রকৃত পক্ষে নামে রুচি জন্মে। নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।' দরবেশজী দরবেশ দর্শনের ৬।৮২ নম্বর পত্রাংশে বলেছেন, 'প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নামটি গাঁথিয়া না গেলে কোন অবস্থাই কিছুই নহে। উহাই সাধনের একমাত্র নিরাপদ ভূমি।' এই নিরাপদ ভূমি লাভই সাধক জীবনে সিদ্ধিলাভ কেননা সিদ্ধিলাভ বলতে সাধন দ্বারা অর্জিত কোন অবস্থা বোঝায়, সাধকের নিজের সাধন দ্বারা সাধনের যে অবস্থায় পৌছাতে হয়, সেই অবস্থায় তাঁরই সিদ্ধির সীমা। সিদ্ধিলাভ যখন সাধনার শেষ বা চরম অবস্থা বোঝান হয় সেই অর্থ এখানে খাটে অর্থে না। এই জন্যই গোঁসাইজী পুরীতে বসে বলেছিলেন, 'এই সাধনে

সিদ্ধাবস্থা বলে যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম অভ্যস্ত হওয়া।' 'যদি কিছু থাকে' এই বাক্যাংশ থেকেই বোঝা যায় প্রচলিত অর্থে সিদ্ধিলাভ বলে গোঁসাইয়ের সাধনে কিছু অবস্থা নেই। প্রসঙ্গক্রমে গোঁসাইজী আরও বলেছিলেন, 'শ্রীবৃন্দাবন ধামের মধুর লীলা সম্ভোগ করাই এই সাধনের প্রধানতম লক্ষ্য।' প্রধানতম লক্ষ্য বটে, কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য নয়—এ উক্তির তাৎপর্য এখানে-ই।

সদ্‌গুরু সাধনে এই চরম অবস্থা বলে কিছু নেই, এ সাধকের অনন্ত কাল ধরে অনন্ত পথে চলতে হয়। কিন্তু নিরাপদ ভূমির কথা স্বতন্ত্র। নিরাপদ ভূমির তাৎপর্য এই যে সাধক এই অবস্থায় এসে যে অবস্থা বা অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকেন তা স্থায়ী হয়। এই ভূমি থেকেই ক্রমাগত উন্নতির পথটাই খোলা থাকে; অবনতি অবতরণ বা বা অধোগতির কোনই আশঙ্কা থাকে না। শ্রীশ্রীসদগুরু-সঙ্গেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। মহাভাগ্যবান সাধক কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহারাজ তাঁর সাধন প্রাপ্তির অতি অল্পকাল পর থেকেই সাধনের নানা অবস্থা লাভ করতে থাকেন, জ্যোতিদর্শন, গুরুদর্শন, আত্মদর্শন, ইত্যাদি দর্শন তো তাঁর প্রায়শই হত, তাছাড়া দেহে নানাবিধ সাত্ত্বিক বিকার নামানন্দ সম্ভোগ, ধ্যানের নিবিড় অবস্থায় বিবিধ ও বিচিত্র অনুভব এ সব-ও তিনি আস্বাদন করেছেন। অথচ ঐ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসের ডায়েরীতে তিনি লিখছেন, 'অবিচ্ছেদে নাম করা অত্যন্ত কঠিন। বহু চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, হয় না।' অর্থাৎ ১২৯৩ সালের পৌষ মাসে সাধন লাভ করার পর ১২৯৯ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত যে তিনি প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম হওয়ায় অবস্থায় পৌছান নি, তা পরিষ্কার ব্যক্ত হয়েছে। এই নিরাপদ ভূমি তখনো লাভ হয়নি বলেই ঐ সমস্ত সুন্দর অবস্থা সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে তিনি আবার নীরস শুষ্ক ও জ্বালা-জনক অবস্থার বারংবার ভুগেছেন। ১৩০০ সালের ডায়েরী, গ্রন্থের

পঞ্চম খণ্ডের কার্তিক মাসে-ও তিনি তাই লিখেছেন, 'একদিন রাত্রি ৩টার সময় ঠাকুরকে বলিলাম, ভিতরের যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করিতে পারি না। নাম, ধ্যান, সাধন ভজন সমস্ত আমার ছুটিয়া গিয়াছে। দিন-রাত জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছি। এবার বোধহয় নাস্তিক হইলাম। এখন কি করিব?' শ্বাস-প্রশ্বাসে নামটি গেঁথে গেলে তখন আর এই জ্বালা সইতে হয় না। যে ঘটনা বা কারণে জ্বালা বা গ্লানি হত সেগুলি এ অবস্থা লাভের পরেও সাধকে জীবনে ঘটতে পারে, কিন্তু তা আর সাধককে পীড়িত করতে পারে না। এই নিরাপদ ভূমি প্রাপ্তিকেই গোঁসাইজী সিদ্ধিলাভ করা বলেছেন কেননা এর পরে সাধকের নিজের করণীয় আর কিছু থাকে না; কিছু অর্জনের জন্য আর সাধন করতে হয় না। শ্বাস জয় হয়ে গেলেই সাধকের গুরুতে বিশ্বাস জন্মে, তখন যা কিছু তার করতে সবটাই গুরুনির্দিষ্ট হয় কাজ বলে জেনে তিনি সাধন ও অন্যান্য কর্মকে সমানভাবে বরণ করে নিতে পারেন। এ অবস্থায় যা তিনি লাভ করতে থাকেন তা যেমন গুরুকৃপারই দান বলে বুঝতে পারেন, যা তিনি চেয়েও লাভ করতে পারেন না তাকেও গুরুকৃপা বলে মানতে পারেন। এই নিরাপদ ভূমি সাধককে পুরোপুরি গুরুমুখী করে তোলে বলে সদ্‌গুরু সাধনে একে সিদ্ধিলাভই বলতে হয় কারণ গুরুতে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা জন্মানোই এই সাধনের চরিতার্থতা। এর পরের যে সব সম্ভোগের অবস্থা তা গুরু আর শিষ্যের অজস্র সম্পর্কের অফুরন্ত প্রকাশ, অনন্ত লীলার নিরন্তর তরঙ্গভঙ্গ। এতে সাধককে অবশ্য তখনও যদি তাঁকে সাধক নামেই ডাকা হয়—ভূমিকা আছে কিন্তু কর্তব্য কিছু নেই।

প্রত্যেক শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হওয়ার অবস্থায় পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের কর্ম জীবন, বহিরঙ্গ ধর্মজীবন এমনকি বৈষয়িক কাজকর্মে-ও যে একটি আকস্মিক পরিবর্তন এসে যায়, তা নয়। বাইরের দিক থেকে দেখলে এই সিদ্ধিলাভের অবস্থায়ও সাধককে অসাধারণ কিছু মনে হওয়ার কারণ ঘটে না। যে পরিবর্তন হয় তা

সম্পূর্ণই সাধকের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। একটা ধারণা আছে যে এই অবস্থা লাভ না হলে গোঁসইজীর সাধন অন্যকে দেবার ক্ষমতা জন্মে না, এ ধারণা-ও যথার্থ নয়। কারণ গোঁসাইজী সাধন পান ১২৯০ সালে, তিন বছর পর অর্থাৎ ১২৯৩ সালে তিনি ঐ অবস্থা লাভ করেন কিন্তু তিনি ১২৯১ সাল থেকেই সদ্‌গুরু দীক্ষা নিতে শুরু করেছিলেন। ১২৯৩ সাল যদি গোঁসাইজীর সিদ্ধিলাভের বছর বলে ধরে নেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে এর পরে-ও বহুবছর তিনি বৈষয়িক কাজকর্ম যথারীতি করেছেন, তাঁর সাধন জীবনের অবস্থার ক্রমোন্নতি-ও সিদ্ধিলাভের পর ঘটেছে। যেমন তাঁর সাধন লাভের তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পরেও তিনি পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাজের কাজ পরিচালনা করেছেন, ১২৯৪ সালে স্বহস্তে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র লিখেছেন, ১২৯৫ সাল আচার্যপদে ইস্তফা দিয়ে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন, ১২৯৬ সালে যোগমায়া দেবীকে বৃন্দাবন থেকে চিঠি লিখেছেন, ১২৯৭ সালের ফাল্গুন মাসে যোগমায়া দেবীর দেহত্যাগের খবর দিয়ে ঢাকায় নিজের হাতে পত্র লিখেছেন। বোধ হয় ১২৯৮ সাল থেকে গোঁসাইজী নিজের হাতে আর কাউকে চিঠিপত্র লেখেন নি। হরিদাস বসু মশাই লিখেছেন যে তাঁর সাধন লাভের পর তিনি ১২৯৭ সালে গোঁসাজীর বৃন্দাবন ধামে অবস্থিতির সময়ে যে মণি অর্ডার করে টাকা পাঠিয়েছেন তা প্রথম প্রথম গোঁসাইজীর নামে পাঠান হয়েছিল এবং গোঁসাইজী নিজে স্বাক্ষর করে তা গ্রহণ করেছেন। এ তো গেল বৈষয়িক কাজ-কর্মের কথা। সাধনের উন্নততর অবস্থালাভ-ও যে গোঁসাইজী ১২৯৩ সালের পরে-ও করেছেন তার প্রমাণ শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গের দ্বিতীয়খণ্ডে বর্ণিত শ্রাবণ মাসের ডায়েরী। সেখানে গোঁসাইজী ব্রহ্মচারীজীর প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, 'শ্রীবৃন্দাবনে আসার পরই গুরুজী আমাকে বললেন—অন্তত একটি বৎসর এখানে আসন রাখতে হবে। আসনে নিত্য তোমার নিকটে নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হবে। সেই হতে প্রত্যহই দু'টি

একটি করে নূতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হচ্ছে।' সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে সদ্‌গুরু সাধনের নবযুগের প্রবর্তক স্বয়ং গোঁসাইজীর সাধন জীবনে-ও প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম রপ্ত হয়ে সিদ্ধিলাভের অবস্থা কোন অংশেই প্রচলিত অর্থে সিদ্ধিলাভ ছিল না অর্থাৎ তাঁর সাধন জীবনের চরমোৎকর্ষতা ঐ সিদ্ধিলাভের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর লাভ হয়নি। পরন্তু ঐ সিদ্ধাবস্থার পর তিনি দীর্ঘদিন সক্রিয়ভাবেই তাঁর দৈনন্দিন বৈষয়িক কাজকর্ম যথানিয়মে চালিয়ে গেছেন।

সাধক কিরণচন্দ্র-ও তাই এই সিদ্ধিলাভের অবস্থায় পৌঁছেই যে তাঁর বাইরের ধরণ ধারণ সব পালটে ফেললেন তা মোটেই নয়। বরং এতদিন যে বৈষয়িক কাজকর্ম তাঁকে বিশেষ করতে হয়নি, ক্রমশ তিনি সেদিকে জড়িয়ে পড়লেন। সদ্‌গুরু সাধনের এ এক অভিনব ব্যবস্থা, ঘটা করে ত্যাগের মাধ্যমে এখানে সাধু হতে হয় না, অনাসক্ত বিষয় ভোগের মধ্যে এ সাধনের সিদ্ধি অম্লান, অটুট থেকে যায়। শুধু তাই নয়, এ সাধনে অবস্থালাভ বলতে কেবল ভিতরের আধ্যাত্মিক অবস্থার উৎকর্ষই বোঝায় না, আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধকের অন্যান্য আধিভৌতিক অবস্থারও পূর্ণতর বিকাশ ঘটে। এ সাধনের সাধু শুধু ধর্মেই নিপুণ হন না কর্মে বিষয়ে আশয়ে সব ব্যাপারেই কুশল হয়ে ওঠেন। কিরণচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের আলোচনক্রমে এ তত্ত্ব আরও বিশদ করে আস্বাদন করা যাবে।

দরবেশজীর নিজের শিষ্যদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের উকীল, বসন্ত কুমার পাল মশাই-ই একমাত্র সাধক যিনি দরবেশজীর দেহে থাকার সময়েই প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম হওয়ার দুর্লভ অবস্থা লাভ করে নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছেছিলেন। এ সম্বন্ধে দরবেশ দর্শনের ২০।৬৫ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী নিজেই লিখেছেন' 'বসন্ত আমার প্রিয়তম ছিল। আমার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেবলমাত্র এই একজনেরই চব্বিশ ঘণ্টা শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হইত।' ১৩৪৯ সালের ২ শ্রাবণ দরবেশজীর দেহে থাকার অবস্থাতেই বসন্তকুমার দেহত্যাগ করেন।

তাঁর দেহত্যাগের পর দরবেশজী সম্পাদিত 'মন্দির' মাসিক পত্রে তাঁর সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তার উল্লেখ্য অংশটি এই, "বসন্তকুমার অতি উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন। অহরহ তাঁহার নাম-সমাধি হইত। ধর্মের বিন্দুমাত্র আড়ম্বর তাঁহার ছিল না। * * * তিনি ধর্মের বহুতর তত্ত্বের সাক্ষাতকার লাভ করিয়াছিলেন। গুরুদেবের সঙ্গে বসন্তকুমারের কীরূপ অপূর্ব প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, তাহা আর কেহ জানিত না। গুরু-শিষ্যে এ প্রকার সখ্য ভাব খুব কম-ই দৃষ্টিগোচর হয়।' এই বসন্তকুমার সাধনের দুর্লভ অবস্থায় পৌঁছে-ও উদাসীন জীবন যাপন করেন নি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বেষ্টিত সংসারে সহজ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। তিনি উকীল ছিলেন, মিথ্যার আশ্রয় নিতে হত বলে নিয়মিত কোর্টের কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন বটে কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের কোন প্রয়োজনে কোর্টে যেতে হলে যেতেন। আইনের দু'খানি বই থেকে তিনি যে অর্থ পেতেন তা দিয়েই সংসার চালাতেন। বসন্তকুমারের প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম হয়, দরবেশজীর কাছে এ কথা জানতে পেরে মঙ্গলচাঁদ দাস বসন্তকুমারকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কী করে নিয়ত নাম চলার অবস্থায় তিনি আদালতে সওয়াল করেন। উত্তরে বসন্ত যা বলেছিলেন তাতে মঙ্গলচাঁদ মোটামুটি এই বুঝেছিলেন যে যখন আদালতে বা অন্য কোথা-ও তাঁকে বৈষয়িক ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে হয় তখন কুম্ভকের মত শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা সাম্যাবস্থা ঘটে এবং ভিতরে ঐ কুম্ভকে নামটি চলতে থাকে। মনে হয় ঠিক অনুভবগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা না হলে কোন সাধকই অন্যের কথা শুনে এ অবস্থাটি অনুমানে বুঝে উঠতে পারেন না। দরবেশজীর দেহত্যাগের পর তাঁর অন্য শিষ্য-শিষ্যাদের কারোর প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হওয়ার অবস্থা লাভ হয়েছে কিনা, প্রকাশ্যে জানা যায় না। নারায়ণদাদজীকে তাঁর দেহত্যাগের কয়েক মাস আগে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন তাঁর জ্ঞানত দশ-বারো ঘণ্টা নাম হয় কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা হয় না। ভগবানদাসজী বলেন তাঁর অবস্থা-ও প্রায়

ঐ রকম। নিখিলানন্দজী অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে চব্বিশ ঘণ্টা নাম হলে সে সাধক অন্যকে তা বলতে যাবেন কেন। তিনি এভাবে প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। অসীমানন্দজীকে কেউ সাক্ষাত ভাবে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে তিনি নিজে সাধন দিতেন বলে তাঁর এ অবস্থা লাভ হয়েছে বলে অনেকেই অনুমান করেন। অসীমানন্দজী নিত্য নিয়মিত আসন করে সাধারণ সাধকের মত সাধন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন দেখে নারায়ণদাসজী একবার তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন যে রোজ আসনে বসে নিয়মিত সাধন করা তাঁর আর প্রয়োজন হয় না। এ থেকে ধারণা করা যায় যে নামটি তাঁর শ্বাসে-প্রশ্বাসে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলা হয়েছে যে প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হওয়া গোঁসাইজী-প্রবর্তিত সাধন ধারায় আচার্যদের একটি আবশ্যিক যোগ্যতা নয়। এখানে দরবেশজীর সন্ন্যাসী শিষ্যদের কথা-ই বলা হল কারণ তাঁরা সাধারণত সাধন নিয়েই ছিলেন বা আছেন। দরবেশজীর অধিকাংশ শিষ্য-শিষ্যাই গৃহস্থ। তাঁদের মধ্যে কারোর কারোর এই নিরাপদ অবস্থা লাভ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়, তবে তাঁরা কৃপা করে না জানালে তা অন্যের বুঝতে পারার কোন যো নেই।

গোঁসাইজীর দেহত্যাগের পর ১৩০৬ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ কিরণচন্দ্র পুরীধাম ত্যাগ করে যাত্রার পথে ২৯ জ্যৈষ্ঠ বারং ষ্টেশনে এসে গরুর গাড়ি করে কটকে পৌঁছালেন; জোবরা ঘাটে সঙ্গী গুরুভাইদের সঙ্গে রান্না-খাওয়া সেরে রাত কাটালেন। ৩০ জ্যৈষ্ঠ সকালে ষ্টীমার চেপে জানাপুর এলেন তাঁরা, কয়েক মাইল হেঁটে বামনী নদীতে নৌকায় যাত্রী হলেন। ৩০ তারিখ সমস্ত রাত ও ৩১ তারিখ দিন রাত্রি নৌকায় কাটল। গুণ-টানা নৌকা, মাঝি ও যাত্রী উভয়েরই কষ্টের একশেষ। ৩১ জ্যৈষ্ঠ রাত ১১ টায় ভদ্রক পৌঁছে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাজারে গিয়ে খিচুরী রান্না করে খেয়ে বাঁচলেন যাত্রীরা। পরদিন ৩২ জ্যৈষ্ঠ ভদ্রক ষ্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে রাত্রিবেলা খড়্গপুর পৌঁছালেন কিরণচন্দ্র।

ওখানকার হোটেলে খেয়ে নিয়ে ট্রেনেই শুয়ে রইলেন সবাই; রাত তিনটায় ট্রেন ছাড়ল, পরদিন পয়লা আষাঢ় বিকেলে কলকাতা। প্রসঙ্গত এখানে কিরণচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের হোটেলে খাওয়ায় ব্যাপারটা একটু বিচার করে দেখা দরকার। হোটেলে খেলে উচ্ছিষ্ট ও মাংসাদির সংস্পর্শ বাঁচিয়ে খাওয়া চলে বলে মনে হয় না, কাজেই সদাচার রক্ষা হয়না। অথচ গোঁসাইয়ের সাধনে এ সদাচার প্রতিপালিত না হলে সাধন শক্তির অনিষ্ট হয়। কিরণচন্দ্র নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছে-ও সদাচার সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন না এ কথা ভাবা-ও যায় না। কিন্তু শরীর রক্ষার জন্য, প্রয়োজন বুঝে অন্যকে উদ্বেগ না দেবার জন্য কখনো কখনো নিয়মভঙ্গ করলে সাধকের তেমন ক্ষতি হয় না, ইচ্ছামত বা খুশীমত অনাচার না করলেই হল। এ সম্বন্ধে দরবেশ দর্শনের ৫।১৮, ৫।২০ এবং ৫।২১ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজীর বক্তব্য বলা আছে। প্রথমোক্ত পত্রাংশের উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'কোন্ স্থানে কোন্ নিয়ম ভঙ্গ করা চলে, কেবল মাত্র তপস্যা দ্বারাই সে-বুদ্ধি লাভ হয়।' সাধক যখন সমাজের জীব তখন সদাচার পালন করতে গিয়ে তাঁকে যে সমস্যায় পড়তে হয় তার সমাধানের ইঙ্গিত দরবেশজীর এই উক্তিটিতে পাওয়া যায়। 'মন্দির' কাব্যে এই উপদেশ-ই আরও পরিষ্কার করে দরবেশজী বলেছেন; 'সকল বিধান সকল নিষেধ নামের মন্ত্রে সাধা।"

পয়লা আষাঢ় থেকে তেসরা আষাঢ় কলকাতায় কাটিয়ে ১৩০৬ সালের ৪ আষাঢ় কিরণচন্দ্র দার্জিলিং মেলে জলপাইগুড়ি রওনা হলেন, তাঁর শ্বশুরমশাই তখন ওখানে দারোগা। সরোজবালা তাঁর বাবার কাছে সেখানে ছিলেন। জলপাইগুড়ি থাকতে কিরণচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইয়ের দেখা হল। ব্রাহ্মসমাজের কাজে শিবনাথ দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি এসে জালালউদ্দিন ডাক্তারের বাড়িতে উঠেছিলেন। সাতুই আষাঢ় কিরণকে সেখানে ডেকে পাঠিয়ে তিনি গোঁসাইজীর পুরী বাসের সব ঘটনা জানতে চাইলেন। গোঁসাইজীর সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ বলতে বলতে শিবনাথ কেঁদে ফেললেন। ৮ আষাঢ়

জলপাইগুড়ির টাউন হলে শিবনাথ বক্তৃতা করলেন, কেবল গোঁসাইজীর কথা বলে তিনি খেদ করতে লাগলেন। অথচ এই শাস্ত্রীমশাই গোঁসাইজীর ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পর তাঁর প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছিলেন, দরবেশজী দরবেশ দর্শনের ১।৫ নম্বর পত্রাংশে সে কথা লিখেছেন।

১৩০৬ সালের পুরো আষাঢ় মাস কিরণচন্দ্র জলপাইগুড়িতে কাটালেন। এর মধ্যে ৯ আষাঢ় চন্দ্রগ্রহণ হল, ২৩ আষাঢ় রাত এগারোটায় ভূমিকম্প হয়েছিল। এ সময়ই তিনি তাঁর গুরুভ্রাতা রনগ্রামের গদাধর রায়ের বজ্রাঘাতে মৃত্যুর সংবাদ পান। শ্রাবণ মাসের ১৩ তারিখ একটি অভিনব ব্যাপার ঘটল ; হঠাৎ কিরণচন্দ্রের কী একটা ভাব হল, তিনি সরোজবালাকে ডেকে উচ্চৈঃস্বরে সরোজের গোঁসাইজী-প্রদত্ত নামটি বারংবার উচ্চারণ করে বলতে লাগলেন, 'অবিরাম এই নাম জপ কর।' সরোজ কাছে এসে বললেন, 'আমি তো ঐ নাম জপ করিনা, প্রণব সংযুক্ত করে গোঁসাইয়ের নাম জপ করি।' গোঁসাইজী জপ করার জন্য সাধনের সময় যে নাম দিয়েছেন সে নাম জপ না করে সরোজ যে নিজের খুশীমত নাম তৈরী করে নিয়েছেন তা জেনে কিরণচন্দ্র যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বুঝিয়ে বলতে সরোজবালা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। কিরণচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন, তিনদিন অন্নাহার ত্যাগ, মৌনাবলম্বন, কম্বল পেতে বিনা বালিশে মাটিতে শয়ন এবং দিন রাত যতটা সম্ভব একাসনে বসে নাম করা। সরোজবালা এই বিধান মেনে নিয়ে তিন দিন প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

সরোজবালার ইষ্টমন্ত্র নিয়ে এই যে বিভ্রাট—তলিয়ে দেখতে গেলে এর মধ্যে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার আছে তা বুঝতে পারা যায়। ১৩০৩ সালের ১২ মাঘ সরোজের সাধন লাভ আর ১৩০৬ সালের ১৩ শ্রাবণ—এই দীর্ঘ আড়াই বছর তিনি গোঁসাইজী প্রদত্ত নামের বদলে প্রণব-যুক্ত গোঁসাইয়ের নাম জপ করেছেন, শ্বাসে-প্রশ্বাসে ধ্যান

করেছেন। সাধারণ মানুষ আনুষ্ঠানিক দীক্ষা না পেয়ে-ও অনেক সময় ভগবানের পরিচিত বা প্রচলিত যে কোন একটি নাম নিজের রুচিমত বেছে নিয়ে জপ করে থাকেন, ভগবানের নাম-ই জপ করেন। গোঁসাইজীর নামের 'বিজয়কৃষ্ণ' অংশটি কিংবা 'গোস্বামী' বা 'গোঁসাই' শব্দটি এই পরিচিত বা প্রচলিত কোন নামের মধ্যে-ই পড়ে না। অথচ সরোজবালা নিজের স্বাভাবিক সংস্কার মত গোঁসাইজীর নামটি-ই জপ্য বলে স্থির করে নিলেন। এতে নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় যে গোঁসাইজী স্বয়ং যে ভগবান, তাঁর বর্তমান নামটি অপরিচিত হলেও যে ভগবানেরই নাম এ বিষয়ে সরোজবালার কোন সংশয়ই ছিল না। গোঁসাইজীর ভগবত্তা সম্বন্ধে তাঁর এই যে স্বাভাবিক, সহজ ও সরল সংস্কার বা আস্তিক্য বুদ্ধি—এটি অভিনব বলে মনে হলে-ও সরোজবালার কাছে এই সহজ বোধটি ছিল পরম সত্য। সাধিকা সরোজবালার সমস্ত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য এই সহজ বিশ্বাসের পাকা ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোঁসাইজীর শিষ্য-শিষ্যাদের অনেকে এমন কি কিরণচন্দ্র-ও দীর্ঘদিনের পুরুষকারাশ্রিত সাধনের দ্বারা গোঁসাইজীর উপরে যে বিশ্বাস লাভ করেছেন, তাঁর স্বরূপ বিষয়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, স্বভাব-সাধিকা সরোজবালা স্বতঃই সেই সাধকদুর্লভ বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের অধিকারিণী ছিলেন। গুরুতে ভগবানবোধ এ সাধন মার্গের প্রায় শেষ কথা, সরোজবালার এ বোধ এমনিতে-ই ছিল। সাধন পথের যাত্রীকে সাধন দ্বারা বিশ্বাস অর্জন করতে হয়, সরোজবালা বিশ্বাস দিয়েই সব কিছু অর্জন করেছিলেন। এর আরও প্রমাণ প্রসঙ্গক্রমে পরে জানা যাবে। সাধন পাবার আগেই, গোঁসাইকে চর্মচক্ষে দর্শন করার বহু পূর্বেই যিনি জানতেন যে গোঁসাইয়ের কাছে সাধন প্রার্থনা করতে পারলেই আর কোন ভাবনা থাকে না, সেই সরোজবালার পক্ষেই এই সহজ বিশ্বাসের সুগম পথ ধরে চলাফেরা করা সম্ভব ছিল।

তবে কি কিরণচন্দ্র গোঁসাইয়ের প্রদত্ত ইষ্টনাম স্মরণ করিয়ে

দিয়ে সরোজবালার সরল বিশ্বাসে আঘাত করেছিলেন? না, তা নয়। কারণ কিরণচন্দ্র এত দিন জানতেন না সরোজবালা কী নাম জপ করেন; তাঁর নিজস্ব বিচার বুদ্ধি দিয়ে ধরে নিয়েছিলেন যে ঠিক নামই সরোজবালা জপ করছেন। সেদিন হঠাৎ আবিষ্ট হয়েই তিনি সরোজবালার ইষ্টনামটি উচ্চারণ করে তাঁকে অবিরাম জপ করতে বললেন, কেন যে তিনি তা করলেন তা তিনি সরোজের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত নিজেই বুঝতে পারেন নি। কাজে কাজেই মনে হয় গোঁসাইজীর ইচ্ছাতেই ওদিনকার ঘটনাটি ঘটল। সাধনের সময় ভগবানের যে নামটি গুরু শক্তি-পূত করে প্রার্থীকে দিয়ে থাকেন, সেই নামটিই সাধকের শক্তি, ঐ নামটি আশ্রয় করেই তাঁর সাধনায় ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি। সহজ বিশ্বাসে অন্য কোন নাম বা পন্থা অবলম্বন করলে সাধনের স্ফূর্তি হবে না, সাধন আর গুরুমুখী থাকবে না। কিরণচন্দ্র যদি আগে সরোজবালার আচরণের কথা জানতেন তবে তো কবেই তা শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন, আর তা ছাড়া বিশেষ প্রেরণার বশবর্তী না হলে তিনি চেঁচিয়েই বা সরোজের নামটি উচ্চারণ করতে যাবেন কেন; চুপি চুপি ডেকে নিয়েই তো বলতে পারতেন। সুতরাং সরোজবালার নাম ঠিক করে দেখার ঘটনাটি বিধিনির্দিষ্ট, গোঁসাই-নির্দিষ্ট বলা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এ সম্বন্ধে দরবেশ দর্শনের ৩।৮ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজীর বক্তব্য উদ্ধৃত করলে এই গুরু-দত্ত নামের তত্ত্বটি পরিষ্কার বোঝা যাবে, 'নাম শুধু অক্ষর নহে; উহার ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহাই নাম। সদগুরু যে কোন অক্ষরে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তুমি এ জন্মে যে নাম পাইয়াছ, ইহাই তোমার এ জন্মের শক্তিপূত নাম। * * * শ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া শুধু ঐ স্বপ্নের নাম কেন, যে কোন একটি শব্দ জপ করিলেই তোমায় ব্যভিচার করা হইবে।' পরবর্তী ৩।৯ পত্রাংশে তিনি এই প্রসঙ্গেই বলছেন, '(স্বপ্নে) যে নাম পাইয়াছিলে উহা মহাপুরুষগণ দত্ত যে সনাতন পাঁচটি নাম আছে, উহারই একটি।

যাক্, উহাতে এবার তোমার কোন আবশ্যক নাই। এবার তুমি তোমার প্রিয়তমকে যে নামে জানিয়াছ উহাই তোমার সর্বস্ব।' কিরণ-চন্দ্রের মাধ্যমে গুরু গোঁসাইজী সরোজবালাকে তাঁর এবারকার শক্তি-পূত নামটি স্মরণ করিয়ে দিলেন, ধরিয়ে দিলেন। গুরুদত্ত গোঁসাই-দত্ত নামে ডাকলেই গোঁসাইজী শোনেন; গোঁসাই, গোঁসাই বলে ডাকলে তিনি শুনলেও তৃপ্তি পান না।

গোঁসাইজী বলেছেন, 'স্বামী-স্ত্রীর বিভিন্ন মন্ত্র হইলেও একে অন্যকে বলিয়া দিতে পারেন। বাস্তবিক এখানে (আমাদের সাধনে) দেবতা এক, নাম ভিন্ন মাত্র; বিচার করিলে তাহাও ভিন্ন নহে। শারীরিক প্রকৃতি দেখিয়া নামের অক্ষর বিভিন্ন করার প্রয়োজন হয় —এ জন্য নাম ভিন্ন বোধ হয়।' 'বিভিন্ন মন্ত্র হইলেও' এই বাক্যাংশ থেকে বোঝা যায় যে স্বামী-স্ত্রীর একই নাম হলে তো কথাই নেই— উভয়েই উভয়কে প্রয়োজন মত বলে দিতে পারেন। মনোরমা দেবী যখন নাম-সমাধিতে ২৪ ঘণ্টা এমনকি ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত মগ্ন থাকতেন তখন তাঁর সমাধি ভঙ্গের জন্য তাঁর স্বামী মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা তাঁর কানে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করে বলতেন। স্বামী বা স্ত্রী কারোর নাম বিস্মরণ হলে, একে অন্যকে মনে করিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এ বিধি স্বামী-স্ত্রীর বেলায় প্রযোজ্য অন্যথায় নামটি উচ্চারণ করা মহা অপরাধ। এ বিষয়ে দরবেশ দর্শনের ৩।৩৬ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী বলেছেন, 'এইরূপ নাম যে মুখে এমনকি ফিস ফিস করিয়া ঠোঁটেও উচ্চারণ করে তাহার নামের সমস্ত শক্তি ক্রমশ নষ্ট হইয়া যায়।' আবার নিজের স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ বিস্মৃত নাম স্মরণ করিয়ে দিলে-ও কোন লাভ নেই। এ সম্বন্ধে দরবেশ দর্শনের ৩।৪৪ এবং ৩।৪৯ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজীর বক্তব্য জানা যাবে।

কিরণচন্দ্র সরোজবালাকে যে নামটি বলে দিলেন সেটি সরোজ-বালারই প্রাপ্ত নাম। অর্থাৎ দু'জনের ইষ্টমন্ত্র এক ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর সাধন যদি একই আসরে না হয় তবে সর্বদা দু'জনের একই

নাম না হতেও পারে আবার হতেও পারে। গোঁসাইজীর উক্ত বক্তব্য থেকেই দেখা যায় যে সাধকের শারীরিক প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে নামের অক্ষরের কম বেশি স্থির করা হয়ে থাকে, গুরুই জানেন কাকে কী নাম দিতে হবে। দরবেশ দর্শনের ৩।৩৬ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজীও বলেছেন, 'নাম সকলের এক নহে; যাহার পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন তাহাকে সেইরূপ নাম দেওয়া হয়। কিন্তু শক্তি সকলের এক।' ঐ গ্রন্থের ৩।৯ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী বলেছেন যে মহাপুরুষগণ প্রদত্ত পাঁচটি সনাতন নাম আছে। আবার ৩।৮ নম্বর পত্রাংশে বলেছেন, যে সদ্‌গুরু যে কোন অক্ষরেই শক্তি সঞ্চার করে দিতে পারেন। কাজেই গোঁসাইজীর সাধনে সনাতন পাঁচটি নাম-ই প্রার্থীদের মধ্যে বিতরিত হয়েছে, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। গোঁসাইজী ক'টি নাম তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের দিয়েছিলেন, তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে দরবেশজী যে পাঁচটি নাম দিতেন, তা জানা আছে। দেবী সরোজবালাও সদ্‌গুরু রূপে পাঁচটি নাম দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ও দরবেশজীর প্রদত্ত নামগুলি সব অভিন্ন ছিল না। দরবেশজীর শিষ্যদের মধ্যে স্বামী অসীমানন্দজী-ই এ যাবত প্রকাশ্যে সাধন প্রদান করেছেন। প্রশ্ন করায় তিনি একবার বলেছিলেন যে তিনি নিজে দরবেশজীর কাছে যে ইষ্টমন্ত্র পেয়েছেন সে মন্ত্র তিনি কোন শিষ্য-শিষ্যাকে প্রদান করেন নি; কারণ হিসাবে বলেছিলেন যে তাঁর প্রাপ্ত ইষ্টমন্ত্র তাঁর নিজস্ব শক্তি, এ শক্তি তিনি কাউকে দিতে পারেন না। গোঁসাইজীর সাধনে সদ্‌গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ অন্য কেউ নিজের ইষ্টমন্ত্র শিষ্যদের দিয়েছেন কিনা, সে তথ্য জানা নেই।

যদিও গোঁসাইজী এবং দরবেশজী উভয়েই বলেছেন যে নাম বিভিন্ন হলেও এ সাধনে প্রার্থীগণ একই শক্তিই লাভ করে থাকেন তবু অনেকের কোন একটি বিশেষ নামের উপর সংস্কারগত একটা আকর্ষণ থাকে কিংবা কোন একটি বিশেষ নাম তাঁদের তৎক্ষণিক সংস্কারের সঙ্গে

মিলে যায় বলে তাঁরা স্বস্তিবোধ করেন। 'কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী ও হরিদাস বসু তাঁদের প্রাপ্ত   তাঁদের সেই সময়কার সংস্কার অনুযায়ী হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল বলে সানন্দে তা উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু সকল প্রার্থী-ই যে তাঁর তখনকার রুচিমাফিক নাম পাবেন, এমন কোন কথা নেই। আসলে প্রার্থীর শারীরিক প্রকৃতি ও গঠনের উপর তাঁর নামের হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য নির্ভর করে; এবং নামের প্রতিপাদ্য দেবতা বা বাচ্য তত্ত্বতঃ এক হলে-ও শুধু অক্ষরগুলি ধরে দেখতে গেলে পরিচিত কোন দেবতাকে মনে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। এই জন্যই সাধারণত নামের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য সাধনের সময় ব্যাখ্যা করে দেবার রীতি এই সাধনের আচার্যদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এ ব্যাখ্যা এ জন্য করা হয় যাতে সাধক তাঁর পূর্ব সংস্কারমত নামের অক্ষব দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পরিচিত কোন দেব-দেবীকে না উপাস্য বলে আকড়ে ধরেন। যে সাধকের কোন পরিচিত দেব-দেবী সম্বন্ধে সংস্কার থাকে না তাদের জন্য নামের এই অর্থ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। দরবেশজীর দুইজন শিষ্য গোষ্ঠ গোপাল কুণ্ডু এবং ডাঃ জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী (নারায়ণ) একই সঙ্গে কাশীতে গিয়ে সাধন লাভ করেন। সাধনের সময় তাঁদের নামের কোন অর্থ দরবেশজী ব্যাখ্যা করে শোনান নি। কিছুদিন পরে গোষ্ঠ গোপালকে দরবেশজী আলাদা করে নামের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। নারায়ণ গোষ্ঠের কাছে এ খবর পেয়ে দরবেশজীকে লিখলেন যে তাঁকেও যেন নামের অর্থ জানানো হয়। উত্তরে দরবেশজী লিখে জানালেন যে ঐ অর্থ জানা গোষ্ঠের প্রয়োজন ছিল, নারায়ণের ওতে কোন দরকার নেই। এই গোষ্ঠ গোপালের বাবা শশিমোহন কুণ্ডু গোঁসাইজীর শিষ্য ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ দু'ভাই তাঁর অনেক আগেই গোঁসাইয়ের সাধন পেয়েছেন কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত গোষ্ঠ গোপালের সাধন নেওয়ার তেমন ইচ্ছে হয়নি। যাই হোক, বেশ পরিণত বয়সে যখন তিনি সাধনপ্রার্থী হয়ে দরবেশজীর কাছে গেলেন তখন কেন যেন তাঁর বাসনা হল যে তাঁর

বাবা গোঁসাইজীর কাছে যে নামটি পেয়েছিলেন তিনিও যেন সেই নামটিই পান। অবশ্য তিনি তাঁর বাবার প্রাপ্ত নামটিও জানতেন না এবং তাঁর বাসনার কথাও তিনি দরবেশজীকে জানান নি। সাধন দেয়ার অব্যবহিত পরে দরবেশজী নিজে থেকেই বললেন, 'তোমার বাবা-ও গোঁসাইজীর কাছে এই নামটি-ই পেয়েছিলেন।' এক অপূর্ব তৃপ্তিতে গোষ্ঠ গোপালের মনটি ভরে গেল। ইষ্টমন্ত্র সম্বন্ধে নারায়ণ ডাক্তারের আর একটি অভিজ্ঞতার কাহিনী একটু অপ্রাসঙ্গিক হলে-ও এখানে বলা চলে। সাধন পাবার দীর্ঘদিন পরে তিনি যখন নীলরতন সরকার হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন তখন তাঁর ইষ্টমন্ত্রটি ঠিক ঠিক স্মরণ আছে কিনা এ বিষয়ে সংশয় হয়। দরবেশজী তখন দেহে নেই, কাজেই সংশয়ের নিরসন করার কোন পন্থা ছিল না। ঐ হাসপাতালের বড় ডাক্তার ডাঃ নন্দীর বাবা গোঁসাইজীর শিষ্য খবর পেয়ে নারায়ণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ডাঃ নন্দীর বাড়ি গেলেন। কথা প্রসঙ্গে ডাঃ নন্দীর বাবা তার নিজের ইষ্টমন্ত্রটি উচ্চারণ করে বললেন যে তিনি গোঁসাইয়ের কাছে ঐ নাম পেয়েছেন। নারায়ণের ইষ্টমন্ত্র-ও একই; গোঁসাইজীর শিষ্যের মুখে ওটি পরিষ্কার শুনতে পেয়ে তাঁর সংশয় কেটে গেল। ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য সতীশ দত্ত চৌধুরী তাঁর স্ত্রীর সাধনের জন্য দরবেশজীর দ্বারস্থ হয়ে এলেন, ব্রহ্মচারীজী সে সময় অপ্রকট হয়েছেন। তাঁর মনে মনে খুব ইচ্ছা তাঁর স্ত্রী-ও যেন তিনি ব্রহ্মচারীজীর কাছে যে নামটি পেয়েছেন সেইটি-ই পান। কিন্তু সাহস করে এ কথা দরবেশজীকে বলতে পারলেন না। সাধনের বৈঠকে সতীশকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিলেন দরবেশজী। সাধনের সময় নামটি বলে দিতেই তিনি দেখলেন তাঁর স্ত্রী অবিকল তাঁর নিজের নামটি-ই পেলেন। সাধন শেষ হল, দরবেশজীকে প্রণাম করতেই তিনি সতীশকে বললেন, 'কি নাম ঠিক হল ত?' বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় সতীশের চোখে জল এল।

দীর্ঘ দেড় মাসের বেশি জলপাইগুড়িতে কাটিয়ে ১৩০৬ সালের ২২

শ্রাবণ কিরণচন্দ্র দেশের বাড়িতে রওনা হলেন। পোড়াদা, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর হয়ে ২৩ তারিখ রাত নটার সময় বাড়ি পৌঁছালেন তিনি। বাড়িতে সাধন-ভজনে দিন কাটে, আবার যখন-ই মন খারাপ লাগে তখন-ই কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়ে সেখানকার গুরুভাইদের সঙ্গে থেকে কদিন সৎপ্রসঙ্গে ও কীর্তনানন্দে বেশ তাজা হয়ে ফিরে আসেন। পলিতা, বনগ্রাম, রাজৈর, কুমারখালি এ সমস্ত গ্রামে প্রায়ই যান কিরণচন্দ্র, সেখানে গুরুভইদের সাধুসঙ্গ তাঁকে আকর্ষণ করে তোলে। শুধু কি সাধুসঙ্গের টান? গুরুতে রতি বা ভালবাসা জন্মালে গুরুভাইদের প্রতি-ও আপনা থেকেই ভালবাসা জন্মে যায়। আর গুরুদেব অপ্রকট হলে পরই গুরুভাইদের প্রতি ভালবাসার টানটা বেশি অনুভবে আসতে থাকে। কিরণচন্দ্র এই ভালবাসার টানে, এই ভালবাসার লোভে-ই ছুটে ছুটে যান তাঁর গুরুভাইদের কাছে, না গিয়ে পারেন না বলেই যান, সৎসঙ্গের লাভালাভ বিচার করে যান না। গোঁসাইজী বলেছেন, গুরুভাইদের ভালবাসা সাধনের প্রধান অঙ্গ। গুরুভাইয়েরা কখনো গুরু রূপে কখনো বা মরমী ভাই রূপে সাধক জীবনের আনুকূল্য করে থাকেন। আবার যে কোন সাধকের সাধনের গাঢ়তা উপলব্ধি করা যায় গুরুভাইদের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ দেখে। ইতোমধ্যে পুরীতে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর সমাধি স্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা চলছে। কিরণচন্দ্র-ও এই অর্থ ভিক্ষার কাজে লেগেছেন, পয়লা অঘ্রান তারিখ বনগ্রামে গিয়ে তিনি প্রায় আড়াইশ' টাকা এই উদ্দেশ্যে আদায় করে নিয়ে এলেন। আঠারোই অঘ্রান কিরণচন্দ্র তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে সাধন করছেন এমনসময় বাড়ির একজন এসে দরজা ধাক্কা দিতে লাগল। তিনি এতে এমন বিরক্ত হলেন যে আসন ছেড়ে উঠে এসে যে ধাক্কা দিচ্ছিল তাকেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। এ ঘটনায় তাঁর দাদা শ্রীশচন্দ্র মনে খুব কষ্ট পেয়ে তাঁকে খুব বকলেন। দাদার কাছ থেকে তিনি বরাবর স্নেহ আর আদর-ই পেয়েছেন ; জীবনে

এই প্রথম তাঁর তিরস্কার পেতে হল কিরণচন্দ্রকে। ক্রোধের জন্য লজ্জিত বোধ করলেন তিনি। কিন্তু দাদার উপলক্ষে আরও বড় আঘাত কিরণচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। কদিন পরে ২৯ অঘ্রান গ্রামের রাস্তায় চলতে চলতে বিকেল পাঁচটার সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান শ্রীশচন্দ্র, মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিরণচন্দ্র সে সময় গ্রামের গুরুভাই রেবতী রায়ের বাড়িতে ছিলেন, খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন সব শেষ। ছেলেবেলায় বাবা মারা যাবার পর কিরণচন্দ্র তাঁর দাদার কাছে পিতৃস্নেহে বড় হয়েছেন, সংসার বিষয় সম্পত্তি কোন কিছুতেই তাঁকে ব্যাপৃত হতে দেন নি তাঁর দাদা। দাদার মৃত্যুতে তিনি যেন যথার্থই পিতৃহারা হলেন এবার। বড়ই মুষড়ে পড়লেন কিরণচন্দ্র।

১৩০৬ সালের ২০ মাঘ কিরণের একটি বন্ধু লাভ হল, বন্ধুটি কাশিমপুরের বৈষ্ণব আখড়ার মহান্ত মাতন চাঁদ গোঁসাই। খালিয়া গ্রামের সাহাদের বাড়িতে মাতান চাঁদ এসেছিলেন, সেখানেই কিরণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাত ও আলাপ হল, দু'জনে অল্পেতেই পরস্পরকে ভালবেসে ফেললেন, প্রাণে প্রাণে ভাব হয়ে গেল দু'জনের। ২২ মাঘ রেবতী রায়ের সঙ্গে কাশিমপুরে মাতান চাঁদের আখড়ায় গেলেন কিরণচন্দ্র, সেখানে কীর্তানানন্দে মেতে উঠলেন তিনি। ক্রমশ মাতান চাঁদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ফুরসত পেলেই তিনি ঐ আখড়ায় গিয়ে কদিন কাটিয়ে আসতেন। দরবেশজীর জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলী 'পঞ্জিকা' থেকে দেখা যায় ১৩০৭ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ তিনি অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে কাশিমপুরের আখড়ায় মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। অষ্টপ্রহর কীর্তন হয়েছিল সেখানে; 'জয় রাধশ্যাম, নিত্যানন্দ রাম, গৌর গুণধাম, হরেকৃষ্ণ রাম' এই নাম কীর্তনে গীত হয়েছিল। ২১ মাঘ মধ্যাহ্নে নাম কীর্তন সমাপ্তির পরে পদাবলী কীর্তনে কিরণচন্দ্রের অদ্ভুত ভাব হয় এবং ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি নৃত্য করেন। ঐ বছরই ১৫ ভাদ্র আবার কিরণচন্দ্রকে মাতান

চাঁদের আখড়ায় যেতে দেখা যায়। আবার ২৪ পৌষ থেকে ২৭ পৌষ পর্যন্ত কদিন তিনি ওখানে গিয়ে মহা আনন্দে কাটিয়ে এলেন। মাতানচাঁদ কিরণচন্দ্রের গুরুভাই ছিলেন না অথচ তাঁকে তিনি যে কী ভাবে দেখতেন তা বোঝা যায় দরবেশজীর 'গানের খাতা' নামক সঙ্গীত পুস্তকের 'উপহার' পৃষ্ঠার লেখা থেকে; তিনি লিখেছেন, 'প্রাণের মাতান্! ভাই, সংসার দাবদগ্ধ প্রাণে সময় সময় তোমার নিকেতনে ছুটিয়া গিয়া যে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, আর কোথায়-ও তাহা পাইবার আশা নাই। কোন্ ক্ষুদ্র কাননে তুমি কী এক নবীন পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়া আপনার গন্ধে আপনি আমোদিত রহিয়াছ! তোমার ঐকান্তিকতা, তোমার প্রেম-প্রবণতা, তোমার মধুরতা এ সংসারে দুর্লভ। * * * তোমার ভালবাসায় মুগ্ধ, কিরণচাঁদ।' কিরণচন্দ্রের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন মাতানচাঁদ। বন্ধু সম্বন্ধে গোঁসাইজী বলেছেন, 'পুত্র অপেক্ষা-ও বন্ধু শ্রেষ্ঠ। পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনাৎ কিন্তু বন্ধু চিরদিনই বন্ধু, সর্বকাল সর্বক্ষণ বন্ধু। বন্ধুর স্বার্থ নাই, প্রয়োজন নাই; বন্ধুর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তৃপ্তিতে তৃপ্তি। * * * মতে মতে মিলন বন্ধুতা নহে। এক উদ্দেশ্য, এক প্রয়োজন, এক বানিজ্য—ইহা বন্ধুতা নহে। বাস্তবিক বন্ধু লাভ অসম্ভব হইয়াছে।' দরবেশজীর পরিণত জীবনে যখন তিনি সন্ন্যাসী এবং সদ্‌গুরু-সাধন দিতে শুরু করেছেন তখনো মাতানচাঁদের সহিত তাঁর বন্ধুতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এ বিষয়ে সদানন্দ মিত্র তাঁর শ্রীশ্রীদরবেশজী প্রসঙ্গ বইয়ে আলোচনা করেছেন। সরিপাবাদ আশ্রমে এলে দরবেশজী কাশিমপুরে মাতানচাঁদের আখড়ায় গিয়ে কদিন কাটিয়ে আসতেন। মাতানচাঁদের শিষ্যেরা-ও কখনো এসে সরিপাবাদে দরবেশজীকে কীর্তন শোনাতেন। এই বৈষ্ণবদের মারফত দরবেশজীর রচিত অনেক ভজন গান পূর্ববঙ্গের বাউল-বৈষ্ণবদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সদানন্দ মিত্র লিখেছেন যে দরবেশজী মাতানচাঁদ ও তাঁর সিদ্ধা মাতাজীর কাছে অনেক সাধনরহস্য অবগত হন। কিন্তু দরবেশজী মাতানচাঁদের কথা তাঁর শিষ্যদের কাছে বিশেষ কিছু বলতেন

না এবং এই গোঁসাইটির সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের মিশতে-ও দিতেন না। এ কথা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে দরবেশজী গোঁসাইগণের ভজনাঙ্গ হিসাবে বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত অষ্টপ্রহর নাম-সঙ্কীর্ত্তনের যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন সে ব্যাপারে মাতানচাঁদের আখড়ার অভিজ্ঞতা তাঁর কাজে লেগেছিল।

কিরণচন্দ্রের দাদার মৃত্যু সংবাদ তাঁর কাশীবাসিনী মায়ের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে খবর পাওয়া গেল যে মা ঐ দুঃসংবাদ জেনে শয্যাগত হয়ে পড়েছেন। ১৩০৬ সালের ১০ ফাল্গুন কিরণচন্দ্র মায়ের কাছে কাশী যাত্রা করলেন। ট্রেনে যেতে যেতে গুরুভাই জগদ্বন্ধু মৈত্র ও মহেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হল, ওঁরা দু'জনে-ও কাশী যাচ্ছেন। ১৩ তারিখ সকাল নয়টায় কাশী পৌঁছে কিরণচন্দ্র নিজেদের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন ভয়ানক শোকে মা শয্যাগতা। তিনি কদিনের অভুক্ত মাকে তুলে চান করালেন, দুধ ভাত খাওয়ালেন। শোকে মানুষ কী যন্ত্রণা পেতে পারে মা-কে দেখে তা বুঝতে পারলেন তিনি। কাশীতে সে সময়ে গোঁসাইজীর অনেক শিষ্য-শিষ্যা এসে জুটেছিলেন। শান্তিসুধা দেবী ছেলে-মেয়ে নিয়ে সেখানে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে-ই ছিলেন নবকুমার বিশ্বাস, অমৃতলাল সেন এবং মহেন্দ্র মিত্র। ১৪ তারিখ কিরণচন্দ্র শান্তিসুধার বাসায় গিয়ে সারাদিন থেকে খেয়েদেয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরলেন। ১৬ তারিখ আবার সেই বাসায় গিয়ে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হল। এদিন রাত্রে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন হল কিরণচন্দ্রের। ২৭ ফাল্গুন মৈত্র মশাই, মহেন্দ্র মিত্র ও কুলদানন্দ কিরণচন্দ্রের বাড়িতে এলেন। প্রায়ই শান্তিসুধার আস্তানায় সকলে একত্র হয়ে সৎপ্রসঙ্গে সময় কাটান। কিরণচন্দ্রের বড় শান্তিতে, বড় আনন্দে কাটে কাশীর সেই লোভনীয় দিনগুলি। যে কাম নিয়ে এত জ্বালা ভুগেছেন তা যেন আর নেই বললেই হয়। তাঁর মা-ও ক্রমশ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলেন। ৩ চৈত্র অমৃতলাল কিরণচন্দ্রের বাড়িতে এসে একটা ঘরে স্থান নিলেন।

৪ চৈত্র সারদাকান্ত এসে কাশী পৌছালেম। পরদিনই তিনি ও অমৃতলাল গোঁসাইজীর তিরোভাব তিথি উপলক্ষে পুরী রওনা হয়ে গেলেন। ১৩০৭ সাল এসে গেল। পুরো বৈশাখ মাসটা কিরণচন্দ্রের কাশী ধামেই কেটে গেল; দর্শনাদি করেন, গুরুভাইদের সঙ্গ করেন আর মায়ের কাছে তাঁর সান্ত্বনা হয়ে থাকেন। ৮ জ্যৈষ্ঠ মায়ের অনুমতি নিয়ে দেশে যাত্রা করলেন তিনি। মোগলসরাই থেকে পাঞ্জাব মেল ধরে সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে ৯ তারিখ হুগলী, নৈহাটী হয়ে চিটাগঙ্গ মেলে পোড়াদা। পোড়াদায় গাড়ি পাল্টে দামুকদিয়া তাঁর দিদির বাসায় এসে বিশ্রাম নিলেন কিরণচন্দ্র। ১০ জ্যৈষ্ঠ রাত্রে আবার যাত্রা শুরু করে ১১ তারিখ সন্ধ্যায় মাদারিপুরে যজ্ঞেশ্বর সেনের বাড়িতে রইলেন। ১২ জ্যৈষ্ঠ গোঁসাইজীর প্রথম তিরোভাব তিথি, এদিন সকালে গয়নার নৌকায় রওনা হয়ে বেলা বারোটায় খালিয়া ফিরে এলেন কিরণচন্দ্র। পরদিন তাঁর বাড়িতে সন্ধ্যাকীর্তন হল।

১৩০৭ সালের ৩ আষাঢ় এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে একদিকে যেমন কিরণচন্দ্র ও সরোজবালার দাম্পত্য জীবনের এক সুন্দর চিত্র প্রকাশিত অন্যদিকে তেমনি গোঁসাইগণের ভিতরে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারিক সম্পর্কের মধ্যে যে বিশেষ অনুশাসন প্রতিপালন করতে হয় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হল। কিরণচন্দ্র রোজ স্নান করে ভিজা কাপড় বাইরে মেলে দেন, পরিবারের আরও অনেকের কাপড় তেমনি সেখানেই শুকাতে দেয়া হয়। নিজের পরিধেয় সম্বন্ধে কিরণচন্দ্র খুব খুঁতখুঁতে, অন্য কেউ তাঁর কাপড় চোপড় ব্যবহার করে এ তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁর কাপড় শুকালে পরে অন্য যে কেউ হাতের কাছে পায়, তুলে নিয়ে পরে ফেলে। এ জন্য তিনি সরোজবালাকে অনেকবার হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন যাতে শুকানো মাত্র তাঁর ধুতি ঘরে তুলে রাখা হয়, অন্য কেউ নিয়ে পরতে না পারে। সরোজবালার অনেক সময় এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না, এ জন্য কিরণচন্দ্র বিরক্ত বোধ করেন। এদিন-ও সময়মত কাপড় তুলে না রাখার ফলে ভাইপো

অমলচন্দ্র তাঁর ধুতি নিয়ে পরেছে। আগে থেকেই কিরণচন্দ্র বিরক্ত হয়ে ছিলেন, আজ অমলকে তাঁর ধুতি পরতে দেখে এমন রাগ ধরে গেল যে সরোজবালার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ-ই অবশ্য তাঁর চৈতন্য হল, সরোজবালার প্রতি এই আচরণের জন্য অনুতাপ -ও হল তাঁর। কিন্তু রাগ করে যা করে ফেলেছেন তা আর ফেরাবার যো ছিল না। যা ঘটে গেল তা ক্রোধের বশেই বটে, কিন্তু কিরণচন্দ্রের আচরণের মধ্যে সরোজবালার প্রতি প্রেমের একটা অভিব্যক্তি-ও যেন খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি অমলচন্দ্রের প্রতি-ও নিশ্চয়ই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হল সরোজবালার উপরে—যাঁর প্রতি তাঁর সোহাগ ও শাসনের মধ্যে কোন দ্বিধার স্থান ছিল না। শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে! অথচ সরোজবালার প্রতি কিরণচন্দ্রের এ দিনকার ব্যবহারের মধ্যে ত্রুটি ও অশোভনতা নিশ্চয়ই ছিল, হয়ত সরোজবালা-ও আহত হয়েছিলেন তাঁর আচরণে। তাই রাত্রে কিরণচন্দ্র স্বপ্ন দেখলেন, গোঁসাইজী বলেছেন, 'আজ থেকে তোর লক্ষ্মী অন্তর্ধান হল।' ঘুম ভেঙ্গে তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার স্বপ্ন দেখলেন, মা যোগমায়া এসে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বলছেন, 'ভয় নেই, উনি রাগ করে বলেছেন। ও কিছু নয়, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার ও সরোজের জীবন সার্থক হবে।' উত্তরকালে দরবেশজী সাধনপ্রার্থীদের যে ক'টি উপদেশ দিতেন তার মধ্যে একটি হল, সাংসারিক সম্পর্কের মধ্যে ভাগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন করবে; স্ত্রী স্বামীকে নারায়ণ ও স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ্মী মনে করে পরস্পরকে সম্মান ও মর্য্যাদা দিবে। দরবেশ দর্শনের ১৫।৪৯ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী এ বিষয়ে আরও সুন্দর করে বলেছেন। শ্রীশ্রীদরবেশজী প্রসঙ্গ বইয়ে সদানন্দ মিত্র সরিপাবাদ আশ্রমের একটি ঘটনা উল্লেখ করে শিষ্যা কুমুদিনীকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করার জন্য কুমুদিনীর স্বামী যামিনীকান্ত ভৌমিককে দরবেশজী যা বলেছিলেন তা এ ভাবে লিখেছেন, 'আমার

কাছে ক্ষমা না চেয়ে, তোমার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাও। স্ত্রীকে সংসারে লক্ষ্মীর মত দেখতে হয়; স্ত্রীর অপমান আর লক্ষ্মীর অপমান এক-ই কথা।'

কিরণচন্দ্র যেমন ফাঁক পেলেই একবার কোন না কোন গুরুভাইয়ের কাছে গিয়ে ঘুরে আসতেন, গুরুভাইয়েরাও তেমনি মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসতেন। ১৩০৭ সালের ১২ শ্রাবণ বানরিপাড়ার গুরুভাই ললিতমোহন গুহ ঠাকুরতা কদিনের জন্য কিরণচন্দ্রের বাড়িতে এলেন। বৃন্দাবনে কিরণচন্দ্রের যখন সাধন হয় তখন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, সারদাকান্ত, কুঞ্জ গুহ ঠাকুরতা, সরলনাথ ও এই ললিতমোহন উপস্থিত ছিলেন। অনেকদিন একসঙ্গে গোঁসাইজীর আশ্রয়ে দু'জনে কাটিয়েছেন বলে তাঁদের খুব সম্প্রীতি ছিল। ১৩ শ্রাবণ ললিতমোহন প্রস্তাব করলেন যে সামনের ঝুলন পূর্ণিমায় গোঁসাইজীর জন্মোৎসব করলে ভাল হয়। শুনে খুব আগ্রহ ও উৎসাহ হল কিরণচন্দ্রের, তাঁদের বাড়িতেই এই উৎসবের আয়োজন করতে উদ্যোগী হলেন তিনি। মোটামুটি হিসাব করে দেখা গেল উৎসব করতে একশ'টাকার মত লাগবে। ভাইপো হলে-ও অমলচন্দ্র বয়সে বড়, দাদার মৃত্যুর পর তিনিই বিষয়-আশয় দেখাশুনা করেন, টাকাপয়সা-ও তাঁর হাতেই থাকে। কিরণচন্দ্র উৎসবের খরচের কথা অমলচন্দ্রকে জানাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেন। কিরণচন্দ্রের বেশি লাগল এই জন্য যে অমলচন্দ্র নিজে-ও গোঁসাইজীর কাছে সাধন পেয়েছেন, এ ব্যাপারে তাঁর বিরক্তি সত্যিই বেদনাদায়ক। কিরণচন্দ্র-ও প্রতিজ্ঞা করে অমলকে জানালেন; 'থাক্, তোমাদের সংসারের টাকা আর নেব না।' উৎসবের জন্য একশ'টাকা কর্জ করলেন তিনি। শতকরা মাসিক দু'টাকা সুদে। গোঁসাইজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের সমস্ত ব্যবস্থা হতে লাগল।

১৩০৭ সালের ২৫ শ্রাবণ, কিরণচন্দ্রদের খালিয়ার বাড়িতে উৎসব শুরু হল। এদিন রাত্রে অধিবাস; নিমন্ত্রণ পেয়ে বহু জায়গা থেকে গোঁসাইজীর অনেক শিষ্য এলেন, অন্যান্য ভক্তরা-ও এলেন। ২৬

তারিখ, ঝুলন পূর্ণিমা তিথি, সেদিন অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন। দুপুরে গোঁসাইজীর পটমূর্তির সামনে ভোগ নিবেদন করলেন কিরণচন্দ্র। নিয়মরক্ষা হিসাবেই নিবেদন করলেন তিনি; ভোগ দিলে ঠাকুর তা গ্রহণ করেন বা খেয়ে থাকেন এ সংস্কার তাঁর ছিল না। সরোজবালার সাধন লাভের পর সরোজেরই আগ্রহে গোঁসাইজী, যোগমায়া দেবী ও নামব্রহ্মদেবের পটমূর্তি স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের সংসারে। সরোজবালাই নিষ্ঠা-সহকারে রীতিমত সেবাপূজা করতেন, ভোগরাগ দিতেন। এ ব্যাপারে সরোজবালার কাজে কিরণচন্দ্রের সম্পূর্ণ সায় ছিল বটে, কিন্তু তিনি ভাবতেন এ সব সেবাপূজা নিম্নাধিকারীর জন্য। আগে কোন কোন দিন ঠাকুরের ভোগ দেয়ার পর বসবার আসনে পায়ের ছাপ কিংবা ভোগের সামগ্রীতে আঙুলের দাগ-ও কিরণচন্দ্র দেখেছেন। কিন্তু এ সব ঘটনাকে তিনি শ্রদ্ধা করতে পারেন নি, তাঁর সন্দেহ হত যে কেউ দুষ্টুমি করে ভোগের জিনিষে বা আসনে ও ও রকম দাগ বা চিহ্ন এমনিও করে রাখতে পারে। এই জন্মোৎসবের দিন দুপুরে তাই অন্য কেউ দুষ্টুমি করে ভোগ নষ্ট করতে পারে এই ভয়ে তিনি নিজেই ভোগ নিবেদন করে ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে দুয়ারের কাছে নাম করতে বসলেন। একটু পরেই তিনি কানে ডাক শুনলেন, 'কিরণ'! চমকে উঠলেন তিনি, এ তো সেই গোঁসাইয়ের গলা, দেহে থাকতে দরকার মত যেন তিনি যেমন করে ডাকতেন, অবিকল সেই ডাক। বিস্মিত বিরণচন্দ্র কী করবেন বুঝতে না পেরে ইতস্তত করছেন, আবার দ্বিতীয়বার সেই আহ্বান শুনতে পেলেন, 'কিরণ!' আর স্থির থাকতে না পেরে দরজা ঠেলে ঠাকুর ঘরে ঢুকে পড়লেন কিরণচন্দ্র। তিনি দেখতে পেলেন, গোঁসাইজী আসনে বসে আছেন, তাঁর খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ভোগের পাথরের থালায় ও বাটিতে সমস্ত খাদ্য জিনিষের অন্তর্ধান হয়েছে, থালায় ভোজন শেষের মেখে খাওয়ার দাগ রয়েছে শুধু। কিরণচন্দ্র ঘরে ঢুকতেই পাশে রাখা হাত ধোবার ডাবরের কাছে এঁটো হাত রেখে গোঁসাইজী তাঁর হাতে আচমনের

জল ঢেলে দিতে ইঙ্গিত করলেন। হাতে জল ঢেলে দেবার জন্য জল-পাত্র ধরলেন কিরণচন্দ্র—এইটুকুই তার খেয়াল ছিল। পরমুহূর্তেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

কিরণচন্দ্রের যখন জ্ঞান ফিরে এল তিনি দেখলেন, ঠাকুরঘরের এক কোণে তাঁকে সরিয়ে এনে তাঁর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেয়া হচ্ছে, সরোজবালা ও অন্য কজন গুরুভাই-ভগ্নী তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। তিনি ঝাঁ করে উঠে বসলেন, চেয়ে দেখেন ভোগের আসন থেকে গোঁসাইজী অন্তর্হিত হয়েছেন এবং যে সব ভোজনপাত্র একটু আগে তিনি খাদ্যশূন্য দেখেছিলেন সে সব কটিই যথারীতি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। বড় দুঃখিত ও ব্যাকুল হয়ে তিনি ঘরের সকলকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা কিছু দেখেছেন কিনা। সরোজবালা, কিরণচন্দ্রের ভাইঝি যিনি গোঁসাইয়ের কাছে সাধন পেয়েছিলেন, ললিতমোহন ও যজ্ঞেশ্বর সেন এই চারজন কিরণচন্দ্রের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর ঘরে ঢুকেছিলেন, তাঁরা সবাই গোঁসাইজীকে আসনে বসা দেখতে পেয়ে-ছিলেন। অন্য সবাই একটু পরে ঢুকেছিলেন এবং তাঁরা অভিনব কিছুই দেখতে পান নি।

গোঁসাইজীর দেহত্যাগের চৌদ্দ মাস পরে কিরণচন্দ্রের এই প্রথম গোঁসাইয়ের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হল। জন্ম ও জীবন সার্থক হয়েছে বলে মনে হল তাঁর। দরবেশজী বলেছেন, ভজনের দ্বারা সাক্ষাত দর্শনের বেগ ধারণ করার উপযুক্ততা লাভ করতে হয়। সমর্থ লোক না হলে হয়ত ভয় পেয়ে যাবে, তাই সাধনের অবস্থায় স্বপ্নে দর্শন-ই বেশি হয়, সাক্ষাত দর্শন খুব কম ঘটে থাকে। কিরণচন্দ্রের এই দর্শনের ঘটনা থেকে তাই বোঝা যায় যে সাধনের যে অবস্থায় সাক্ষাত দর্শনের সামর্থ্য আসে, এ সময় তাঁর সে অবস্থা লাভ হয়েছিল। এ দিনকার ঘটনা আর এক দিক থেকে-ও কিরণচন্দ্রের জীবনে, তাঁর ভজন পথে একটি নতুন উপলব্ধির সন্ধান দিল। এদিন থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন যে শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর ফটোমূর্তির সেবাপূজা মোটেই নিম্ন-

স্তরের নয়, বরং ধ্যান ধারণা অপেক্ষা বহুগুণে উচ্চাঙ্গের ভজন। উত্তর জীবনে দরবেশজী তাই লিখেছেন, 'এই অপূর্ব সেবা আমার চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। পূর্বে যাহা একান্ত ভাবে আমার বিশিষ্টা গুরুভগ্নীর-ই (সরোজবালার) অধিকার, কর্তব্য ও চিন্তার বিষয় বলিয়া মনে করিতাম, এখন তাহা নিবিড়ভাবে আমারই ভজন হইয়া গিয়াছে।'

ঝুলন পূর্ণিমা তিথির পরদিন ২৭ শ্রাবণ দুপুর পর্যন্ত নামসংকীর্তন চলল, পরে জলকেলী অনুষ্ঠান অন্তে কীর্তন সমাপ্ত হল। পরে মহোৎসব ও প্রসাদ বিতরণ। খিচুড়ী প্রসাদ উপস্থিত দূরাগত ভক্তগণ ছাড়া আরও বহু লোকে পেলেন। সন্ধ্যার দিকে ভক্তগণ অনেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। ২৮ শ্রাবণ উৎসব সমাপন হল। কিরণচন্দ্র সংকল্প করলেন গোঁসাইজীর এই জন্মোৎসব তিনি প্রতি বছরই অনুষ্ঠান করবেন। কিরণচন্দ্র ও পরে দরবেশজী এ সংকল্প বরাবর রক্ষা করে গেছেন। দরবেশজীর দেহত্যাগের পরে-ও তাঁর এ সংকল্প এ যাবত অটুট রয়েছে। খালিয়ায় ১৩০৭ সালে সে মহোৎসবের সূচনা, বারাণসী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠে সেই মহোৎসব এখনো শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর আশীর্বাদধন্য হয়ে দরবেশজী ও তাঁর অনুরাগী ভক্তজনের আনন্দ ও প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। এই প্রথম বছরের উৎসবের শেষে কিরণচন্দ্র লিখেছেন, 'ধন্য ললিতবাবু, যিনি প্রেরণা দিলেন। ধন্য ঠাকুর, অবিচারে দর্শন দিলেন!' এর সঙ্গে আর একটু যোগ করলে বোধহয় অসঙ্গত হবে না—ধন্য দেবী সরোজ-বালা, যাঁর অবিচল নিষ্ঠা ও সেবায় গোঁসাইজীর এই প্রত্যক্ষ আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

দরবেশজীর দেহত্যাগের পর এই ভোগ নিবেদনের অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ও দরবেশজীর বা গোঁসাইজীর সাক্ষাত দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কী ঘটেছে বা ঘটছে সে সম্বন্ধে একটা কৌতূহল অস্বাভাবিক নয়। ভোগ নিবেদিত হলে কাশীর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

মঠে গোঁসাইজীর জন্মোৎসবের কয়েক দিন ভোজ্যে আঙ্গুলের দাগ, কিছু কিছু নিবেদিত বস্তুর অন্তর্ধান প্রায় প্রতি বছরেরই ঘটনা, কৌতূহলী ভক্তগণ তা এখনো প্রত্যক্ষ করে থাকেন। মঠ ছাড়া-ও অন্যত্র ভোগ সমাপ্তির পর অনুরূপ দৃশ্য অনেকেই দেখে থাকবেন এবং থাকেন। এ ঘটনা এত নিয়মিত এবং এত স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে এতে কিছু অসাধারণত্ব আছে বলে আর মনে হয় না। এর মানে অবশ্য এ নয় যে এই চিহ্ন ভোগের বস্তুতে না দেখতে পেলেই বুঝতে হবে যে ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করেন নি, উপস্থিত ভক্তগণের এই রকম দর্শনের খুব আকাঙ্ক্ষা হলেই এ সব স্থূল চিহ্ন প্রকাশিত হয় বলে মনে করা যেতে পারে। দরবেশজীর আশ্রিতজনদের মধ্যে সাক্ষাত দর্শনের কথা জানার উপায় নেই বললেই হয়, কারণ যিনি এই অধিকার লাভ করেছেন তিনি তাঁর গুরুদেবের অনুশাসন মেনে সহজে কাউকে ওকথা প্রকাশ করে বলতে যাবেন না—বললে তার নিজেরও যেমন ক্ষতি হতে পারে, শ্রোতার মনে অবিশ্বাস এলে তারও ক্ষতি হয়। তবে কখনও আবেগে বা গুরু কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আগ্রহে কেউ কেউ এ সব দর্শনের কথা অনবধানে বলে ফেলেন। দরবেশজীর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা দেহে নেই তাঁদের মধ্যে বর্ধমানের অচ্যুতানন্দ রায় চৌধুরী একবার নিজেই বলেছিলেন যে খাটের উপর তাঁর সাধনের আসনে বসে তিনি মাঝে মাঝে-ই গোঁসাইজী ও তাঁর গুরুদেব দরবেশজীর দর্শন পেয়ে থাকেন—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শন, স্বপ্ন বা ধ্যান লব্ধ অতীন্দ্রিয় দর্শন নয়। নারায়ণদাসজী তাঁর সাধন লাভের সময় দীক্ষাদাতার আসনে গোঁসাইজীকে দর্শন করে অজ্ঞান হয়ে যান। সংসার জীবনে গোঁসাইজীর সাক্ষাত দর্শন আর পেয়েছিলেন কিনা তিনি বলেন নি, তবে দু'বার দরবেশজীকে উপলক্ষ করে গোঁসাইয়ের প্রত্যাদেশ শুনেছেন—পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে—এ কথা তিনি বলতেন। প্রথম বার, যখন তিনি কলকাতায় ডাক্তারী করেন তখন দরবেশজী শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ খানি ছাপাবার ব্যবস্থা করতে কলকাতা এসেছেন,

বিকেলবেলা নারায়ণদাসজী অর্থাৎ তখনকার ডাঃ নীরদ বর্মণ দরবেশজীর আবাসে তাঁকে দর্শন করতে যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। প্রত্যহ ডাক্তারীতে যে টাকা রোজগার হত দৈনন্দিন সংসার খরচের পরে উদ্বৃত্ত থাকলে তিনি একটা বাক্সে জমা করে রাখতেন, বেশ কিছু জমলে ব্যাংকে জমা করতেন। বেরোবার আগে কিছু টাকা নেবেন বলে সেদিন বাক্স খুলে দেখলেন, প্রায় দু'শ টাকা জমেছে—ব্যাংকে জমা দেবার সময় এসেছে। হঠাৎ তিনি পরিষ্কার স্বরে আদেশ শুনলেন, 'এর থেকে, একশ' টাকা দরবেশকে দিলে ভাল হয়, বই ছাপাতে ওর অনেক টাকা দরকার। দৈবাদেশে কোন সংশয় আসে না, নীরদেরও কোন সংশয় হল না যে কণ্ঠস্বর গোঁসাইজীর। তিনি একশ টাকা নিয়ে দরবেশজীর কাছে চলে গেলেন এবং প্রণাম করে টাকাটা তাঁকে দিলেন। নীরদ মাঝে মাঝে পাঁচ-দশটাকা দরবেশজীকে দেন, কিন্তু এদিন একশ টাকা দেখে বিস্মিত দরবেশজী বললেন, 'এত টাকা দিচ্ছ কেন?' নীরদ উত্তর দিলেন, 'আপনার বই ছাপাবার খরচের জন্য গোঁসাইজী দিতে বল্লেন।' শুনে দরবেশজীর চোখ সজল হয়ে উঠল, বললেন, 'আমার জন্য গোঁসাইজী নিজেই এখন ভিক্ষে করতে শুরু করেছেন!' গোঁসাইজীর আদেশ দ্বিতীয়বার শোনেন নীরদ বর্মণ কাশীতে, দরবেশজীর মঠে। তখন মঠে জন্মমহোৎসব, আশ্রম ভক্তে পরিপূর্ণ। ঠাকুর সেবার কাজে কোন অনিয়ম হয়েছে বলে দরবেশজী সেদিন দুপুরে উপোস করে আছেন, সবাই এজন্য বড় মনমরা। শিষ্য-শিষ্যাদের অনেক অনুরোধ, উপরোধ ও মিনতিতে-ও দরবেশজী উপবাস করার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। যে কজন শিষ্য শেষ পর্যন্ত না খেয়ে ছিলেন হাল ছেড়ে দিয়ে তাঁরা এবার প্রসাদ পাবার জন্য চললেন। নীরদ-ও ওদের একজন। তিনি প্রসাদ পেতে বসবার অব্যবহিত আগে মঠের মন্দিরে ঢুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করতেই স্পষ্ট বাণী শুনতে পেলেন, 'তেমন করে বল্লে কি আর দরবেশ না খেয়ে থাকতে পারে?' শোনামাত্রই নীরদের ভাবান্তর হল, ভাবের

আবেগে তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় সোজা দরবেশজীর বসার ঘরে এসে ঢুকলেন, ভাবের ঘোরে দরবেশজীর গলা হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমাকে খেতেই হবে, না বললে শুনছি না।' আগের অত সাধ্য সাধনায় যে সংকল্পে স্থির ছিলেন দরবেশজী, নীরদের এই অভিনব আচরণে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই যেন হার মেনে বললেন, 'খাব, খাব। নিয়ে এস প্রসাদ।' যথার্থ ভাবের মর্যাদা দিলেন ভাবগ্রাহী দরবেশজী। নীরদ বর্মণকে যাঁরা জানতেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে গোঁসাইজীর প্রেরণা ছাড়া নীরদের পক্ষে দরবেশজীর প্রতি এই অস্বাভাবিক আচরণ করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। অবশ্য নীরদের এই দু'বারের অভিজ্ঞতা সাক্ষাত দর্শনের নয়, সাক্ষাত শ্রবণের। দরবেশজীর দেহত্যাগের পর কয়েক বছর বাদে নীরদ নারায়ণদাসজী হয়ে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের দ্বিতীয় মহান্ত নির্বাচিত হন। তাঁর মহান্ত থাকার সময় দরবেশজীর সাক্ষাত দর্শনের দু'টি ঘটনা তিনি বলেছিলেন। প্রথম ঘটনা, মঠের এক জন্মমহোৎসবের সমাপ্তির দিন। ভক্তবৃন্দ নগর সংকীর্তনে বেরোবেন বলে মন্দিরের সামনে কীর্তন শুরু করেছেন, মহান্ত নারায়ণদাসজী তাঁদের মধ্যে দণ্ডায়মান, তিনিই নগরকীর্তনের আগে আগে যাবেন। বেলা সাড়ে চারটা প্রায় বাজে, এখখুনি কীর্তন রাস্তায় বেরোবে। ঠিক এমনি সময় মঠের পঞ্চায়েত সভার সদস্য সুবোধ বাড়ুজ্যে হঠাৎ অঙ্গনে এসে চেঁচিয়ে বললেন—কীর্তন পাঁচটার সময় মঠ ছেড়ে বেরোবে। মুহূর্তের জন্য নারায়ণদাসজী যেন একটু থমকে দাঁড়ালেন, পরক্ষণেই কীর্তনীয়া ভক্তদের হাতের ইশারায় আহ্বান করে নিজে অঙ্গন ছেড়ে পা বাড়ালেন, তাঁর পিছনে নগর সংকীর্তন সাড়ে চারটা নাগাদই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সেদিনকার অনুষ্ঠান শেষে রাত্রে নারায়নদাসজী বলেছিলেন যে সুবোধ এসে বাধা দেয়ায় তিনি যেই থমকে দাঁড়িয়েছেন অমনি দেখতে পেলেন দরবেশজী স্বয়ং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে তখখুনি বেরিয়ে পড়তে ইঙ্গিত করছেন, তিনিও

নির্দ্বিধায় কীর্তন নিয়ে রওনা হলেন। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা নারায়ণ-দাসজীর ঘটেছিল এমনি এক উৎসব উপলক্ষে—কাশীতে নয়, মেদিনী-পুর জেলার কান্তোড় গ্রামে, দরবেশজী প্রতিষ্ঠিত সাধন আশ্রমে। ১৩৬৬ সালে নারায়ণ দাসজী কাশীর মঠের মহান্ত রূপে এই উৎসবে যোগদান করতে এসেছিলেন। বৈশাখী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে অষ্টপ্রহর সংকীর্তন হল আশ্রমে—পরদিন সকালবেলা কীর্তন সহ সমস্ত গ্রাম পরিক্রমা করে এসে নারায়ণদাসজী আশ্রমের অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছেন, নামকীর্তনের সমাপ্তির পর জলকেলীর গান শুরু হল। আশ্রমের অঙ্গন কাঁচা, জল ঢালার ফলে সেখানে এত কাদা হয়ে গেল যে পা প্রায় ডুবে যায়। অঙ্গনে উদণ্ড কীর্তনের মধ্যে নারায়ণ-দাসজী নৃত্য করতে করতে সেই কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। দৃশ্যটি অভিনব ছিল, কারণ নারায়ণদাসজী সাধারণত মোটেই আবেগ-প্রবণ ছিলেন না, নৃত্য বা ধুলা বা কাদায় মাখামাখি করা করা তিনি যেন সযত্নেই এড়িয়ে চলতেন। তাঁর এদিনকার আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলে যে গ্রাম পরিক্রমার পর অঙ্গনে এসে কীর্তন আরম্ভ হতেই তিনি দেখতে পেলেন দরবেশজী সেই মণ্ডলীর মধ্যে নৃত্য করছেন ও মাটীতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন; তিনিও দরবেশজীর দেখাদেখি অমনটি করেছেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে যে দর্শনের কথা আলোচনা হল তা সাক্ষাত দর্শন সম্বন্ধে। স্বপ্নে যে দর্শন ঘটে তা-ও দর্শন বটে কিন্তু তা গোঁসাই-গণের মধ্যে, দরবেশজীর আশ্রিতদের মধ্যে এতই সুলভ যে তার উদাহরণ দিতে যাওয়ার চেষ্টা অনাবশ্যক। গোঁসাইজী বলেছেন, 'দর্শন দুইপ্রকার। মুক্তাবস্থায় দর্শন, আর মুক্তিপথে লইয়া যাইবার জন্য যে সময়ে দর্শন দেন।' আলোচ্য প্রসঙ্গের দর্শন অবশ্যই ঐ দ্বিতীয় প্রকারের দর্শন—স্বপ্নে দর্শন-ও এই পর্যায়ে পড়ে। গোঁসাইজী আরও বলেছেন, 'ভগবান দয়া করিয়া দর্শন দিলে তাহা দর্শন। আমার ইচ্ছামত ঐরূপ দেখিতে পাইব, তখনই প্রাপ্তি। যার যেরূপ

অন্তরের ইচ্ছা ও চেষ্টা তার তদ্রূপ হয়। দর্শন করিবার বলবতী ইচ্ছা না হইলে তাহা হইবে কেন?' মনে হয়, সাধকের দর্শন তাঁর নিজের সংস্কার ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ স্বভাবতই কম তাঁকে মুক্তি পথে নিয়ে যেতে গুরুদেব কোন দর্শনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন না। মুক্তাবস্থায় কিংবা সাধনের বিশেষ অবস্থায় যখন প্রাপ্তির অধ্যায়ে উন্নীত হন সাধক তখন যে দর্শন লাভ করেন তা সাধনেরই স্বতঃসিদ্ধ ফল--এ বস্তু আলোচনার বিষয় নয়। কিরণচন্দ্রের উত্তর জীবনে এ উভয় প্রকারের দর্শন-ই বারংবার ঘটেছে, ক্রমশ তা জানা যাবে।

গুরুভাই ললিতমোহন ৪ ভাদ্র তারিখে কিরণচন্দ্রের বাড়ি থেকে দেশে চলে গেলেন। এরই কদিন আগে ৩২ শ্রাবণ কিরণচন্দ্রদের পরিবারের বাৎসরিক মনসাপূজা। বংশরীতি অনুসারে বরাবর মনসা পূজায় পাঁঠা বলি হয়ে থাকে, কিরণচন্দ্র অনেকের আপত্তি সত্ত্বে-ও বলি বন্ধ করে দিলেন। এ নিয়ে পরিবারের মধ্যে ও প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল। গোঁসাইজী দেহে থাকতে কিরণচন্দ্র একবার তাঁকে বলেন যে সেবারকার পূজায় তাঁদের বাড়িতে জোড়া মোষ বলি দেয়া হয়েছে। শুনে গোসাইজী বলেছিলেন, 'এতে বড়ই অপরাধ হয়। মোষগুলোকে খুব যন্ত্রণা দিয়ে মারা হয় এবং লোকে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে; এ থেকে পৈশাচিক কাণ্ড আর কী আছে।' বলি বন্ধ করার সংকল্প তখনই নিয়েছিলেন কিরণচন্দ্র কিন্তু যতদিন দাদা বেঁচেছিলেন ততদিন এ সম্বন্ধে তাঁর ইচ্ছা বা আদেশ কার্যকর করার কোন উপায় ছিল না। মনসা পূজার কিছুদিন পর ১৩০৭ সালের ১৫ আশ্বিন পারিবারিক দুর্গাপূজায় সপ্তমী তিথি থেকে কিরণচন্দ্রের নির্দেশে বরাবরের পাঁঠা বলি-ও বন্ধ হয়ে গেল। এ নিয়ে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হল। পরিবারের প্রায় সবাই এমন কি গোঁসাইজীর কাছে দীক্ষিত ভাইপো অমলচন্দ্র-ও ভয় পেলেন, এ চিরাচরিত বলির প্রথা তুলে দিলে দারুণ অমঙ্গল ঘটবে বলে আশঙ্কা। কিরণচন্দ্র কিন্তু নিজে

অটল অনড় রইলেন তাঁর সিদ্ধান্তে। কিরণচন্দ্রদের কুলগুরু ছিলেন। কিরণচন্দ্র অন্যত্র 'দীক্ষা নিয়েছেন বলে তিনি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এখন পূজায় বলি বন্ধের ব্যবস্থা হতে তিনি বাধা দিলেন। কিরণচন্দ্রকে সংকল্পচ্যুত করতে না পেরে কুলগুরু রেগে অভিসম্পাত করে বললেন, 'ও নির্বংশ হবে, নির্ভূম হবে।' এ অভিশাপ শুনে কিরণচন্দ্র ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে বললেন, 'আমি আপনার অভিসম্পাত গ্রহণ করলাম।' কিরণচন্দ্রেব জীবনে এই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল কিন্তু তিনি একে আশীর্বাদরূপেই ববণ করে নিয়েছিলেন। আশ্চর্য এই যে এই ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে কাশী বাস করতে এসে যখন নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন, অনাহারে থাকতে বাধ্য হন তখন সন্ন্যাস নিয়ে কাশীধামে সদ্য আগত দরবেশজী তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দেন, দরবেশজীর কোলে মাথা রেখেই তিনি কাশীতে দেহত্যাগ করেন। যাই হোক, সপ্তমী পূজার দিন পাঁঠা বলি বন্ধ হতে সবাই এমনিতেই খুব ভয় পেয়েছিলেন তার উপর ওদিন রাত্রে কিরণচন্দ্রের ধুম জ্বর হতে অষ্টমী পূজার দিন সকালে বাড়িশুদ্ধ সবাই তাঁর শোবার ঘরে এসে জটলা করতে লাগলেন, এবার একটা মহা অঘটন না ঘটেই যায় না। কিরণচন্দ্র নির্বিকার, হেসে উড়িয়ে দিলেন সবার আশঙ্কা ও সাবধান-বাণী। একটু পরেই তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল ; পরামর্শদাতারা এত অল্পে তাঁকে রেহাই পেতে দেখে বোধ হয় তেমন খুশী হলেন না।

সংসারে থাকতে হলে একেবারে নির্লিপ্ত থাকলে চলে না। ১৩০৭ সালেয় ৯ ভাদ্র কিরণচন্দ্র তাঁদের রাজৈর কাছারীতে গেলেন। ১০ ভাদ্র কাছারীতে বসে প্রজাদের দরবার শুনতে হল তাঁকে। জমিদার কিরণচন্দ্রের এ সমস্ত বৈষয়িক কাজকর্ম এড়িয়ে গেলে চলবে কেন? তবে সুবিধার মধ্যে এই যে অমলচন্দ্র ভাইপো হলেও রয়সে তাঁর চেয়ে ঢের বড়, বিষয়সম্পত্তি তিনি-ই প্রায়শ দেখাশুনা করেন। কিছুদিন বাদে ১৮ পৌষ অমলচন্দ্রের সঙ্গী হয়ে মাদারিপুর কোর্টে যেতে হয় কিরণচন্দ্রকে। পেয়াদা বেদখল মকর্দমায় অমলচন্দ্র আসামী, কিরণচন্দ্র

তদারক করতে এসেছেন। অমলচন্দ্র অবশ্য খালাস পেলেন। এর মধ্যে ৪ আশ্বিন পরিবারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কর্তার আনুষ্ঠানিক সম্মান-ও গ্রহণ করতে হল কিরণচন্দ্রকে, বাড়ির সকলের আগ্রহে দোতলার ঘরে যে চৌকীতে তাঁর বাবা ও পরে তাঁর দাদা উত্তরাধিকার সূত্রে শয়ন করতেন তাঁকে সেই ঘর ও সেই চৌকী অধিকার করতে হল। সংসার কি ক্রমশ তাঁকে জড়িয়ে ফেলছে নাকি? দরবেশ দর্শনের ৯।২৫ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী বলছেন, 'বিষয় লইয়া অত্যধিক নাড়াচাড়া করিলে বিষয়ের নেশায় মানুষকে মাতাল করিয়া তুলে। * * * এই জন্য মাঝে মাঝে কাজকর্ম হইতে ছুট্ দিয়া কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে অন্যত্র গিয়া থাকিতে হয়। নিত্য সাধনের সময়ও বাড়াইতে হয়। নিয়মিত ভাবে একা একা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও একটু কীর্তন করিতে হয়। অর্থাৎ বিষয়ের আড়ম্বরের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আড়ম্বর-ও বাড়াইতে হয়। উহা না করিলে আধ্যাত্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে।' নিজের বৈষয়িক জীবনে কিরণচন্দ্র এই নীতি মেনে চলেছেন। তাই দেখা যায় ১৬ ভাদ্র গুরুভাই শ্রীধর তাঁর গ্রামে এসেছেন জেনে তিনি বনগ্রাম গিয়ে তাঁকে ও তাঁর ভাই বিহারীকে নিয়ে বাড়ি এলেন, কদিন তাঁদের নিয়ে পরমানন্দে কাটালেন। দুর্গাপূজার কদিন পরই তিনি ২৪ আশ্বিন আড়িয়ল গেলেন এবং সেখান থেকে ১ কার্তিক গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে গিয়ে যোগজীবনজী ও অন্যান্য গুরুভাইদের মধুর সঙ্গে ৬ তারিখ পর্যন্ত রইলেন। বিষয়ের আড়ম্বরের মোকাবিলা করতে ধর্মের আড়ম্বর অব্যাহত রাখতেন কিরণচন্দ্র। গেণ্ডেরিয়া থেকে জ্বর নিয়ে রওনা হয়ে ৭ কার্তিক বাড়ি ফিরলেন তিনি। যোগজীবনজী খালিয়া তাঁদের বাড়িতে আসতে রাজী হয়েছেন, এ জন্য তাঁর খুব আনন্দ। জ্বর ক্রমশ বাড়ছে, তবু ৯ তারিখ তিনি যোগজীবনজীকে তার করলেন যেন বজরা ভাড়া করে তিনি খালিয়া রওনা হন। ১০ কার্তিক কুইনিন খেয়ে কোনরকমে জ্বর ছাড়ালেন কিরণচন্দ্র; গুরুভাইয়েরা আসছেন, আর তাঁর অসুস্থ থাকা চলে না।

যোগজীবন গোস্বামী ও নবকুমার বিশ্বাস ভাড়া করা বোটে ঢাকা থেকে খালিয়া এসে পৌছালেন ১৩০৭ সালের ১৬ কার্তিক রাত্রে। স্বয়ং গোঁসাইজীর আত্মজ এবং গোঁসাইয়ের শিষ্যদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন যোগজীবনের শুভাগমন খালিয়ায় একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিরণচন্দ্রের আনন্দের আর সীমা রইল না। ১৭ কার্তিক খালিয়া থেকে ১৮ তারিখ যোগজীবনজী দল বেঁধে সেই বোটে করে বনগ্রাম রওনা হলেন; কিরণচন্দ্র-ও তাঁর সঙ্গী হলেন। ১৯ কার্তিক সকালে বোট ভাঙ্গায় এল, সেখানেই শ্রীধরের ভাই বিহারী ওদের সঙ্গে দেখা করলেন। বিহারীদের ঘাটে গিয়ে বোট বাঁধা হল। সবাই খিচুড়ী রান্না করে খেলেন সেখানে, চিংড়ি মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডালের খিচুড়ী। কিরণচন্দ্র এর অনেকদিন আগেই মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু যোগজীবনজীর ধমকে তিনি ও অন্য নিরামিষাশী গুরুভাই মতি ভূঁইয়া সেই মাছের খিচুড়ী না খেয়ে পারলেন না। রান্না করেছিলেন নবকুমার বিশ্বাস। সাধনের পর কিরণচন্দ্র যখন মাছ ছেড়ে দেন তখন তাঁর মায়ের অমত-ও তাঁকে টলাতে পারেনি, কিন্তু যোগজীবনজীর আদেশ লঙ্ঘন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হল। খাওয়া দাওয়ার পর আবার বোট যাত্রা। ১০ কার্তিক সকাল বেলা বনগ্রামে পৌঁছালেন সবাই। মতি ভূঁইয়ার বাড়িতে রান্নাবান্না করে খাওয়া হল। এদিনের পাচক বিপিন গুহঠাকুরতাকে সকলে মিলে একদিনের জন্য বাড়ুজ্যে মশাই বানালেন, ঐ নামেই ডাকলেন। ২১ কার্তিক বনগ্রামে থেকে ২২ তারিখ আবার খালিয়া যাত্রা, ঐদিন বোটেই মহোৎসব করলেন তাঁরা। ২৩ কার্তিক ভাঙ্গা হয়ে রাত্রিবেলা খালিয়া ফিরলেন যাত্রীরা, রাত্রেই অমলচন্দ্রের স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন যোগজীবনজী এবং একটু পরেই বোটে মাদারিপুরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। কিরণচন্দ্রের পায়ে একটা ঘা হয়েছিল, দারুণ ব্যথার জন্য তিনি যোগজীবনজীর সঙ্গে যেতে পারলেন না। কিন্তু অমন মধুর সঙ্গ ও আনন্দের আয়োজন ছেড়ে কি তাঁর মন টেকে?

২৪ তারিখ কিছুতেই আর থাকতে না পেরে কিরণচন্দ্র গায়ে জ্বর নিয়েও ছোট নৌকা করে যোগজীবনের বোট ধরার জন্য রওনা হলেন, রাস্তায় বোটের নাগাল পেয়ে নৌকা ছেড়ে দিয়ে আবার যাত্রীদলে যোগ দিলেন কিরণচন্দ্র ; কিসের জ্বর, কিসের পায়ে ব্যথা ! বিকেলে মাদারিপুরে যজ্ঞেশ্বর সেনের বাড়িতে এলেন সকলে, কিরণচন্দ্রের জ্বর দারুণ বেড়ে গেল সেই রাত্রে। ২৫ কার্তিক যোগজীবন সেই বোটে করে বানরি-পাড়া রওনা হয়ে গেলেন, কিরণচন্দ্র-ও কুছ্ পরোয়া নেহি বলে দলে ভিড়ে গেছলেন কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে সকলে মিলে নিষেধ করে তাঁকে আটকে দিলেন, ভাঙ্গা মন নিয়ে গয়নার নৌকায় দুপুর বেলা বাড়ি ফিরে এলেন কিরণচন্দ্র।

এই জ্বরে অনেকদিন ভুগলেন কিরণচন্দ্র, প্রায় পৌষ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। জ্বরের সঙ্গে পেটে অসুখ, বমি, বুকে পিঠে ব্যথা। ডাক্তারী চিকিৎসা চলল, ডাক্তারের ব্যবস্থায় ১৪ অঘ্রান থেকে আবার মাছের ঝোল খাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু দেহ ক্রমশ আরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। ২৪ অঘ্রান ডাক্তারের বদলে কবিরাজ ক্ষেত্রমোহন সেনের চিকিৎসা আরম্ভ হল। এইবার আস্তে আস্তে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ কমতে লাগল। এই মাসের মধ্যেই পুরীর সমাধি মন্দির তৈরীর জন্য তিন কিস্তিতে সাড়ে পাঁচশ টাকা যোগাড় করে পাঠালেন কিরণচন্দ্র। অনেকদিন পরে ১১ পৌষ বাড়ি ছেড়ে রামানন্দ দাস বাবাজীর সঙ্গে পাণ্ডাপাড়া গ্রামে ললিতা বৈষ্ণবীর আখড়ায় গিয়ে কীর্তনে আনন্দ করে পরদিন বাড়ি ফিরলেন তিনি। আবার ১৯ পৌষ অমলচন্দ্রের সঙ্গে মাদারিপুর কোর্টে হাজিরা দিয়ে সেখান থেকেই যজ্ঞেশ্বর সেনের সাথে চড়মুগুরিয়ার মাতাজীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন, বেশ মিষ্টি লেগেছিল মাতাজীর সঙ্গ। আগেই বলা হয়েছে যে ২৪ পৌষ থেকে ২৬ পৌষ তিনি মাতানচাঁদের আখড়ায় ছিলেন, সেখান থেকে ফেরার পথে ২৭ তারিখ রাজেশ্বরদী গ্রামের অনঙ্গ বৈষ্ণবীর আখড়ায় ঘুরে এলেন, ওখানে চরণ পালের পদাবলী কীর্তন তাঁকে

মুগ্ধ করেছিল। বাড়ি ফিরে আসায় কদিন পর ৫ মাঘ আবার জ্বরে পড়লেন কিরণচন্দ্র, ১২ তারিখ পর্যন্ত ভুগলেন। ৫ মাঘ আবার একটা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হল। ষ্টীমার কম্পানি গাঁয়ের খাল কেটে চওড়া করছিল, কিরণচন্দ্রদের দীঘির পাড়ে তাঁর ঠাকুরদাদার স্মৃতিতে যে মন্দির ছিল সেটি ভেঙ্গে পড়েছিল। কম্পানির লোক ভাঙা মন্দিরের ইট সরিয়ে ফেলছে খবর পেয়ে কিরণচন্দ্রকে ছুটে যেতে হল সেখানে। বকুনি দিয়ে লোকগুলিকে হটিয়ে দিলেন তিনি।

রেবতী রায় মশাই কিরণের স্বগ্রামবাসী ও গোঁসাইজীর শিষ্য। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে কলকাতা বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলেন কিরণচন্দ্র, তা আগেই বলা হয়েছে। ১৩০৭ সালের ২১ মাঘ রেবতীর স্ত্রী কিরণচন্দ্রের নামে মিথ্যা একটা দুর্ণাম প্রচার করলেন, রেবতী-ও তা বিশ্বাস করে কিরণচন্দ্রকে অভিযুক্ত করলেন। মিথ্যা কুৎসা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল কিরণচন্দ্রের, তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে পৈতা ছিঁড়ে অভিশম্পাত করলেন। বেশ কয়মাস পরে ১৩০৮ সালের ৫ বৈশাখ রেবতী বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্ত্রীর রটানো কুৎসা সর্বৈব মিথ্যা, কিরণচন্দ্রের কাছে এদিন ক্ষমা চাইলেন রেবতী। আরও কদিন পরে ৩ জ্যৈষ্ঠ পুরীর তিরোভাব সম্মেলনীতে গিয়ে রেবতী রায়ের স্ত্রী তাঁর গুরুদেব যোগজীবনজীর কাছে স্বীকার করলেন যে তিনি এতদিন খামখা কিরণচন্দ্রের নামে মিথ্যা কথা বলেছেন। রেবতী এই স্বীকারোক্তি শুনে কিরণচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। এ ধরণের মিথ্যে দুর্ণাম কিরণচন্দ্রকে জীবনে আরও অনেকবার সইতে হয়েছে; এমন কি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে-ও কেউ কেউ তাঁকে শেষ জীবনে এই ধরণের আঘাত দিয়েছেন। যথা সময় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ আসবে। এই প্রসঙ্গের ইতি-তে শুধু এ কথাই বলা যায় সাধনশীল জীবনে প্রারব্ধ ভোগ কেটে যাবার জন্য যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে পারে শারীরিক ভোগের মত এই সব মিথ্যা কুৎসার শিকার হয়ে মানসিক ভোগ-ও তার অন্যতম ব্যবস্থা। দরবেশ

দর্শনের ৯।৯৮ নম্বর পত্রাংশে অভিজ্ঞ সাধক দরবেশজী তাই বলেছেন, 'সংসারে চলিতে গেলে অনেক আঘাত পাওয়া যায়, ইহা তাহারই নমুনা। এইরূপ আঘাত খাইয়াই মানুষ যথার্থ মানুষ হয়।' আবার ১৭।২২ নম্বর পত্রাংশে লিখেছেন, 'মনে রাখিও, অপমানকর হীন কার্য না করিয়া ঘটনা বিশেষে লোকের নিকট গৌরবের হানিকর যে অবস্থা উপস্থিত হয়, উহা একটা প্রকাণ্ড ফাঁকী। এই ফাঁকীর ভয়ে অধীর হইবার কোনও আবশ্যক নাই।' অথচ প্রারব্ধ বা বিষয়ের সম্পর্ক জনিত এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এড়াবার-ও যে যো নেই সে কথা-ও বলেছেন দরবেশজী ১৪।৪১ নম্বর পত্রাংশে, 'যে দারুণ প্রারব্ধ লইয়া তোমরা দুই ভাই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই প্রারব্ধ ভুগিতেই হইবে। কাহারও সাধ্য নাই প্রারব্ধ শেষ হইবার পূর্বে তোমাদিগকে এই ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি দেয়। ঘরে বাহিরে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়াই তোমাদের ভোগ।" বলা বাহুল্য, কিরণচন্দ্রের এ সব অভিজ্ঞতা তাঁর প্রারব্ধ ভোগ জনিত-ই বটে। নিজের জীবন সম্বন্ধে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'উঠিতে বসিতে কেবল ঝাঁটা। ইহাই তাঁহার প্রেমের প্রথম পাঠ। আমার জীবন তোমরা কেহই জান না। যদি জানিতে তবে বুঝিতে পারিতে কত বেতের বাড়ি খাইয়াছি। যে আপমান মানুষের চরম তাহাও আমাকে সহিতে হইয়াছে।'

মাতানচাঁদ গোঁসাইয়ের প্রসঙ্গে এবং অন্যত্র দেখা গেছে যে কিরণচন্দ্র বাউলদের সঙ্গে বেশ মেশামেশি করতেন, ওদের উপর তাঁর কেমন যেন একটা টান ছিল। অথচ এই বাউলদের সম্বন্ধে গোঁসাইজীর সঙ্গে তাঁর খোলাখুলি আলাপ-ও হয়েছিল। গোঁসাইজী বলেছিলেন, 'আজকাল দেশে যে বাউল সম্প্রদায় আছে তাহারা কিছুই নয়। তারা অতি বীভৎস কাণ্ড করে থাকে। পূর্ব দেশে বাউল ও পশ্চিম বঙ্গে কর্তাভজার দল নষ্ট করল; এরা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীর ব্যাপার।" এ দু' দলের ভজনের ব্যাপার গোঁসাইজী ভালভাবেই জানতেন। কিরণচন্দ্র যখন গোঁসাইজীকে জানিয়েছিলেন

যে তিনি কী ভাবে তাঁদের অঞ্চলের কতগুলি বাউলের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন তখন গোঁসাইজী পরিষ্কার বলেছিলেন, 'তাদের কাছে যেয়ো না, গেলে ক্রমে হয়ত তোমার সমস্ত নষ্ট করে ফেলবে। প্রথম প্রথম কষ্ট হবে বটে, কিন্তু তা সহ্য করে থেকো। যেতে রাজী হয়ো না।' এ নির্দেশের পরেও কিরণচন্দ্র কেন যে বাউলদের আখড়ায় হামেশা যেতেন তা বুঝে ওঠা কঠিন। এটা অবশ্য ঠিক যে গোঁসাইজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে কিরণচন্দ্র সাধক হিসাবে নিরাপদ ভূমিতে পৌছেছিলেন, কাজেই যে আশঙ্কায় গোঁসাইজী বাউলদের কাছ থেকে তাঁকে তফাত থাকতে বলেছিলেন, সে ভয় আর তখন ছিল না। তবু কিরণচন্দ্র বিশেষ কারণ ছাড়া গোঁসাইজীর ইচ্ছার অমর্যাদা করেছিলেন, এ কথা ভাবা-ও সম্ভব নয়। বাউলদের সঙ্গ করে কিরণচন্দ্র আনন্দ পেতেন অবশ্যই, তা ছাড়া তাদের ভজন প্রণালীতে সহজিয়া ভাবের যে সংস্কারমুক্ত কতগুলো আচরণ আছে সে গুলো নিজের সাধনে লব্ধনিষ্ঠ কিরণচন্দ্রের কাছে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় বলে মনে হওয়াও আশ্চর্য নয়। অন্য সম্প্রদায়ের সাধকদের সঙ্গে মেলামেশার প্রসঙ্গে দরবেশজী দরবেশ দর্শনের ৫।১২ নম্বর পত্রাংশে তাঁর যে বক্তব্য বলেছেন তাতে দুটো কথা খুব তাৎপর্যপূর্ণ—যেমন, 'হুজুগ ও লজ্জাশীলতার গণ্ডী পার না হওয়া পর্যন্ত অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিবার অধিকার জন্মে না।' এবং 'যাহারা শাস্ত্র সদাচার অবলম্বন করিয়া আছেন, খুব পাকা না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের, উহার বিরুদ্ধবাদীদের অন্ন হজম হইবে না।' দরবেশজী অন্যত্র-ও বলেছেন যে নিজের সাধনে নিষ্ঠা না জন্মানো পর্যন্ত অন্য প্রণালী ধরে চলছেন এমন ধর্মার্থীদের সঙ্গে মাখামাখি করায় সাধকের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কিরণচন্দ্রের সাধকজীবনের আলোচ্যমান অধ্যায়ে তিনি বাউলদের সংস্পর্শে এসে কোনরকমে ক্ষতিগ্রস্ত হবার মত অবস্থায় ছিলেন না, বরং স্পষ্ট কারণ জানা না গেলেও তিনি যে ওদের সাহচর্যে সাধনের ও

ভজনের আনুকূল্য লাভ করতেন এ রকম অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত হবে না। তাই দেখতে পাওয়া গেল যে ১৩০৭ সালের তেসরা ও চৌঠা চৈত্র তিনি পুনরায় মাদারিপুরে যজ্ঞেশ্বর সেনের মধুর সঙ্গে কাটিয়ে ৫ চৈত্র যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে গিয়ে চরমুগুরিয়ার মাতাজীর আশ্রমে গেলেন, ওখানেই প্রসাদ পেলেন। চরমুগুরিয়া গিয়ে তাঁর সঙ্গে বরিশালের বেলদাখান গ্রামের গুরুভাই ক্ষিরোদ চক্রবর্তী, রাইচরণ দাসগুপ্ত এবং যোগেশ দাসগুপ্তের দেখা হল। ৬ চৈত্র ঐ গুরুভাইদের নিয়ে কিরণচন্দ্র খালিয়ায় চলে এলেন এবং ১৭ চৈত্র পর্যন্ত ওদের সঙ্গে বাড়িতে মহানন্দে কাটালেন। ১৯ চৈত্র ঐ তিনজন গুরুভাইকে স্টীমারে রওনা করিয়ে দিয়ে কিরণচন্দ্র ও যজ্ঞেশ্বর আবার গিয়ে ২১ তারিখ পর্যন্ত চরমুগুরিয়া মাতাজীর আশ্রমে বাস করে এলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গোঁসাইজীর শিষ্য চিরকুমার ক্ষিরোদ চক্রবর্তীর দাদা পতাকী চক্রবর্তী-ও গোঁসাইজীর শিষ্য ছিলেন এবং তিনি উত্তর কালে সদগুরু হিসেবে বহু প্রার্থীকে গোঁসাইজীর সাধন প্রদান করেছেন। গোঁসাইগণদের মধ্যে পতাকী পণ্ডিত মশাইয়ের কৃপাশ্রিতদের পরিচয় কেমন যেন অস্পষ্ট রয়ে গেছে কিন্তু ১৩৫২ সালে দরবেশজী কলকাতা অবস্থানের সময় বলেছিলেন যে পণ্ডিত মশাইয়ের শিষ্যেরা গোঁসাইজীর শক্তি লাভ করেছেন। বরিশালের কেওড়া গ্রামের অবিনাশ সেন গোঁসাইজীর শিষ্য ছিলেন। কেওড়ার ঠিক পাশের গ্রাম বেলদাখানে পতাকী পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ি। অবিনাশ সেনের স্ত্রী ও পুত্র সুধীর সেন পতাকী পণ্ডিত মশাইয়ের নিকট সাধন পেয়েছিলেন। অবিনাশ সেনের দেহত্যাগের পর সুধীর সেন তাঁর স্ত্রী লাবণ্যবালার সাধন প্রার্থনা করে দরবেশজীকে পত্র দেন এবং তাঁর অনুমতি পেয়ে লাবণ্যবালাকে ১৩৫২ সালের আষাঢ় মাসে কলকাতা আসেন ; সাধন-ও হয়ে যায়। লাবণ্যের সাধনের ঠিক পরদিন সকালে সুধীর দরবেশজীর দর্শনের জন্য ৪১ বনমালী সরকার স্ট্রীটের বাড়িতে এসে

তাঁকে প্রশ্ন করেন যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী একই নাম পেয়েছেন কিনা। উত্তরে দরবেশজী বললেন, 'তু'জনে একই নাম পেয়েছেন কিনা তা জেনে কী হবে, তবে আপনারা উভয়েই যে গোঁসাইয়ের শক্তি লাভ করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই।' যাই হোক, কিরণচন্দ্রের জীবনের এ পর্বটিতে গুরুভাইদের সঙ্গ এবং বাউলদের সঙ্গ এই তুটোই পর্যায়ক্রমে তাঁর অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। ১৩০৮ সালের ১৫ বৈশাখ তাই আবার দেখা যায় যে তিনি কুলপদ্দি গ্রামে বাউলদের মেলায় যোগদান করে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক সঞ্চয় করে এসেছেন।

ইতিমধ্যে পুরীতে গোঁসাইজীর সমাধি-ক্ষেত্রে আশ্রম নির্মাণের কাজ প্রায় সমাধা হয়েছে। সেখানে বিশেষ ভাবে উৎসবের আয়োজন করা হল এবারে। কিরণচন্দ্র ১৩০৮ সালের ২৬ বৈশাখ ঐ তিরোধান তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে পুরী যাত্রা করলেন, ২৮ তারিখ রাত ১২ টায় পুরী পৌঁছালেন তিনি। গোঁসাইজীর দেহত্যাগের পর তু'বছর তাঁর আসন ও গ্রন্থাদি নীলমণি বর্মণের ভাড়া বাড়িতেই রাখা হয়েছিল। ৩০ বৈশাখ তিরোধান সম্মেলনীতে সমবেত গোঁসাইজীর শিষ্যগণ কীর্তন করতে করতে সমাধি স্থান থেকে ঐ বাড়িতে এলেন। গোঁসাইজীর আসনে পদচিহ্ন ফুটে উঠল; সকলের সঙ্গে কিরণচন্দ্র-ও তা দর্শন করে কৃতার্থ হলেন। পয়লা জ্যৈষ্ঠ গোঁসাইজীর আসন, গ্রন্থ ও অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সমাধি-আশ্রমে নিয়ে আসা হল। বলতে গেলে পুরী জটিয়াবাবা আশ্রমের বাৎসরিক তিরোভাব-স্মরণ তিথির অনুষ্ঠান এবার থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হল। কিরণচন্দ্র ও পরে দরবেশজী গোঁসাইজীর দেহত্যাগের ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৩০৭ সাল থেকে তাঁর নিজের দেহত্যাগ ১৩৫৩ সাল পর্যন্ত সাতচল্লিশ বছরের মধ্যে মোট সাতবার পুরীধামের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই সমাধি-আশ্রমকে এবং তিরোভাব তিথির অনুষ্ঠানকে কী মর্যাদা দিতেন। শিষ্য-শিষ্যাগণের আগ্রহে তাঁদের কাতর মিনতিতে বিচলিত

হয়ে দরবেশজী যখন ১৩৪০ সালে কাশীধামে মঠ স্থাপন করতে রাজী হন তখন তাঁর মত পবিবর্তনের কারণ হিসাবে যে সমস্ত যুক্তি উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে একটি হল, 'পুরীতে জটিয়াবাবার মঠ না থাকিলে আমার নিজের মানসিক অবস্থা কী হইত যখন ভাবি, তখন আর তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র বাধা দিতে মন সরে না।' দরবেশজী তাঁর মরদেহে পুরীর আশ্রমের তিরোভাব সম্মেলনে সর্বশেষ যোগদান করেন ১৩৫২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। সেই তিথিতে তাঁর ডায়েরীতে তিনি লিখে-ছিলেন 'বেলা ৯টায় আশ্রমে গেলাম। রেবতীদাদা নাম গান করলেন। আনন্দময়ী মা প্রায় ৪০ জন নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন; স্টেশন থেকে একেবারে আশ্রমে। খুব আনন্দ হল। * * * বেলা ৪ টার পর এলাম। (পুরাতে তাঁর বাসস্থান, 'অক্ষয় ধামে'।) মাত্র একটু ঘোল খেয়ে এলাম। মালসা ভোগে প্রসাদ কিছু পেলাম॥ আজ আমার প্রাণের ঠাকুরের স্মরণ তিথি।' দরবেশজার এবারের পুরীবাসের সমাপ্তি হয়েছিল আষাঢ় মাসে, ইংরেজা ২ জুলাই ১৯৪৫। ঠিক আগের দিন তিনি শেষবারের মত সমাধি দর্শন ও দণ্ডবৎ করতে এসেছিলেন। এ সময়ে তাঁর যে মনের ভাব ও অনুভব হয়েছিল তা তাঁর সেদিনকার ডায়েরীর মন্তব্য থেকেই জানা যাবে, সমাধি আশ্রম তাঁর মনের কতখানি জুড়ে ছিল তা-ও স্পষ্ট হবে এ থেকে; তিনি তিনি লিখেছেন, 'সমাধি দণ্ডবৎ। ঠাকুর, আমার বাঁচা মরা অসুস্থ বা সুস্থ থাকা সব তোমার ইচ্ছামত করো। আমি নিজে যেন কোন ইচ্ছায়ই চলতে না চাই। আমাকে সম্পূর্ণ তোমার করে নাও। জয় আমার প্রাণের দেবতা। প্রণাম করে উঠেই সমাধির ভোগের এক কণা প্রসাদ পেলাম। ধন্য কৃপা।'

পুরীধামের স্মরণ তিথি অনুষ্ঠানের কদিন পর ১৩০৮ সালের ৮ জ্যৈষ্ঠ কিরণচন্দ্র রামেশ্বর-সেতুবন্ধ তীর্থের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারত যাত্রা করলেন। অমৃত সেনগুপ্ত, মতিলাল ভূঁইয়া, হরলাল ভূঁইয়া এই তিনজন গুরুভাই এবং হরলালের মাসীমা, বঙ্কুবাবুর স্ত্রী ও মতিলালের

বোন কিরণচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন। ৯ জ্যৈষ্ঠ যাত্রীদল ওয়ালটেয়ার পৌঁছে রাত্রে ট্রেন পালটে ১০ সকালে গোদাবরী এলেন। গোদাবরীতে স্নান ও খিচুড়ী রান্না করে খেয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। ১১ জ্যৈষ্ঠ প্রাতে গুড়ুড় এসে ধর্মশালায় বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়া সেরে ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ি ধরে রাণীগুণ্টায় গাড়ি পালটে শেষ রাতে আরকোনাম পোঁছালেন তাঁরা। ত্রিপতি ষ্টেশনে নেমে বালাজী যাওয়ায় যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, নানা কারণে তা বাতিল করতে হয়েছিল। পরদিন ১২ জ্যৈষ্ঠ সকালে সবাই কাঞ্জিভোরাম এলেন, ঐ দিন সন্ধ্যায় শিবকাঞ্চী দর্শন হল। মন্দিরে অপরূপ কারুকার্য, আরতির সময় আলোর বাহার। রাত্রিবেলা এক তেলেগু পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠান দেখে কিরণচন্দ্রের বেশ ভাল লাগল; বিয়েতে মেয়েরা সুন্দর গান করলেন। ১৩ জ্যৈষ্ঠ সকালে তীর্থযাত্রীর দল বিষ্ণুকাঞ্চাতে এসে বাসা ভাড়া করলেন। বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দির প্রকাণ্ড ও চমৎকার কারুকার্যময়, দোতলায় উঠে দর্শন করতে হল। বিরাট চতুর্ভুজ বিষ্ণুবিগ্রহ। সবাই খিচুড়ী প্রসাদ পেলেন। সেদিনই ট্রেনে করে রাত্রে চিঙ্গলিপেট এসে এক ছত্রে আশ্রয় নিলেন কিরণ-চন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা। পরদিন ১৪ জ্যৈষ্ঠ ঘোড়া গাড়ি করে পক্ষীতীর্থ রওনা হলেন তাঁরা। পথে নয় মাইলের মাথায় একটি শিব মন্দিরে দর্শন করে বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রায় এক মাইল সিঁড়ি বেয়ে পক্ষীতীর্থের পাহাড়ে উঠতে হল। পাহাড়ের উপর-ও শিবমন্দির। রোজ এখানে পক্ষীর ভোগ হয়, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। কিরণচন্দ্র দেখতে পেলেন ভোগ সাজিয়ে রেখে পুরুতঠাকুর পাহাড়ের উপরে জপে বসলেন; দু'টি সাদা পাখী' দেখতে অনেকটা চিল ও শকুনের মত, হঠাৎ উর্ধ্ব থেকে উড়ে এসে ভোগের পায়েসের থালায় বসে খেল। পরে আলাদা জলের থালায় রাখা জল খেয়ে পাখী দু'টি যেমন এসেছিল তেমনি উড়ে চলে গেল। কিরণচন্দ্র ও অন্যান্য দর্শনার্থী যাঁরা উপস্থিত ছিলেন ঐ পক্ষীর প্রসাদ পেলেন। স্থানীয়

প্রবাদ' শিব ও পার্বতী পক্ষীরূপে এসে ঐ ভোগ গ্রহণ করেন। প্রাচীনকাল থেকে প্রত্যহ এ রকম ভোগ হচ্ছে' কিন্তু দু'টার বেশি পাখী কখনও আসে না।

১৩০৮ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সকালে কিরণচন্দ্রদের দল কুম্বাকোনাম এসে পৌঁছালেন, একটি ছত্রে আশ্রয় নিলেন। এখানে কুম্ভকেশ্বর শিব দর্শন হল, কুম্ভকর্ণের কপাল সরোবরে স্নান ইত্যাদি সেরে রাত্রের ট্রেনে ত্রিচিনোপল্লী অভিমুখে পুনরায় যাত্রা। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ কাবেরী নদীতে স্নান করে রঙ্গজীর মন্দির দর্শনে গেলেন সবাই। রঙ্গজীর মন্দির প্রকাণ্ড, অনন্তশয্যায় শায়িত রঙ্গজীর শ্রীমূর্তি-ও প্রকাণ্ড। রাত্রে রঙ্গজীর ভোগমূর্তির বসন্ত বিহার ও দেবদাসীদের নৃত্য দর্শন হল, ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করলেন। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রাতের গাড়িতে মেড়ুয়া রওনা হয়ে ১৮ তারিখ ভোর বেলায় ওঁরা মেড়ুয়া এসে পৌঁছালেন। এখানে অপূর্ব কারুকার্য খচিত মাণাক্ষী মন্দির ও মীণাক্ষী মাতার মূর্তি দর্শন হল। ট্রেনের পথ এখানেই শেষ, এবার থেকে বাহন গরুর গাড়ি।

১৩০৮ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ দু'খানা গোযানে চেপে কিরণচন্দ্রদের দল রামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রথম পর্বে পনের মাইল এসে ত্রিভবন গ্রামে রান্না খাওয়া সেরে আবার বারো মাইল এসে রাত্রে মুতানন্দনে বিশ্রাম। ২০ জ্যৈষ্ঠ সকালের কিস্তিতে সতের মাইল এগিয়ে পুত্থকোটা এবং বিকেলের দিকে আরও আট মাইল গিয়ে পরমতরীতে এসে রাতের বিরতি। একুশ তারিখ সকালে বারো মাইল পথ চলে গন্নুর পৌঁছান গেল। মধ্যাহ্ন বিরামের দু' ঘণ্টার অবসরে স্থানীয় ধোপা তীর্থযাত্রীদের কাপড় ধুয়ে দিল। আরও দশ মাইল অতিক্রম করে রাত্রের বিশ্রাম হল রামনাথপুরায়। বাইশে জ্যৈষ্ঠ সকালে দশ মাইল গিয়ে নওপাখাল পৌঁছালেন যাত্রীদল, এখান থেকেই সেতুবন্ধের সেতু আরম্ভ কিন্তু প্রথম দিকের অনেকটা স্থানে স্থানে ভাঙ্গা। ভারত মহাসাগরে স্নান করলেন সবাই।

রাত্রিবেলা নৌকায় করে রামেশ্বর তীর্থের উদ্দেশ্যে রওনা, ২৪ মাইল খাড়ি পথে এসে নৌকা শেষরাত্রে নোঙ্গর করে রইল। তেইশে সকালে আরও ছয় মাইল নৌকায় করে গিয়ে রামনাথ পৌঁছান গেল। সেতুবন্ধের অতি পুরাতন, জীর্ণ পাথরগুলি দেখে অবাক হন কিরণচন্দ্র। রামনাথ থেকে আবার আট মাইল গরুর গাড়িতে গিয়ে রামেশ্বরের পাণ্ডা জগন্নাথ রামাইয়ার বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া গেল। ও দিন বিকেলেই দর্শন, প্রথমে গণেশ ও হনুমান, পরে রামেশ্বর শিবলিঙ্গ, পার্বতী মন্দির। এত দিনের দীর্ঘ পথের ক্লেশ ও শ্রান্তি সার্থক হল। রামেশ্বর বড় ভাল লাগল কিরণচন্দ্রের। ২৪ ও ২৫ জ্যৈষ্ঠ-ও রামেশ্বরে দর্শনাদিতে কাটালেন সবাই। ২৪ তারিখে হঠাৎ আগুন লেগে ওঁদের চোখের সামনেই রামেশ্বর সহরের অধিকাংশ পুড়ে শেষ হয়ে গেল। ২৬ জ্যৈষ্ঠ নৌকায় ১৪ মাইল ও পরে পায়ে হেঁটে ধনুক তীর্থে গেলেন কিরণচন্দ্র। লক্ষ্মণ এখানে ধনুর্বাণ দিয়ে সেতু ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সমস্ত পথটার স্থানে স্থানে বাঁধ—আবার সমুদ্র। ওখানে সমুদ্র স্নান সেরে চার মাইল হেঁটে পরে নৌকা পথে বেলা একটায় আবার রামেশ্বরে ফিরলেন তিনি। এতদিন বাদে মাখনের চিঠি পেয়ে তিনি জানতে পেলেন সরোজবালা ও তাঁর মা মাখনের সঙ্গে পুরী এসেছেন। সাতাশে জ্যৈষ্ঠ কিরণচন্দ্র রামেশ্বর মন্দিরের ২৪ কুণ্ডে স্নান করলেন, কোটী তীর্থের জল মস্তকে ধারণ করলেন। এবারে ফেরার পালা।

১৩০৮ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ রামেশ্বর থেকে গরুর গাড়িতে আট মাইল এসে রামনাথে খাড়ির মুখে পৌঁছালেন কিরণচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা, পরদিন খাড়ি পার হওয়ার নৌকা পাওয়া যাবে জেনে ওখানেই বিশ্রাম নিলেন সবাই। ২৯ তারিখ খবর পাওয়া গেল যে একটা ষ্টীমার আসার কথা আছে খাড়ির কাছে; শুনে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে সমুদ্রের তীরে এসে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলেন। দুপুর দেড়টা নাগাত কলম্বো ফেরত সত্যিই একটা ষ্টীমার এলো। ছোট

বোটে করে ষ্টীমারে গিয়ে উঠতে হল তাঁদের, বেশ কষ্টকর অভিজ্ঞতা। ষ্টীমার কিছুদূর এসে ঝড়ের জন্য নোঙ্গর করে রইল। ঝড়ের মধ্যে ষ্টীমারে বসে বড় কষ্ট পেলেন সকলে, কিন্তু উপায় কী? তা ছাড়া দিনের পর দিন গরুর গাড়িতে ভ্রমণের চেয়ে ষ্টীমারের যাত্রা অনেক নির্ঝঞ্ঝাট, সময়-ও অনেক কম লাগে। ৩০ জ্যৈষ্ঠ সকাল আটটায় ষ্টীমার আম্মাপট্টনে যাত্রীদলকে নামিয়ে দিল। বোটে চেপে মাইল দু'য়েক এসে তীরভূমি পাওয়া গেল, আরও দু'মাইল গরুর গাড়িতে গিয়ে ছত্র পাওয়া গেল, সেখানেই স্নান, আহার ও বিশ্রাম। ওদিন-ই রাত আটটায় গরুর গাড়ি ভাড়া করে আবার যাত্রা শুরু হল। সারারাত চলে ৩১ জ্যৈষ্ঠ সকাল আটটায় রাজমপট্টনে পৌঁছে তাঞ্জোরের রাজার ছত্রে বিশ্রাম সেরে আবার গোযানে ১২ মাইল এগিয়ে গিয়ে মুতুপেট ছত্রে রাত্রিবাস করলেন কিরণচন্দ্রের দল। ১৩০৮ সালের ১ আষাঢ় ভোরবেলা পুনরায় গরুর গাড়িতে যাত্রা করে বেলা দুটায় মায়াভরমে এসে গরুর গাড়ির পালা শেষ হল। ঐদিন রাত ১১টায় ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হলেন কিরণচন্দ্র ও তাঁর সতীর্থগণ।

১৩০৮ সালের ২ আষাঢ় মাদ্রাজ পৌঁছালেন কিরণচন্দ্র, রামস্বামীর ছত্রে আশ্রয় নিলেন। এই প্রথম ইলেকট্রিক ট্রামগাড়ি দেখতে পেলেন তিনি। সারাদিন ঘুরে মাদ্রাজের বাজার, চিড়িয়াখানা, ময়দান, গভর্ণমেণ্ট হাউস ও ফোর্ট ইত্যাদি দেখে বেড়ালেন সকলে। ওইদিন মাদ্রাজেই কাটল। ৩ আষাঢ় মাদ্রাজের বীচ স্টেশন থেকে বিকেল ৬টায় ট্রেন ধরে আবার যাত্রা আরম্ভ হল, সারারাত ট্রেনেই কাটল। ১৩০৮ সালের ৪ আষাঢ় বেজোয়াদা এসে ট্রেন থেকে নামলেন সবাই, পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এখানে হঠাৎ কিরণচন্দ্রের কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল, তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি হঠাৎ তাঁর মনে জেগে উঠল। বেজোয়াদা যেন তাঁর কত চেনা; স্টেশনের কাছে পাহাড়, তাঁর মনে পড়ল ঐ পাহাড়ের অপর ধারে একটা

গোঁফা আছে এবং সেই গোঁফায় তার আসন ছিল, পাথরের আসন। কিরণচন্দ্র তাঁর সেই পূর্বজন্মের স্মৃতি ও পূর্বজন্মের স্থানের কথা বলতে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে অমৃতলাল এবং অন্য একজন পাহাড়ের অন্য ধারে গিয়ে দেখে এলেন যে কিরণচন্দ্রের বর্ণনা মাফিক সত্যিই গুহা রয়েছে এবং গুহার ভিতরে আসন রয়েছে। কিরণচন্দ্র পূর্বজন্মে ফকীর ছিলেন এবং ঐ গুহার আসনে ভজন করতেন। দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে ১৩৫৩ সালের ৯ আষাঢ় দরবেশজী বলেছিলেন যে তিনি আগের জন্মে ফকীর ছিলেন এবং তাঁর সেই জন্মের ভজনস্থানে এখন-ও মেলা হয়, স্মরণোৎসব হয়।

কিরণচন্দ্রের এই বেজোয়াদা ভ্রমণ পর্বটি বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। সাধকের জীবনে পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে পড়া মোটেই বিচিত্র নয় কিন্তু সাধনে একটা বিশেষ অবস্থায় না পৌঁছালে এ ধরণের স্মৃতি নানা বিপত্তির কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। সাধন মার্গে একটা বিশেষ ভূমিতে উত্তরণের পরই কিরণচন্দ্র নিজের পূর্বজন্মের কথা নিজের সরাসরি অভিজ্ঞতার দ্বারা জানতে পারলেন। এ কথা-ও হয়ত বলা যায় যে শুধু এ অভিনব অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্যই তাঁর এবারকার তীর্থযাত্রা। কেননা ষ্টীমার পথে এই ফেরত যাত্রার ব্যবস্থা না ঘটলে তাঁদের বেজোয়াদা আসা হয়ত হয়ে উঠত না এবং রামেশ্বর থেকে রওনা হয়ে খাড়িতে পৌঁছাবার আগে পর্যন্ত ষ্টীমারে করে অন্য পথে ফিরে আসার পরিকল্পনা কিরণচন্দ্র বা তাঁর সঙ্গীদের ছিল না। বেজোয়াদার ঘটনায় কিরণচন্দ্র পুরীধামে তাঁর সম্বন্ধে গোঁসাইজীর যে ভবিষ্যৎবাণী ছিল, কিরণচন্দ্রকে আবার ফকীর হতে হবে, সে বিষয়ে-ও নিশ্চয়ই নিঃসংশয় হলেন। তবে কিরণচন্দ্রের এবারে ফকীর সাজার এখনও অনেক দেরী আছে। তিনি গোঁসাইজীর 'অপরূপ শ্রীগুরু রূপ' দেখেছেন, তাঁর তো এমনি এমনি ফকীর হওয়া চলবে না, 'ভবন-বন সমান' বোধ না হওয়া পর্যন্ত ফকীরের সাজের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। নিরাপদ ভূমিতে আরূঢ়, নিশ্চিন্ত কিরণচন্দ্র

তাই নির্ভাবনায় ভবিষ্যতের দিকে পা চালিয়ে এগিয়ে চললেন। তাঁর ধর্মলাভ হয়ে গেছে, তাই তাঁর ধৈর্যের-ও কোন অভাব নেই।

সাধকের জীবনে পূর্বজন্মের কথা জানার কোন অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা নেই, তবে কারোর কারোর হয়ত সাধনের কোন বিশেষ অধ্যায়ে পূর্বজন্মের বিবরণ জানা বা তার আভাষ পাওয়া কল্যাণ-দায়ক হয়ে থাকে। দরবেশজী তাঁর নিজের শিষ্য-শিষ্যাদের কাউকে কোন বিশেষ প্রয়োজনে তার পূর্বজন্মের কথা কখনও সুস্পষ্টভাবে, কখন-ও বা ইঙ্গিতে বলেছেন। দরবেশ দর্শনের ১২।৬ নম্বর পত্রাংশে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে তাঁর পূর্বজন্মের কথা বলেছিলেন। তেমনি ঐ গ্রন্থের ১৫।৪ পত্রাংশে মদন গোপাল তেওয়ারী যে পূর্বজন্ম ফকীর ছিলেন সে কথা দরবেশজী বলে দিয়েছেন। সবচেয়ে উল্লেখ্য পত্রাংশ হল ২০।১৮ নম্বরেরটি। এটিতে দরবেশজী শিষ্য শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তকে তাঁর পূর্বজন্ম সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবেই শুনিয়েছেন। এই পত্রাংশটির পেছনের কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করলে দরবেশজীর বক্তব্যের পুরো তাৎপর্য বোঝা যাবে। শন্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত দরবেশজীর অন্যতম শিষ্য নরেশচন্দ্র সেনের ছোট ভাই। নরেশ দানাপুরে রেলওয়েতে চাকুরী করতেন, শান্তি-ও সেখানে তাঁর সঙ্গে থেকে রেল ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ সিগ্‌নালারের কাজ করতেন। নরেশ বদলী হয়ে কলকাতার হেড অফিসে চলে এলেন, শান্তি তাঁর কর্মস্থল দানাপুরেই রয়ে গেলেন। নরেশকে এত ভালবাসতেন শান্তি যে ১৩৫২ যালে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় নরেশের কাছে চলে এলেন, দাদাকে ছেড়ে অন্যত্র থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় শীতলাতলা লেনের বাসাবাড়িতে নরেশের কাছে এলেন শান্তি, কিন্তু তার ধরণধারণ কেমন যেন অস্বাভাবিক। শান্তি সবসময় কম্বলের বহির্বাস পরে থাকতেন, প্রায়ই আসনে বসে সাধন করতেন। বাসাবাড়ির তিনতলায় দু'খানা ঘর নরেশের, ঘরের সামনে একখানি ঝুল বারান্দা, বারান্দার পরে লোহার শিকের অল্প

উঁচু রেলিং। রেলিং টপকে ওপারে একখানা পা রাখার মত কার্নিশ, তার পরই ফাঁকা—সেখানে থেকে পড়লে একেবারে একতলার বাঁধানো উঠান। একদিন রাত্রে—রাত প্রায় বারোটা—নরেশ একখানা ঘরে ঘুমিয়ে আছেন, অন্য ঘরটিতে শান্তি-ও ঘুমিয়ে; শান্তির ঠিক পাশেই বিছানা করে শোয় নরেশের মাসতুতো ভাই দরবেশজীর শিষ্য নন্তু। নন্তু কলেজের পড়াশুনা সেরে সেই রাত বারোটায় শুয়ে পড়বে বলে আলো নিবিয়ে বিছানায় বসে একটু নাম করে নিচ্ছেন; কারোরই মশারি নেই, হাওয়া আসছে বলে ঘরের দরজাটা হা করে খোলা। সেই সময়ে হঠাৎ ঘুমন্ত শান্তি তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলেন, কারো উপরে যেন রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন এবং চক্ষের নিমেষে খোলা দরজা দিয়ে ঝুল বারান্দায় গিয়েই রেলিং টপকে কার্নিশের উপরে দাঁড়ালেন। কিছু চিন্তা করার অবকাশ না পেয়েই নন্তু-ও যেন সম্মোহিতের মত শান্তির পেছন পেছন বেরিয়ে এসে বারান্দায় ছাতের একটা লোহার রড ও কার্নিশে দাঁড়ানো শান্তিকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠলেন। শান্তির তখনো চোখ বোজা, স্বপ্নের ঘোরে মানুষ যেমন হেঁটে বেড়ায়, তেমনি। নরেশ উঠে এলেন, শান্তিকে আস্তে আস্তে ঘরে নিয়ে আসা হল। জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন যে কালীঠাকুর নরেশকে মারতে এসেছেন দেখে তিনি কালীকে তাড়া করে নিয়ে গেছলেন। এতদিন শান্তির একটু অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গী অস্বস্তিকর হলেও ভয়ের কারণ ঘটে নি। এই ঘটনার পর নরেশ ও নন্তু দু'জনেই ওঁর জন্য বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁদের পীড়াপীড়িতে শান্তি তাঁর সে সময়কার মানসিক সব অবস্থা এবং বিচিত্র সমস্ত স্বপ্নের কথা জানিয়ে দরবেশজীকে দীর্ঘ এক পত্র দিলেন। একটি স্বপ্ন ছিল যে শান্তি যেন দরবেশজীকে কাঁধে নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছেন। শান্তির এই চিঠির উত্তরে-ই দরবেশজী পূর্বোক্ত চিঠিতে তাঁর পূর্বজন্ম সম্বন্ধে লেখেন। দরবেশজীর চিঠি পাওয়ার পর আস্তে আস্তে শান্তির

জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ হতে থাকে, তিনি আবার নতুন করে চাকুরী নিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে আসেন।

এ প্রসঙ্গে দরবেশজী যাঁদের দেহে থাকার সময়েই পূর্বজন্মের কথা জানিয়েছিলেন এমন কজনের কথা আলোচিত হল। কোন কোন শিষ্য-শিষ্যার দেহত্যাগের পর তাঁদের পূর্বজন্মের কথা দরবেশজী উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা আলাদা। দেহধারীকে তাঁর পূর্বজন্মের কথা শোনানোর মধ্যে অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্য থাকে এবং যাঁদের তা বলা হয় তাঁরাই এর উপকারিতা বুঝতে পারেন। দরবেশজীর মুখে শোনা ছাড়া-ও সাধনের বিশেষ স্তরে পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরূক হওয়া-ও দরবেশজী শিষ্য-শিষ্যাদের পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। তবে সঙ্গত কারণেই তাঁরা এ তথ্য প্রকাশ করে বলবেন না; অন্যের জানারও তাই কোন উপায় থাকে না।

বেজোয়াদার পর ১৩০৮ সালের ৫ আষাঢ় কিরণচন্দ্র ও তাঁর সহযাত্রীরা গোদাবরী এলেন, নদীতে স্নান করলেন। আবার যাত্রা শুরু করে তীর্থযাত্রা আরম্ভের ঠিক একমাস বাদে ৭ আষাঢ় পুরীধামে এসে যাত্রার সামাপ্তি হল। এক সপ্তাহ পুরীতে থেকে ১৪ আষাঢ় কলকাতা রওনা হলেন কিরণচন্দ্র, সঙ্গে সরোজবালা-ও ছিলেন। কলকাতা থেকে ২৪ আষাঢ় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে কাশী গেলেন কিরণচন্দ্র। শ্রাবণ মাসের শেষে খালিয়ার বাড়িতে ফিরে এলেন। ইতোমধ্যে কিরণচন্দ্রের লতা সাধনের নির্দিষ্ট তিন বছর পূর্ণ হয়ে গেছে; ১৩০৫ সালের ১৮ আষাঢ় গোঁসাইজী এ সাধন দিয়েছিলেন ১৩০৮ সালের ১৭ আষাঢ় সাধনের মেয়াদ শেষ হল। ১৩০৮ সালের ৩ ভাদ্র কিরণচন্দ্র আবার তাঁর পত্নীর সঙ্গে খালিয়ার বাড়িতে এক বিছানায় শয়ন করলেন, স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে এলেন দুজনে। গোঁসাইজীর কথা অনুযায়ী কিরণচন্দ্র এই তিন বছরের মধ্যে 'নূতন মানুষ' হয়ে গেছলেন, নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই নূতন মানুষ হওয়া সম্পূর্ণই অন্তর রাজ্যের ঘটনা, বহিরঙ্গ দিক দিয়ে

কিরণচন্দ্রের জীবনযাত্রায় যে একটা চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটল, সে কথা ঠিক নয়। তাঁর এবং সরোজবালার ব্যবহারিক জীবনে বরং এই আগের তিন বছরে যে একটা ছাড়াছাড়ি ভাব ছিল, এখন তা ঘুচে গেল। সাংসারিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে-ও কিরণচন্দ্র উদাসীন হয়ে পড়লেন না, অন্যথায় দেখা যাবে যে তিনি এর পর থেকেই ক্রমশ বৈষয়িক কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন, সার্থক সংসারী হয়ে উঠলেন। স্বামী-স্ত্রী রূপে কিরণচন্দ্রের ও সরোজবালার মধ্যে পারস্পরিক টান কেমন ছিল তা দরবেশজী দরবেশ দর্শনের ১০।৭৩ নম্বর পত্রাংশে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন যে বরিশালে যখন তিনি কারবার নিয়ে ছিলেন অর্থাৎ ১৩১০ সালের পরে কোন সময়—তখন সরোজ-বালাকে দেখবার জন্য ভোরে বরিশালে ষ্টীমারে চেপে সন্ধ্যাবেলা মাদারিপুর পৌঁছে বাইশ মাইল নৌকা চড়ে রাত বারোটায় খালিয়ার এসে মাত্র চার ঘণ্টা সরোজবালার সঙ্গে কাটিয়ে পরদিন সকাল চারটায় আবার বরিশাল রওনা হয়ে গেছেন। মাত্র ঘণ্টা চারেক স্ত্রী সরোজবালার সন্নিধ্যে থাকার আকর্ষণে কিরণচন্দ্র ছত্রিশঘণ্টা ষ্টীমার ও নৌকা ভ্রমণ করেছেন। উপসংহারে দরবেশজী যা বলছেন তা বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর; বলছেন, 'এ রূপ হয়, এবং যার হয় তার লজ্জা পাবার কিছুই নেই। এই প্রেম সম্পূর্ণরূপে ভগবানের বিধিসম্মত।' কিরণচন্দ্রের বরিশাল বাসের পরের অধ্যায়ে সরোজ-বালাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে পরিপূর্ণ সংসার-ই পেতেছিলেন তিনি। এজন্যই তিনি পরবর্তী জীবনে বলতে পেরেছেন, 'স্ত্রীর উপর এই যে স্বাভাবিক ও সরল প্রাণের টান, এ জন্য তোমার লজ্জার কী আছে? এই তো স্বাভাবিক! প্রিয়জনদের সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসাই ভগবানের অভিপ্রেত।'

দরবেশজী তাঁর দেহত্যাগের কদিন আগে ১৩৫৩ সালের ৪ আষাঢ় কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর জীবনীর উপকরণ হিসাবে তিনি নোট লিখে রেখে গেলেন, ঐ নোট নিয়ে সমীক্ষা করলে

জীবনী রচনা সম্ভব হতে পারে। এর ঠিক আগের দিন ৩ আষাঢ় তিনি তাঁর সন্ন্যাসোত্তর জীবনের নিপুণভাবে লিখিত ও রক্ষিত বত্রিশ বছরের ডায়েরীগুলি বস্তাবন্দী করে যোগানন্দজী ও গোবিন্দানন্দজীকে দিয়ে কাশীর গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে কোন কারণেই হোক ইংরেজী ১৯৪৫ সালের ডায়েরীটি আলাদাভাবে তাঁর শোবার ঘরে ছিল বলে বেঁচে গেছে। ওই ডায়েরীটা থেকে বোঝা যায় যে তিনি প্রতিদিনই ডায়েরীতে মন্তব্য লিখতেন, এই সব মন্তব্যের ধরণ সম্বন্ধে-ও একটা ধারণা করা অসুবিধা হয় না। এই সব মন্তব্য এক দিকে যেমন দরবেশজীর সামগ্রিক মনোভাবের প্রকাশক অন্যদিকে তাঁর দৈনন্দিন মুড্-ও এর দ্বারা সুন্দরভাবে ধরা যায়। কেন যে তিনি তাঁর এত বছরের মানস-ইতিহাসের এই দলিলগুলো নষ্ট করে ফেললেন তার উত্তর পরোক্ষভাবে পাওয়া যায় দরবেশ দর্শনের ১০।২৮ নম্বর পত্রাংশে। এখানে তিনি লিখেছেন যে নিজেই তিনি খুব খোলাখুলি ভাবে আত্মজীবনী লেখা শুরু করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ একদিন গোঁসাইজী স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাঁকে বললেন যে 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে।' এর ব্যাখ্যা করে গোঁসাইজী আরও বললেন, 'যথার্থ বা যথাযথ এবং সত্য এ দুটি এক জিনিস নয়। তোমার জীবনের যথাযথ ঘটনা দ্বারা লোকের নভেল পড়ার সখ মিটিতে পারিবে, কিন্তু সমাজের ক্ষতি ছাড়া কল্যাণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।' একথা নিশ্চয়ই অনুমান করা যায় যে দরবেশজীর যে সব ডায়েরী গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেয়া হয়েছিল, তাতে তিনি নিজেকে যথাযথ রূপেই প্রকাশ করেছিলেন। ওগুলো থেকে হয়তো নভেল পড়ার স্বাদ পাওয়া যেত কিন্তু ধর্মজীবন গঠনের যে মালমশলা তাঁর জীবনে প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই ছড়িয়েছিল তা কতকগুলো যথাযথ ঘটনার সঙ্গে মিশে গিয়ে হারিয়ে যাবার ভয় ছিল। বরং ডায়েরীর অনেক সংক্ষিপ্ত মন্তব্য যথোপযুক্ত ব্যাখ্যার অভাবে বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ায় আশঙ্কা ছিল, আত্মজীবনীর চাইতেও ও জিনিস ক্ষতিকর হত।

কাজেই যে নির্দেশে তিনি আত্মজীবনী লিখতে গিয়েও থেমে গেছলেন, সেই বিবেচনায়ই তিনি ডায়েরীগুলি দেহত্যাগের আগেই নষ্ট করে ফেলেছিলেন। দরবেশজী নিজেই তাঁর শিষ্য দেবীচরণ মণ্ডলকে ডায়েরী বিসর্জনের অব্যবহিত পূর্বে এইরকম কথাই বলেছিলেন।

দরবেশজীর স্বহস্ত লিখিত যে নোটের কথা তিনি বলেছেন তার নাম দিয়েছিলেন তিনি, 'মদীয় জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলীর পঞ্জিকা।' এই পঞ্জিকায় তাঁর হাতের লেখা মন্তব্য তিনি অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন, অর্থাৎ ১৩০৮ সালের ৩ আষাঢ় তারিখের পরের আর কোন ঘটনা ঐ খাতায় তিনি নিজে লিখে রেখে যান নি। তেসরা আষাঢ় তারিখটি লক্ষ করা প্রয়োজন, কারণ এর ঠিক ৪৫ বছর বাদে ঠিক ঐ তারিখেই তিনি 'পঞ্জিকা'র একমাত্র উপকরণ ডায়েরীগুলি বিসর্জন দিয়ে দিলেন। ১৩০৮ সানে ৩ আষাঢ় কিরণচন্দ্রের বয়স ছিল তেইশ বছরের সামান্য কিছু কম, তাঁর মরজীবনেরর বাকী পয়তাল্লিশ বছর সন-তারিখ মিলিয়ে যথাযথ জীবন-পঞ্জিকা তিনি লিখে রেখে যান নি, আর কারও পক্ষে তা লিখতে হলে যে উপচার দরকার হত তা-ও তিনি ইচ্ছে করে নষ্ট করে দিয়ে গেলেন। এ থেকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে কিরণচন্দ্রের এই শেষের পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবন কথা যথাযথ ঘটনা অনুসারী হোক, এ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তাঁর জীবনের প্রথম তেইশ বছর সন-তারিখ নির্দিষ্ট, ঘটনা-নির্ভর; তাঁর শেষের পঁয়তাল্লিশ বছর বহুলাংশে তথ্য-নির্ভার ঘটনা-নিরপেক্ষ। প্রথম জীবনে তাঁর ঘটনায় জীবন, পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর সম্বন্ধে যা জানার তা জীবনের ঘটনা। প্রথমটায় সব যথাযথ, দ্বিতীয়টিতে যথার্থের অতীত যা সত্য তারই প্রতিভাস। মোটামুটি বলা চলে যে প্রথম তেইশ বছরের ঘটনার স্রোতে কিরণচন্দ্রের জীবন ভেসে চলেছিল, এর পর থেকে তাঁর জীবন প্রবাহ দুর্বার গতিতে এমনিতেই বয়ে চলেছে বিশেষ বিশেষ ঘটনা সেই স্বাধীন প্রবাহে কখনো কখনো যেন বুদবুদদের মত ভেসে উঠেছে এবং চোখে পড়েছে। এ মন্তব্য করার

পেছনে যুক্তি আরও আছে। ১৩০৫ সালের ৩০ চৈত্র পুরীধামে গোঁসাইজী কিরণকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট সাধন করে গেলেই তিন বছর পরে নূতন মানুষ হয়ে যাবেন। এই নির্দিষ্ট সাধন বলতে সদ্‌গুরু সাধকের নিয়মিত নাম সাধন ছাড়াও কিরণচন্দ্রের ক্ষেত্রে গোঁসাইজী প্রদত্ত লতাসাধন-ও ধরতে হবে। কিরণচন্দ্র লতাসাধন লাভ করেন ১৩০৫ সালের ৮ আষাঢ়; ১৩০৮ সালের ৩ আষাঢ় ঐ তারিখ থেকে তিন বছর পূর্ণ হতে মাত্র কদিন বাকী ছিল। প্রসঙ্গক্রমে আগেই আলোচনা হয়েছে যে এই তিন বছরের মধ্যেই প্রথমত কিরণচন্দ্রের প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হওয়ায় বাঞ্ছিত অবস্থা লাভ হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত তাঁর সাধকজীবনের প্রবলতম রিপু কাম-ও এই সময়ের মধ্যে প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এইটুকুই কি সব? তাঁর আভ্যন্তরীণ অবস্থার আরও পরিবর্তন হয়েছিল এ এ সময়ের মধ্যে এ ধারণা করা মোটেই অসঙ্গত হবে না যদি গোঁসাঈজী কথিত 'নূতন মানুষ' কথাটির তাৎপর্য বিচার করে দেখা যায়। ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসে—যখন থেকে তিনি তাঁর জীবনের ঘটনাবলীকে আর সন-তারিখের বাঁধনে জড়িয়ে রাখতে চান নি —কিরণচন্দ্র এমন নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন যে পরে তাঁর প্রত্যহের সামগ্রিক জীবনে যা কিছু ঘটেছিল সেগুলোকে আর নিছক ঘটনা বলে ভাবতে পারেন নি, সবগুলো তাঁর ঠাকুরের, তাঁর প্রিয়তমের বিধান বা দান বলে বুঝতে ও মেনে নিতে শিখেছিলেন। এই অনুভবের বা প্রত্যয়ের ভূমিতে পৌঁছে গেলে সাধক আর জীবনের কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে তাৎপর্যহীন বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারেন না। সাধকের সমস্ত জীবনটাই এই পর্যায়ে একটি কৃপার আধার হয়ে দাঁড়ায়; কৃপার কোন ছোট-বড় নেই, কৃপা হয়ে যা কিছু আসে সবই পরম প্রাপ্তি, কৃপা হয়ে যা কিছ ঘটে সমস্তই অখণ্ড সত্য। এই অখণ্ড সত্যের অনুভবকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমন্বয় বলা যায় না; আপাত-বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে-ও সাধকের এক

অখণ্ড বোধের প্রত্যয় থাকে। কিরণচন্দ্র-ও তাঁর তেইশ বছর বয়সের পরের জীবনের কোন লিখিত ইতিহাস রক্ষা করে যা নিনি। তাঁর সাধন জীবনের দিক থেকে দেখতে গেলে এ ধরণে 'পঞ্জিকা' রচনা হয়ত সত্যের অপলাপ হত।

এ আলোচনা থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রথম তেইশ বছরের যে পাঁজি তিনি লিখে গেছেন, তাতে বর্ণিত ঘটনাবলী কি তবে তাৎপর্যহীন এবং যথাযথ ঘটনা বলে কি সেগুলো অসত্য? এর সহজ উত্তর এই যে সাধক কিরণচন্দ্র তাঁর সাধন জীবনের যে পর্বে উত্তরণ করে জীবনের সত্যকে জানতে পারলেন বা বুঝতে শিখলেন সেই পর্ব থেকেই তিনি তাঁর অভ্যাস বদলে দিয়েছিলেন; যে সময়কার ঘটনাকে তিনি নিজেই ঘটনা বলে জানতেন ও ভাবতেন অবস্থা লাভের পরে তখনকার কোন কিছুর পরিবর্তন করতে গেলে তার আচরণকে ইতিহাসের পুনর্লিখনের মত অসাধু আখ্যা দেয়া যেত হয়ত। দ্বিতীয়ত; খাঁটি ও সার্থক সাধক কিরণচন্দ্র জানতেন, সাধক জীবনে আদর্শ হিসাবে গুরুদেবের জীবন চরিত্রের মূল্য কত অপরিসীম। তাঁর নিজের সাধন জীবন অর্থাৎ জীবনের যে অধ্যায় পর্যন্ত সাধন-ভজনকে তিনি ধর্মজীবন লাভের হাতিয়ার বলে জানতেন সেই সময়কার তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ অন্য সাধকের কাজে লাগবে বলে জেনেই তিনি বেশ নিপুণভাবে তা রক্ষা করে গেছেন। তাঁর জীবনের পরবর্তী সাধনোত্তর পর্বে যা ঘটেছে তা অন্য কোন সাধকের পক্ষে প্রচলিত অর্থে আদর্শ হতে পারে না কেননা সে জীবনটা প্রায় সম্পূর্ণই অনুভবের জীবন—যাকে অনুকরণ করা বা অনুসরণ করা সম্ভব নয় কারোর পক্ষে। এ জীবনকে অনুধাবন করা যায় কিন্তু তা যিনি পারেন তিনি সমপ্রাণতার স্তরে উন্নীত হয়েই পারেন, এজন্য ঘটনায় মালা গাঁথা দরকার হয় না। এই জন্যই কিরণচন্দ্রের তেইশ বছর বয়স থেকে তাঁর আটশট্টি বছরের মরজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে টুকরা টুকরা ঘটনার বিবরণ কথা-প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করে বলেছেন তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের চেয়ে আধ্যাত্মিক

তাৎপর্য ধরেই বোঝার চেষ্টা করা দরকার বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থে এ যাবত যে মোটামুটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গেছে নির্ভরযোগ্য উপকরণের স্বল্পতার জন্য তা আর করা সম্ভব হবে না। এখন থেকে কিরণচন্দ্রকে জানতে গিয়ে নিছক তথ্যের চাইতে বিচার-লব্ধ সত্যের উপরে, তত্ত্বের উপরে বেশি নির্ভর করতে হবে। দরবেশজী বলেছেন তাঁর জীবনীর জন্য research বা সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। এই সমীক্ষার দরকার হবে এখন থেকে প্রতি পদে পদে। সৌভাগ্যের কথা, তাঁর বিপুল পত্রাবলীর মধ্যে এই সমীক্ষার অজস্র মালমশলা ছড়িয়ে আছে। এখানে একটা কথা পরিষ্কার বলে নেয়া দরকার, যে সত্য সন্ধানের প্রয়াস বর্তমান আলোচনায় করা কথা হচ্ছে তাতে বিচারের সাহায্য নেয়া হবে বলে প্রমাদের যথেষ্ট আশঙ্কা থেকে যাবে, নিঃসন্দেহ। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে যে সত্য লাভ হয় সে সত্য নিছক বিচার বুদ্ধিতে সবসময় মেলে না। তবে বিচার-লব্ধ সত্য-ও সত্য কারণ অন্যান্য বিচারশীল সাধকের বিচারবোধকে উদ্দীপ্ত করার মঙ্গল-চিন্তা এতে নিহিত থাকে। যথার্থ না হয়ে-ও কোন বস্তু বা ভাবনা সত্য হয়ে উঠতে পারে, এ-ও তেমনি।

একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসে সাধক কিরণচন্দ্র এখন একটি ভূমিতে পৌঁছেছিলেন যেখানে তার জীবনের ঘটনাগুলো তাদের স্বাভাবিক তাৎপর্য ছাড়িয়ে অন্যদিক থেকে অর্থময় এবং ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থাটি কী, তা ভেবে দেখা যেতে পারে। পুরীধামে গোঁসাইজীর কাছে থাকার সময়ে কিরণচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর অধৈর্য ভাব দেখে গোঁসাইজী একটু যেন ভৎসনার সুরেই বলেছিলেন, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?' এ বিশ্বাসের সম্ভাব্য তাৎপর্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এ ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না যে গোঁসাইজী কথিত তিন বছরের মেয়াদ অন্তে কিরণচন্দ্র এই বিশ্বাসের ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই ভূমিতে দাঁড়িয়ে পুরোনো চোখে আর

জীবনকে দেখা যায় না। আগের দৃষ্টিতে জীবনে যে যে ঘটনা ঘটেছে তাকে কখনো পছন্দ হয়েছে, কখনো পছন্দ হয় নি। এর কারণ, গোচরে বা অগোচরে সব সময়ই মনে একটা ভাব থেকে গেছে যে জীবনের ঘটনা ঘটাবার স্বাধীনতা বা দায়িত্ব সাধকের আছে। এই দায়িত্ববান্ 'আমি'র অস্তিত্ব সাধকের মনে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তাঁর জীবন অর্থাৎ সমগ্র জীবনকে বিচ্ছিন্ন একক ঘটনা থেকে পৃথক করে দেখা যায় না, পাওয়া যায় না। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সাধকের মন এত ব্যাপৃত থাকে যে তাঁর অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে কোন কোন ঘটনাকেই অন্তত সাময়িক ভাবে পুরো জীবন বলে মনে হয়। সাধক জীবনে এ ঘোর কেটে যায় বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হলে। এ অবস্থায় কী ঘটে তা দরবেশ দর্শনের ৩।২৬ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী বলেছেন, যেমন 'বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হইলে ঈশ্বর আছেন, পরমাত্মা আছেন, এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যেমন ধোপে টেকে না, এ বিশ্বাস সেরূপ নহে। পরমাত্মা আছেন এবং তিনি আমার সুহৃদ এবং তিনি সর্বশক্তিমান— এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে মানুষ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া যায়। পার্থিব মানুষ যদি জানিতে পারে যে ইংলেণ্ডের রাজা তাহার পরম বন্ধু তবে স্ফূর্তিতে তাহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহাও অনেকটা সেরূপ।' এই অবস্থায় সাধকের অনুভূতি দরবেশজী তার 'মন্দির' কাব্যের 'মন্দির সোপানে' অধ্যায়ের সাত, আট ও নয় নম্বর কবিতায় বেশ স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। সাত নম্বর কবিতায় বলেছেন ঃ

তুমি আছ গো আছ আছ গো আছ
ধীর নির্মল সরল চিত্তে
সার্থক প্রাণ যাচ।

* * *

তুমি আছ ওহে সুন্দর-স্বাদু !
তুমি আছ ওহে মঙ্গল-মধু !
তুমি আছ চির-জাগ্রত বিধু
নিদ্রিত চিত ভাতি ;

জেনেছি হে তব পুণ্য পুলকে,
হতে হবে মোরে ধন্য এ লোকে,
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
জ্বলিবে বিমল বাতি।

মনে রাখা দরকার এই বিশ্বাসের রাজ্যে প্রবেশের আগেই কিরণ-চন্দ্রের প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম অভ্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু নাম সাধনের ঐ অবস্থা হলেই ঈশ্বর বিশ্বাসের ভূমিতে পৌঁছানো হয়ে যায় তা নয়। এ প্রসঙ্গে 'মনোরমা দেবীর জীবন চিত্র' বইয়ে গোঁসাইজীর শিষ্য মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। সেই আশ্চর্য সাধিকা মনোরমা দেবীর একটানা আঠারো ঘণ্টা একাসনে সমাহিত হয়ে কাটানোর সংবাদ গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে বসে গোঁসাইজীকে জানানো হলে গোঁসাইজী মনোরঞ্জনকে বললেন, 'এ অবস্থা অতি চমৎকার, কিন্তু এখনও ঈশ্বর-বিশ্বাস জন্মে নাই।' এই মন্তব্য শুনে মনোরঞ্জন ভীত ও বিস্মিত হলেন ; ভাবলেন, যাঁর ব্রহ্ম নামে ১৮ ঘণ্টা ইচ্ছা সমাধি হয়, একমাত্র নাম ভিন্ন যাঁর নিকট সম্পূর্ণ জগৎ বিলুপ্ত তাঁর তখনো ঈশ্বর-বিশ্বাস হয় নি, এ কথার অর্থ কী। মনোরঞ্জনের মনোভাব বুঝতে পেরেই যেন গোঁসাইজী বলতে লাগলেন, 'এখন যে অবস্থা ইহা নামানন্দের অবস্থা। * * * নামানন্দ চুষিয়া চুষিয়া সাধক নিষ্পাপ হয়, তখন সত্য-জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আপনি প্রাণে ফুটিয়া উঠেন। তখন তাঁহার (সাধকের) মুখ হইতে যাহা বাহির হয় তাহাই শাস্ত্র এবং তাঁহার প্রাণে যাহা ফুটিয়া উঠে তাহাই ধর্ম। শেখা ধর্ম, মুখস্থ করা ধর্ম, বিচারের ধর্ম, ধর্ম নহে। আমি যে মনোরমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা বলিতেছি তাহা এইরকম বিশ্বাস। লোকেরা যাহাকে বিশ্বাস বলে সে প্রকার সংস্কারিক বা কাল্পনিক বিশ্বাসের কথা নহে। সংস্কারিক বিশ্বাস, ভাবের বিশ্বাস অসত্য ও অস্থায়ী। যাহা সত্য তাহা নিত্য। * * * সত্য বিশ্বাস একবার জন্মিলে আর তাহা বিনষ্ট হয় না।' গোঁসাইজী

যে সময়ে এই বাণী উচ্চারণ করেন তার অনেক আগেই মনোরমার প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হওয়ার অবস্থা লাভ হয়েছে। ঐ বইয়ে মনোরঞ্জন লিখেছেন, 'মন্ত্র দীক্ষা প্রাপ্তি মাত্র গুরুদত্ত নাম রেলগাড়ির চাকার ন্যায় তাঁহার অন্তরে অবিচ্ছেদে চলিতেছে, হাঁটিতে চলিতে বসিতে গৃহকার্য করিতে এমন কি অন্যের সঙ্গে কথা বলিবার সময়েও সে নামের বিরাম নাই। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নাম এমনই মিলিয়া গিয়াছে যে, একটি শ্বাস-ও বৃথা ফেলিবার উপায় নাই।' গোঁসাইজীর ঐ উক্তির অল্প কিছুদিন পরে মনোরমা একদিন বত্রিশ ঘণ্টা সমাধিস্থ থাকেন এবং প্রথম ছাব্বিশ ঘণ্টা পরে তাঁর দুই চোখ থেকে এই প্রথম বার অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ হতে থাকে। এদিনের এই ভাববৈচিত্র্য লক্ষ করে মনোরঞ্জন মনোরমাকে প্রশ্ন করে যে উত্তর পান তা এই—'অন্যান্যবার বসিলে যেমন নাম ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না, অতিশয় আনন্দে প্রাণ ভরিয়া যায়, দেহের অস্তিত্ব জ্ঞান থাকে না, এবারেও সেইরূপ সমস্ত। তবে কিছুক্ষণ পরে বোধ হইল যেন ঈশ্বর আমাকে বুকে করিয়া আছেন।' মনে হয় এই দিন থেকেই মনোরমার বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হয়ে বিশ্বাসের—সত্য বিশ্বাসের রাজ্যে উত্তরণ ঘটেছিল।

সাধক কিরণচন্দ্র-ও এই বিশ্বাসের ভূমিতে পৌঁছে গিয়ে গোঁসাইজী বর্ণিত নূতন মানুষ হয়ে গেলেন। তিনি বলতে পারলেন,

আমি যখন যে দিকে চাই।
তব বিভূতি হেরিতে পাই, পাই, পাই গো পাই।

এই নতুন মানুষ হয়ে তিনি শুধু তাঁর চারদিকের পৃথিবীতে তাঁর প্রিয়তমের ও ইষ্টের বিভূতি দেখতে পেলেন তাই-ই নয়, তাঁর জীবনে, তাঁর অন্তর-রাজ্যে-ও যা কিছু ঘটছিল তার ভিতরে-ও সেই বিভূতির প্রকাশ অনুভব করতে পারলেন। তাঁর জীবনের পুরো মানেটাই পালটে গেল তাঁর কাছে। জীবনে যেন কোন কিছু আর এমনি ঘটছে না, তাঁর বিশ্বাস-সিদ্ধ ঈশ্বরই যে সব কিছু ঘটাচ্ছেন এটা তিনি

স্পষ্ট দেখতে পেলেন—তাঁর নিজের জীবন কাহিনীতে তাঁর নিজের ভূমিকা হয়ে দাঁড়াল গৌণ দর্শকের। সাধন মার্গের এ এক অভিনব অপরূপ অবস্থা।

এই বিশ্বাসের ভূমিতে আরূঢ় হয়ে সাধন-পথিক যে নিশ্চেষ্ট, অনড় হয়ে পড়েন তা নয়। বরং বিশ্বাসের বর্মে আবৃত থাকেন বলে বাক্যে-কার্যে-চিন্তায় তিনি এক নতুন শক্তি, এক নতুন উদ্দীপনা বোধ করতে থাকেন। আগে তাঁর যে দ্বিধা হত, যে অনিশ্চয়তায় পীড়িত হতে হত সে সব এ অবস্থায় প্রায় থাকেই না। তাই সমস্ত কর্মে, যাবতীয় আচরণে তিনি যথার্থ নিষ্ঠার সঙ্গে দৃঢ়তর পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারেন কেননা তিনি নিশ্চিতরূপে অনুভব করতে থাকেন যে অন্য একজন প্রতি মুহূর্তে তাঁকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে বসে আছেন। ভগবদ্-বিশ্বাসী কর্মী নিপুণতর কর্মী হয়ে ওঠেন, অনুরূপ সংসারী সংসারকর্মে স্বভাবতই আরও কুশলী হতে পারেন। মনোরমা দেবীর উদাহরণ আবার স্মরণ করা যেতে পারে। বোলপুরের শান্তিনিকেতনে যখন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সপরিবারে ছিলেন তখন নিরিবিলি অবসর পেয়ে মনোরমা দেবী প্রায় প্রত্যহ-ই ধ্যানে বসতেন। বেলা একটা নাগাত বসতেন, আর চারটার সময় তাঁকে সমাধি থেকে তুলে দিতেন মনোরঞ্জন—কানে নাম শুনিয়ে। এই ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে মনোরঞ্জন ক্লেশ বোধ করতেন, বিচলিত হতেন, মনে করতেন যেন একটা পাপ করছেন। কিন্তু মনোরমা প্রতিদিনই বসার আগে বলে নিতেন তাঁকে যেন চারটার সময় সমাধি থেকে উঠান হয়। এই প্রসঙ্গেই মনোরঞ্জন লিখেছেন, 'ধ্যানধারণার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে পরিজনগণের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান-ও তাঁহার ক্রমশ গভীর হইতেছিল।' সাধন-ভজনে উন্নত অবস্থা সাধককে কর্মবিমুখ করে, কর্তব্য-কর্মের প্রতি তাঁর অনীহা সৃষ্টি করে—এ ধারণা যথার্থ নয়। বিশ্বাসী সাধক তাঁর ইষ্টের দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত সাংসারিক, বৈষয়িক সমস্ত কাজই স্বাভাবিকভাবে করে যেতে থাকেন; ইষ্টের

দোহাই দিয়ে নিজের কোন বোঝা এড়িয়ে যাবার প্রবৃত্তি আসে না তাঁর, তেমনি ইষ্ট তাঁর হয়ে কিছু করে দিন এ কামনা-ও তাঁর আসে না যদিও তিনি জানেন যে চাইলেই ইষ্ট তা-ও করে দিতে পারেন। মনোরঞ্জন প্রসঙ্গান্তরে মনোরমার বিষয়ে সেইজন্যই লিখেছেন; 'একবার অত্যন্ত সাংসারিক ক্লেশে বিচলিত হইয়া আমি তাঁহাকে (মনোরমাকে) বলিয়াছিলাম, আমরা তো ধনদৌলত চাহিনা, যাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া সাধনভজন করিতে পারি তুমি যদি ভগবানের নিকট এই জন্য প্রার্থনা কর তবে আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই সে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।' আমার কথার উত্তরে মনোরমা বলিলেন, 'এখন আমার কোন প্রার্থনাই আসে না। ভগবান সমস্তই দেখিতেছেন, তাঁহাকে কি জানাইব? যাহা করিতে হয় তিনিই করিলেন, তিনি কি প্রার্থনার অপেক্ষা রাখেন?' এরই কিছুদিন পরে গোঁসাইজী মনোরঞ্জন ও মনোরমাকে অর্থোপার্জন না করা ও কারো কাছে কোন কিছু না চাওয়ার ব্রত দেন। এই প্রসঙ্গেই গোঁসাইজী তাঁর মৌনী অবস্থায় খাতায় লিখেছিলেন, 'মনোরঞ্জনের এখনো নির্ভরের ভাব আসে নাই, কিন্তু মনোরমার নির্ভরের অবস্থা।'

বিশ্বাসের অবস্থা ও নির্ভরের অবস্থা এক নয়। বিশ্বাসের অবস্থার পরে যথার্থ নির্ভরের অবস্থা আসে। নির্ভরের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে গোঁসাইজী বলেছেন, 'শিশু যেমন মাতার উপর নির্ভর করে, সেইরূপ স্বাভাবিক নির্ভর হইলে, তখন যুক্তি তর্ক অন্তর্হিত হয়।' কিরণচন্দ্র-ও একবার হ্যারিসন রোডের বাড়িতে গোঁসাইজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে গোঁসাইজীর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর হয় না কেন। এর উত্তরে গোঁসাইজী বললেন, 'বিশ্বাস ও নির্ভর এক কথা নয়। বিশ্বাস হলেও নিজের অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু নির্ভর—একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়া। যেমন তোমার মা তোমাকে কিছু করতে বললেন, আর তুমি তা করলে। মাকে তুমি বিশ্বাস কর; জান, তিনি এমন কিছু বলবেন না যাতে তোমার অপকার হবে। কাজটা করবার সময় হয়ত কত উদ্বেগ

অশান্তি আসবে তুমি নীরবে তা সয়ে নেবে। কেননা বেশ জান, মা যখন বলেছেন তখন এটা কোনরকমে চোখ মুখ বুজে করে ফেলতে পারলেই কল্যাণ হবে। এর নাম বিশ্বাস। নির্ভর তো তা নয়। নির্ভর নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলা। সম্পূর্ণরূপে অনুগত না হলে নির্ভর হয় না। ভগবান যে বলেছেন, যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—সেটা কি সোজা কথা। নিজের পৃথক সত্তা যার বোধ আছে, সে কি এমন দুরাশা করতে পারে যে, ভগবান মাথার করে তার প্রয়োজনীয় সমস্ত বয়ে নিয়ে আসবেন। নির্ভর যার হয়েছে, শত উদ্বেগ অশান্তি এলেও সে বুঝতেই পারবে না যে তার দুঃখ এসেছে। যা আসবে তাই মধু মধু বলে যে মাথা পেতে নেবে।' গোঁসাইজীর এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে বলতে হয় যে ১৩১৮ সালের ১৮ বৈশাখ পর্যন্ত অর্থাৎ যে দিন গোঁসাইজী প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে কিরণচন্দ্রেকে বরিশাল ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন—সেইদিন পর্যন্ত কিরণচন্দ্রের নির্ভরতা আসে নি কেননা এ দিন-ও তিনি গোঁসাইজীর আদেশ পাওয়ার পরক্ষণেই নিজের বিচারবুদ্ধি মত গোঁসাইজীকে প্রশ্ন করেছেন, নির্বিচারে কিছু গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গের আলোচনা এখন মুলতুবী থাক। কিন্তু কিরণচন্দ্র যে ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসেই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবস্থান করতে শুরু করেছেন তা প্রসঙ্গক্রমে একটু আগেই দেখা গেছে। তাঁর এই অন্তবর্তীকালের জীবনে —১৩০৮ থেকে ১৩১৭ সাল—পুরোপুরি সাংসারিক ও বৈষয়িক কর্মে অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই জড়িত, লিপ্ত ছিলেন তিনি। শুধু একটু অসাধারণত্ব ছিল, তিনি একাধারে নিরাপদ ভূমিতে ও বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন এ সময়টাতে। কিরণচন্দ্রের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনার সময়ে এই পটভূমির কথা স্মরণ রাখতে পারলে অনেক বিভ্রম ও বিতর্কের হাত এড়ানো সম্ভব হবে।

কিরণচন্দ্র যথেষ্ট সচ্ছল পরিবারের মানুষ, পৈতৃক সম্পত্তির যা আয় তা তাঁর স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত। তাঁর দাদার মৃত্যুর

পর তিনিই ঐ একান্নবর্তী সংসারের গৃহকর্তা হয়েছেন সত্য কিন্তু তাঁর ভাইপো অমলচন্দ্র তাঁর চেয়ে বয়সে ঢের বড় এবং সম্ভবত বিষয়-কর্মে-ও তাঁর চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। অমলচন্দ্রের সঙ্গে কিরণচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকেই একটা যেন গড়মিল ছিল কিন্তু মতের অমিল যে মনোমালিন্যে পৌঁছাতো তেমন কোন খবর জানা যায় না। বিষয় কর্মে যদি কিরণচন্দ্রের বিতৃষ্ণা জন্মাত তবে তিনি নিশ্চিন্ত মনে অমলচন্দ্রের উপরেই সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার ছেড়ে দিয়ে নিজের পছন্দমত নির্লিপ্ত জীবন যাপন করতে পারতেন, তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের কোনই অভাব ঘটার কারণ ছিল না। ১৩০৬ সালের ২৯ অঘ্রান কিরণচন্দ্রের দাদা মারা যান, এর পরে ১৩০৮ সালের ৩ আষাঢ় পর্যন্ত তাঁর রোজনামচায় উল্লিখিত ঘটনার বিবরণ দেখে এ কথা মনে আসে না যে তিনি জমিদারী নিয়ে খুব ব্যাপৃত ছিলেন, বরং এই সময়ের মধ্যে তিনি অধিকাংশ দিনই হয় তীর্থভ্রমণ না হয় ভজন-কীর্তন ও সদালোচনায় কাটিয়েছেন। অমলচন্দ্র সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন বলেই কিরণচন্দ্রের পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হয়েছিল। এ কথা ঠিক যে জমিদারীর আয় থেকে কিরণচন্দ্র যে ভাবে উৎসবাদিতে বা অন্যান্য সৎকর্মে খরচ করতে চাইতেন তা অনেক সময় পারতেন না। প্রথমবার গোঁসাইজীর জন্মোৎসবের সময় প্রয়োজনীয় টাকা দিতে অমলচন্দ্র বিরক্তি প্রকাশ করায় কিরণচন্দ্র যে ব্যথিত হয়েছিলেন বেশ অভিমানের সঙ্গেই তিনি তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সম্পত্তি যখন দুই শরিকের তখন খরচ-পত্রের ব্যাপারে অবশ্যই পরস্পরের সঙ্গে রফা করে চলতে হয় নইলে একান্নবর্তী পরিবার টিকতে পারে না। এ যুক্তি কিরণচন্দ্র বুঝতেন না তা ভাবার কোন হেতু নেই। কাজেই এ পরিস্থিতিতে একজন সৎ সংসারীর যে সিদ্ধান্ত নেয়া সঙ্গত কিরণচন্দ্র সেই সংকল্প গ্রহণ করলেন, ঠিক করলেন তিনি পৃথক ভাবে অর্থোপার্জন করে সর্বাংশে স্বাধীন হবেন, পৈতৃক সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকবেন না। স্বোপার্জিত অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারেও তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা

থাকবে, অন্য কারোর মুখ চেয়ে খরচপত্র করার নৈতিক দায়িত্ব-ও তা হলে থাকবে না। এই স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যেই কিরণচন্দ্র পৈতৃক জমিদারীর উপস্বত্বের উপরে নির্ভরশীল না থেকে স্বতন্ত্র ভাবে অর্থোপার্জনের পথে পা বাড়ালেন।

পৈতৃক সম্পত্তির আয় বর্জনীয় কিছু এমন চিন্তা কিরণচন্দ্রের হয়েছিল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। যদিও গোঁসাইজী বলেছিলেন যে কিরণচন্দ্রের বাবা বৈষয়িক ব্যাপারে যে সব অনাচার করেছিলেন তাতে তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু এজন্য ঐ সম্পত্তি বা তার আয় পরিত্যজ্য একথা কিরণচন্দ্র ভাবেন নি তার প্রমাণ এই যে সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন তিনি তাঁর নিজস্ব অংশ অমলচন্দ্রকে দানপত্র করে দিয়ে যান তখন-ও একটা সর্তে রাজী হয়েছিলেন যে সম্পত্তির আয় থেকে তিনি সারাজীবন মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে এবং তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর স্ত্রী সরোজবালা দেবী মাসিক কুড়ি টাকা করে মাসহারা পাবেন। এই মাসহারার টাকা তিনি দীর্ঘদিন ধরে সন্ন্যাস গ্রহণের পরও গ্রহণ করেছিলেন দরবেশ দর্শনের ১০।১৮ নম্বর পত্রাংশের বক্তব্য থেকে তা জানা যায়—ঐ পত্রটি ১৩৩৮ সালে অর্থাৎ কিরণচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের উনিশ বছর পরে লেখা। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির আয়ের উপরে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হলে ঐ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির জন্য যে কর্মে নিয়োজিত থাকার দায়িত্ব ছিল সে দায়িত্ব সম্ভবত দুই কারণে পালন করা কিরণচন্দ্রের পক্ষে সহজ ছিলনা; প্রথমত, বয়োজ্যেষ্ঠ অমলচন্দ্র নিজেই ও দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, জমিদারীর স্বাভাবিক প্রয়োজনে আইন আদালতের যে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় সেটা কিরণচন্দ্রের কাছে রুচিকর ছিল না। কিরণচন্দ্র তাই পৈতৃক জমিদারীর আওতায় না থেকে স্বতন্ত্র অর্থোপার্জনের পথ বেছে নিলেন।

উত্তরকালে দরবেশজী এই প্রসঙ্গে কী ভাবতেন বা বলতেন দরবেশ দর্শনের অনেকগুলো পত্রাংশে-ই তা ছড়িয়ে আছে। যেমন ৯।৭ নম্বর

পত্রাংশে আছে, 'নিজ প্রয়োজনীয় যাহা কিছু অর্থাৎ ভাত-কাপড়, উহা নিজেকেই উপার্জন করিয়া লইতে হইবে। নহিলে কোন ধর্মই হইবে না।' আবার ৯।২৪ নম্বর পত্রাংশে বলছেন, 'মানুষের আকার ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে নিজের আহার নিজের খাটুনী দ্বারা যোগাড় করিতে হইবেই হইবে। কয়েকজন থাকিতে পারে এবং আছে-ও, যাহাদের আহারের জন্য খাটিতে হয় না। তাহাদের মধ্যে যাহারা সংসারে থাকে তাহাদের নাম—বড় লোক। আর যাহারা ত্যাগাশ্রমী তাহাদের নাম মহাত্মা বা অতি মানুষ।' বলা বাহুল্য কিরণচন্দ্র নিশ্চেষ্ট ও অলস জীবন বেছে নিয়ে বড়লোক হয়ে থাকতে চান নি, আবার তখনো তিনি ত্যাগাশ্রমী হয়ে মহাত্মার পর্যায়ে পৌঁছাননি। একই বক্তব্য একটু অন্যভাবে দরবেশজী বলেছেন ৯।২০ নম্বর পত্রাংশে, 'দেহরক্ষার জন্য অন্ন প্রয়োজন এবং সেই অন্ন পরিশ্রম ব্যতীত লভ্য নয়। তোমার উদরান্নের সংস্থান জন্য আমি যদি বলি ভিক্ষা কর—তবে এই ভিক্ষারূপ কর্মের জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে; আবার আমি যদি বলি উপার্জন কর, তবে এই উপার্জনরূপ কর্মের জন্যও তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে; তারপর অন্ন যদি নিজে প্রস্তুত করিতে না পার বা না কর, তবে যিনি প্রস্তুত করিবেন তাঁহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক, নিজে গায়ে খাটিয়া হোক, টাকা দিয়া হোক বা অন্ন দিয়া হোক, তাহাকে তোমার দিতে হইবে। অর্থাৎ সর্বপ্রকারে স্বাধীন হওয়া, অন্যের কোন প্রকার ঋণ না রাখিয়া চলিতে পারাই সাধন। নতুবা কেবল চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকাই সাধন নয়।' এই স্বাধীন হওয়ার কথা আবার ১৪।১১ নম্বর পত্রাংশে-ও বলেছেন, 'এমন যোগী মহাপুরুষ নাই, যিনি কর্ম না করেন। কেবল চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকাই ধর্ম নয়। সমস্ত বিষয়ে তোমাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে হইবে। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে হইলেই কর্ম করা প্রয়োজন।' সমস্ত বিষয়ে স্বাধীন হওয়ার উদাহরণ হিসাবেই আবার ৯।১৭ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী স্পষ্ট লিখেছেন, 'নিজের পৈতৃক

সম্পত্তি বা ভাইদের উপার্জনের উপর নির্ভর করা-ও পরের গলগ্রহ হওয়া। নিজ উপার্জিত অন্নই একমাত্র সাত্ত্বিক অন্ন।'

পরিণত সাধক দরবেশজীর এই চিন্তাধারা সংসারী সাধক কিরণচন্দ্রের তৎকালীন অনুভবেরই সুস্পষ্ট রূপ, এ ধারণা অযৌক্তিক নয়। নিজে গায়ে খেটে গ্রাসাচ্ছাদনের অভিপ্রায় কিরণচন্দ্রের সাধন জীবনেরই একটি সার্থক আবিষ্কারের ফল। গোঁসাইজী কিরণচন্দ্রকে বিবাহিত জীবন দিয়েছেন, স্বাভাবিক অর্থেই তাঁকে সংসারী করেছেন। গোঁসাইজী আবার তাঁকে কর্মকে এড়াবার চেষ্টা না করে সুষ্ঠুভাবে কর্ম শেষ করে ফেলতে বলেছেন। গোঁসাইজীই শেষটায় বলে দিয়ে গেছেন যে তাঁকে ফকীর হতে হবে। বিশ্বাসের নিরুৎকণ্ঠ ভূমিতে দাঁড়িয়ে কিরণচন্দ্র তাই কবে ফকীর হবেন এই ভাবনায় অধীর হয়ে বসে না থেকে তাঁর বর্তমান সংসার জীবনে তাঁর যে কর্তব্য ধর্মসঙ্গত সেই কর্তব্যের রাজ্যে বীরের মত প্রবেশ করলেন, সার্থক ও স্বাধীন সংসারী হওয়ার পথে পা বাড়ালেন। এ রকম ইঙ্গিত কেউ হয়ত করতে চেয়েছেন যে পৈতৃক সম্পত্তির আয় যতই হোক না কেন, তা কিরণচন্দ্রের সদ্ব্যয় ও দান করার প্রবৃত্তি মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না এবং ঐ প্রবৃত্তি মেটানোতে একান্নবর্তী পরিবারে অসুবিধা-ও ছিল, এই কারণেই তিনি পৃথক ভাবে অন্য উপায়ে আয় করার কথা ভেবেছিলেন। দরবেশ দর্শনের ৯।৭৪ নম্বর পত্রের মাধ্যমে দরবেশজী যে কথা বলেছেন তা বিচার করলে কিরণচন্দ্রের পক্ষে দানধ্যান করার বেশি সুবিধা হবে এই মতলবে প্রয়োজনের চাইতে বেশি উপার্জন করার চিন্তা করা-ও যে অসম্ভব ছিল একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিরণচন্দ্র তখনও দরবেশজী হন নি, ঠিক কথা; কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে তিনি তখনই প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন এবং সাধনার রাজ্য তিনি ওর চেয়ে অগ্রবর্তী স্তরে বিচরণ করেছেন। ঐ পত্রে দরবেশজী লিখেছেন, 'তোমার চিন্তা ও কল্পনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা পড়িয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। ভবিষ্যতে এত টাকা হইলে

দাদাকে বাড়ি করিয়া দিতাম, দাদার ছেলেরা লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইলে তাহাদের ভাল চাকুরী করিয়া দিতাম, জমি খরিদ ও বন্দোবস্ত করিয়া দাদার দুঃখের লাঘব করিতাম—ইত্যাদি চিন্তা বড়ই মারাত্মক। নেশা করা, পরস্ত্রী চিন্তা করা ইত্যাদি পাপ-ও এইরূপ কল্পনা অপেক্ষা অনেক কম ক্ষতিকর।' ধর্মার্থী সংসারীকে নিজের এবং তার উপর নির্ভরশীল পরিজনদের জন্য সাধ্যমত খেটে খোরাক-পোশাকের উপযোগী অর্থ রোজগার করতেই হবে। সেই অর্থের পরিমাণ যদি এমন হয় যে প্রয়োজনের মিটিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা সদ্ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু সদ্ব্যয় করা, দান ধ্যান করার জন্যই যদি কোন ধর্মার্থী অধিক উপার্জনের প্রয়াসী হয় তবে সে আচরণকে সৎকর্ম বলা চলে না, বরং ওই চেষ্টায় ধর্ম পথে অনর্থ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। দান করার উদ্দেশ্যেই হোক কিংবা ধর্মোদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্যই হোক ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য যদি বিশেষ প্রচেষ্টা করার প্রবৃত্তি আসে তাকে অর্থের লোভই বলতে হয়—এই অর্থের লোভই ধর্মার্থীর পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর। এই লোভ লোভই, কী জন্য এই লোভ তাতে কিছুই যায় আসে না; দান করার ঝোঁকে অর্থলোভ বা বদ খেয়াল মেটাবার জন্য অর্থলোভ মূলত এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং সুযোগ থাকলেও ভজনের সুবিধা বা সময়ের খাতিরে বেশি টাকা রোজগার করার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করতে পারলে ধর্মার্থীর যথার্থ মঙ্গল হয়। এইজন্যই দরবেশ দর্শনের ৬।৭৭ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী সাধক শিষ্য নীরদবরণ বর্মণকে লিখেছিলেন, 'নিত্যকর্মের ব্যাঘাত হইবার ভয়ে তুমি যে অর্থলোভ সংবরণ করিয়াছ, তাহাতে আহ্লাদিত হইলাম। এজন্য তুমি ভগবানের বিশেষ আশীর্বাদ পাইলে।' নীরদ ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যার পর আরতি ও ভজনের কাজে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা থাকায় কিছুতেই কলে রোগী দেখতে যেতেন না। এজন্য তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে অনেক আর্থিক লোকসান স্বীকার করতে হত কিন্তু তাঁর গুরুর আশীর্বাদে

তাঁর সংসার জীবনে কখনো অর্থাভাব বোধ করতে হয়নি। এই জন্যই হয়ত দরবেশজী তাঁর তাঁর শিষ্য পরিমল পাল—উত্তরকালে যিনি সন্ন্যাসী প্রণবানন্দজী হয়েছিলেন—তাঁকে লিখেছিলেন, 'এমন কিছু করিবে না যাহাতে অধিক অর্থের উপার্জন হয়।'

এই প্রসঙ্গের উপর যবনিকা টেনে এই সিদ্ধান্ত করে নেয়া যাক যে কিরণচন্দ্র পৈতৃক সম্পত্তির আয়ের উপর জীবন ধারণ করা সংসারী সাধকের পক্ষে অকর্তব্য বিবেচনা করে নিজের ও তাঁর স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থ স্বাধীন ভাবে উপার্জন করার উদ্দেশ্যেই ব্যবসায়ী হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। ঐ ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করে তিনি যদি আশাতীত ও প্রয়োজনের বেশি অর্থ উপার্জন করে থাকেন তবে তা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ঘটনা; সেটা তাঁর পূর্ব পরিকল্পিত কিছু ছিল না।

ঠিক কবে নাগাত কিরণচন্দ্র স্বাধীনভাবে রোজগার করার সংকল্প নিয়ে বাড়ি ছাড়লেন তা জানার কোন যো নেই। ব্রজেশ্বরী বাগ্দেবী দরবেশজীর মুখে শুনে লিখেছেন যে গোঁসাইজীর দেহত্যাগের পর কিরণচন্দ্র প্রথমে তিন বছর জমিদারী দেখাশোনা করেন এবং পরের দশ বছর ব্যবসায় করেন। দরবেশজী যে ১৩১৮ সালের ১৮ বৈশাখ পর্যন্ত বরিশালে ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গোঁসাইজীর দেহত্যাগ ১৩০৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ। এই দুই তারিখের ব্যবধান বারো বছরের একমাস কম। কাজেই ব্রজেশ্বরীর প্রদত্ত হিসাবে গড়মিল ধরা পড়ে। দরবেশ দর্শনের ১৩।৩১ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী লিখেছেন, 'আমার বাইশ বছর বয়সে গোঁসাই দেহরক্ষা করেন। তাঁহারই হুকুমে ১২ বৎসর পর্যন্ত বৈষয়িক কার্যে লিপ্ত থাকিতে হয়। যখন বিষয় হইতে মুক্তি পাইলাম তখন এই সাধন কী তাহা বুঝিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম।' এ থেকে সময়ের হিসাবটা যেমন ঠিকঠাক পাওয়া যায় তেমনি অন্য দু'টি তথ্য-ও নিশ্চিত ভাবে জানা যায়। প্রথমটি হল,

জমিদারীই হোক বা ব্যবসায়ই হোক—কিরণচন্দ্র উভয় ব্যাপারেই গোঁসাইজীর হুকুমে প্রবৃত্ত ও পরিচালিত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, বৈষয়িক কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পরে তিনি গোঁসাইয়ের সাধনের স্বরূপ বুঝবার জন্য পুরোদমে ও ঐকান্তিক ভাবে লেগে গেছলেন অর্থাৎ প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম রপ্ত হওয়ার দুর্লভ অবস্থা এই সাধনের জগতে একটি প্রাথমিক বা প্রাসঙ্গিক অবস্থা মাত্র; সাধনের রহস্য বুঝবার জন্য এ অবস্থা আয়ত্তের পরেও যথেষ্ট প্রচেষ্টা ও উদ্যমের প্রয়োজন থাকে।

মন্দির মাসিক পত্রে দরবেশজীর যে জীবন-কাহিনী ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে তিনি বরিশালে সাত বছরের কিছু বেশি বা কম সময় ছিলেন। বরিশাল ত্যাগের তারিখ ধরে হিসাব করলে বুঝতে হয় ১৩১০ সালের শেষের দিকে বরিশাল এসে পৌঁছেছিলেন। তার আগে তিনি অন্তত কয়েকমাস পাঁচ চর ও পালং-এ ছিলেন। এ থেকে অনুমান করতে হয় যে কিরণচন্দ্র ১৩০৯ সালের শেষাশেষি কিংবা ১৩১০ সালের প্রথম দিকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।

ব্যবসায় করার মতলব হলেই তো আর করা যায় না, মূলধন লাগে আর লাগে অভিজ্ঞতা। এ সম্বন্ধে দরবেশজী উত্তর জীবনে দরবেশ দর্শনের ১৮।৬৭ নম্বর পত্রাংশে লিখেছেন, 'অর্থাগমের সুব্যবস্থার জন্য ব্যবসায় করাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। অর্থ না হইলে একেবারেই ব্যবসা হয় না, এমন নয়। কতকগুলি চলতি ভাল জিনিষের এজেন্সী লইয়া যদি ঘুরিয়া বেড়াও ও প্রাণপণে পরিশ্রম কর তবে ঐ মাষ্টারী অপেক্ষা বোধহয় বেশি রোজগার হয়।' আবার ১৮।৬৯ নম্বর পত্রাংশে বলেছেন, 'নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে এবং সততা থাকিলে সব ব্যবসায়েই সফলকাম হওয়া যায়। অবশ্য, ব্যবসায় জানা থাকা চাই।' বলা বাহুল্য, কিরণচন্দ্র এর আগে কোন ব্যবসায়ে হাতে কলমে কোনই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ পান নি। তিনি সখ করে ফটোগ্রাফী শিখেছিলেন। কাশীর মঠে কিরণচন্দ্রের প্রায় কৈশোর বয়স থেকে

জীবনের বিভিন্ন সময়ে তোলা তাঁর নিজের এবং তাঁর একান্নবর্তী পরিবারের প্রায় সব পরিজনদের ছায়াচিত্র দেখলে সন্দেহ থাকে না যে ফটোগ্রাফীর দিকে তাঁর একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। রোজগারের ধান্দায় বেরোবার শুরুতে কিরণচন্দ্র তাঁর সখের বিদ্যাকে অর্থকরী বিদ্যায় পরিবর্তিত করে নিতে চাইলেন। নিজেই ফটোগ্রাফার হয়ে ব্যবসায়ে নামলেন। অ্যামেচার প্রফেশনাল হলেন। মূলধনের প্রয়োজনীয় টাকাটা কিরণচন্দ্র সংসার থেকে নিলেন না। সাতশ'টাকা কর্জ করলেন তিনি। বম্বে থেকে ফটোগ্রাফীর মালমশলা আনালেন। তখনকার দিনে পূর্ববঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে ফটোগ্রাফীর খুব চলন ছিল না অনুমান করা করা যায়। ফটোগ্রাফারকে নিজের ছবির ডেপলপ করা ও ছাপানোর কাজ জানতে হত। কিরণচন্দ্র ইতোমধ্যেই এ সব কাজে হাত পাকিয়েছিলেন, বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ করে ফটো তোলাবার লোক-ও খুব কম ছিল তখন। কাজেই কিরণচন্দ্র যে ব্যবসায় নিযে কর্মক্ষেত্রে নামলেন তার ক্ষেত্র তখন মোটেই প্রস্তুত ও প্রশস্ত ছিল না। পাঁচ চর ও পরে পালং-এ তিনি রোজগারের ব্যাপারে মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি বলে মনে হয়, না হলে স্বভাবতই তিনি একজায়গা থেকে কিছুদিন পরেই অন্যত্র যেতেন না। তাঁর ব্যবসায়ের ধরণ ছিল অর্ডার পেয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফটো তুলে আনা ও ছবি তৈরী করে দেয়া। এ কাজে ঝঞ্ঝাট অনেক, পরিশ্রম-ও যথেষ্ট অথচ অর্থাগম অনিশ্চিত। কিরণচন্দ্র এ সময়ে বেশ অর্থকষ্টে ছিলেন বলাই বাহুল্য। স্বাধীন ভাবে রোজগার করতে বেরিয়ে বাড়ি থেকে খরচের টাকা নেবেন না, এ তো বোঝাই যায়। কাজেই খাওয়া দাওয়ায় কৃচ্ছ্রসাধন করতে হত তাঁকে, সবসময় শুদ্ধাচারে প্রস্তুত খাদ্য যোগাড় করা-ও অসম্ভব ছিল। কিন্তু সব জেনে শুনেই তো তিনি সংকল্প করে এ পথে পা দিয়েছেন, কাজেই এ সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বে-ও তিনি খুব বিচলিত হয়েছিলেন বলে মনে করা যায় না।

পালং বসে-ও যখন উপার্জনের তেমন সুবিধা হল না তখন কিরণ-চন্দ্র বরিশালে চলে এলেন। বরিশাল তাঁর পূর্বপরিচিত সহর এবং বরিশালের উপর তাঁর একটা প্রাণের টান-ও ছিল। সহর বলেই এখানে ফটোগ্রাফের ব্যবসায়ের পরিসরও অনেক বেশি ছিল। অল্পের মধ্যেই কিরণচন্দ্র এখানে ব্যবসায়ের অনুকূল আবহাওয়া খুঁজে পেলেন। ফটোগ্রাফী নিয়ে শুরু করলেও ধীরে ধীরে তিনি অন্যান্য কারবারে হাত লাগালেন। বরিশালে কিরণচন্দ্রের কারবারের নাম হল চ্যাটার্জী ব্রাদার্স। ফটো তোলা, এনলার্জমেণ্ট, ছবি বাঁধাই—এ সব ছিল একদিকের কাজ। অন্যদিকে তিনি ঘড়ি এবং চশমার ব্যবসা শুরু করে যথেষ্ট লাভ করতে থাকেন। এ ছাড়া ন্যাশনাল লাইফ্ ইসিওরেন্স কম্পানীর বরিশাল অঞ্চলের চীফ্ এজেন্সী কিরণচন্দ্র গ্রহণ করেন। ফটোগ্রাফীর দোকানে বিভিন্ন রকমের মানুষের হরদম যাতায়াত ঘটে, এই সুযোগে ইন্‌সিওরেন্স পলিসি বিক্রীর-ও যে মস্ত সুবিধা সেটা কিরণচন্দ্র বেশ ভালই বুঝেছিলেন। ইসিওয়েন্সের এজেন্সীর একটা বড় সুবিধা যে এই ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে অর্থ লাগে না। এই জন্যই দরবেশজী ইনসিওরেন্সের কাজ করতে অনেক সময় উপদেশ দিতেন। দরবেশ দর্শনের ১৮।৩৫ নম্বর পত্রাংশে এ রকম উল্লেখ রয়েছে। কিরণচন্দ্র নিজে কত নিপুণ ভাবে জীবন বীমার এজেণ্টের কাজ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় দরবেশ দর্শনের ১৮।১০ নম্বর পত্রাংশে। তিনি লিখেছেন, 'আমি যখন ন্যাশনালের চীফ্ এজেণ্ট ছিলাম, তখন আমার এজেণ্টেদের কাজের সুবিধার জন্য তৎকালের প্রধান প্রধান লাইফ অফিসের সঙ্গে কম্পেয়ার করিয়া একটি রেট-টেবল প্রস্তুত করিয়াছিলাম। উহাতে ন্যাশনালের রেট্‌স্ যে অন্যান্য কম্পানী অপেক্ষা কত কম, তাহা দেখাইয়াছিলাম। আশ্চর্য এই, গতকল্য তাকের পুরাতন কাগজপত্র ঝাড়িবার সময় হঠাৎ ইহার একখানি কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। ইহা তখনই মনে হইল, তোমার জন্য। এই সঙ্গে পাঠাইলাম। ইহা দ্বারা তোমার কিছুটা সাহায্য হইবে।' দরবেশজী

১৩১৮ সালে ব্যবসায়ে ইস্তফা দেন, আর পূর্বোক্ত চিঠিখানা ১৩৪০ সালের লেখা।

আস্তে আস্তে চ্যাটার্জি ব্রাদার্স বরিশালে সফল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানরূপে দাঁড়িয়ে গেল। কিরণচন্দ্রের সততা ও পরিশ্রম তাঁর প্রথম দিকের মূলধনের অপ্রাচুর্যের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে যেতে পারল। তাঁর ব্যবসায়িক সততার একটি উদাহরণ তাঁর শিষ্য বরদা দেব উল্লেখ করেছেন। যোগজীবন গোঁসাইজী তাঁর দেহরক্ষার আগে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন কিরণচন্দ্রকে বেশ কিছুদিনের জন্য বরিশাল ছেড়ে যোগজীবনজীর কাছে যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর দোকান থেকে খেলো ও সস্তা দামের মাল ব্যবহার করে গ্রাহকদের ফটো তৈরী করে দেয়া হয় এবং স্বভাবতই লাভের অঙ্ক তাতে বেশ বাড়ে। দোকানের সুনামের জন্যই কেউ ও সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করার দরকার মনে করে নি। বেশি লাভের হিসাব দেখেও কিরণচন্দ্র মোটেই খুশী হলেন না। দোকানের তালিকা থেকে ঐ প্রতারিত গ্রাহকদের ঠিকানা যোগাড় করে তিনি তাদের চিঠি দিয়ে আনালেন, আগের দেয়া ফটো ফেরত নিয়ে উপযুক্ত উপকরণ দিয়ে নতুন করে তাদের ফটো আবার করে দিলেন। কিরণচন্দ্র সততার মান বজায় রাখতেই এমন করলেন বটে কিন্তু এতে তাঁর কারবারের সুনাম যে আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যবসায়ের পরিধি ক্রমশ এমন বেড়ে গেল যে অনেক কর্মচারী নিয়োগ করতে হল কিরণচন্দ্রকে। যখন তিনি কারবার ছেড়ে দেন তখন তাঁর কর্মচারীর সংখ্যাই ছিল ষাট জন। কারবার থেকে অর্থাগম-ও বেশ হতে লাগল, শেষের দিকে মাসে প্রায় হাজার খানেক টাকা লাভ হিসাবে আয় হত কিরণচন্দ্রের। সে আমলে ঐ পরিমাণ আয়ের ব্যবসায়ীকে ধনী বলা যেত।

বরিশালে কাজ-কারবার একটু জমে উঠতেই কিরণচন্দ্র বাসা ভাড়া করেছিলেন। স্ত্রী সরোজবালাকে কাছে নিয়ে এসে পরিপূর্ণ

ঘর-সংসার পাতলেন কিরণচন্দ্র। রান্নার জন্য আলাদা বামুন রাখলেন, চাকর-বাকর তো ছিলই। এ ছাড়া আরও একদল পোষ্য ছিল—ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া, খরগোস, গিনিপিগ, কুকুর ইত্যাদি। তখন তিনি সফল কারবারী আবার রীতিমতন সংসারী, পরিজন-পোষ্য বেষ্টিত সংসারী। বরিশাল সহরে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন কিরণচন্দ্র, অর্থ মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি কোন কিছুরই যেন ঘাটতি ছিল না।

এই আপাত বিষয়ী জীবনের অন্য দিকটা অর্থাৎ সাধন-ভজনের দিকটা তখন কেমন ছিল, জানতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বরিশালে কিরণচন্দ্রের অনেক গুরুভাই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অশ্বিনী দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা এবং গোরাচাঁদ শীল তো সর্বজন পরিচিত ছিলেন। এঁদের সঙ্গে এবং অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে তাঁর সদালাপ ও কীর্তনাদির যে মহা সুযোগ ছিল এ কথা অনুমান করতে মোটেই কষ্ট হয় না। তাঁর দৈনন্দিন সাধনের সম্বন্ধে-ও এইরকম অনুমান করে নিতে হয়। তবে তাঁর বরিশাল বাসের আগেই তিনি প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন কাজেই খুব কঠোর সাধনের প্রয়োজন হয়ত তখন আর ছিল না, আর ব্যবসায়ের খাতিরে এ বিষয়ে অবকাশের স্বল্পতা ছিল, এটা বেশ বোঝা যায়।

অভিজ্ঞতার দিক থেকে, সাধক মানুষের অভিজ্ঞতা হিসাবে ব্যবসায়ী কিরণচন্দ্রের যে এই অধ্যায়ে যথেষ্ট উপলব্ধির সুযোগ ঘটেছিল, দরবেশজীর অনেক উক্তির মধ্যে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। যেমন দরবেশ দর্শনের ১৪।৫২ নম্বর পত্রাংশে তিনি লিখেছেন। 'আমি নিজে বৈষয়িক কার্য ও ব্যবসায় করিতে করিতে যেদিন বুঝিলাম, ভগবান যখন আমার জন্য এই কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তখন আনন্দের সঙ্গে এই কাজ করাই আমার সাধনের অঙ্গ; ঠিক তখনই আমায় কর্ম শেষ হইল না (কেন না দেহধারীকে কর্ম করিতেই হইবে)

কিন্তু কর্মজনিত গ্লানি দূর হইল।' আবার ১৪।১৫ নম্বর পত্রাংশে বলেছেন, 'অর্থোপার্জন ও পরিবার প্রতিপালন কোনো বাজে বা বৃথা কাজ নয়। উহাকেও ভগবৎ-নির্দিষ্ট কর্ম এই ভাবে গ্রহণ করিলে কর্ম ও ধর্ম এক হইয়া যায়।' ঐ গ্রন্থের ৬।৪২ নম্বর পত্রাংশে যেন এই তত্ত্বটির চুম্বকরূপে দরবেশজী লিখেছেন, 'এই যে কাজকর্ম করিতেছ, ইহাও যেমন, সাধন-ভজন-ও ঠিক তেমনই। কাজ করাও সাধন, আবার সাধন করাই কাজ।' বরিশালে বিষয়ের আড়ম্বরের মধ্যে থেকে কিরণচন্দ্র এই অতি সহজ অথচ অভিনব তত্ত্বটি নিজের অভিজ্ঞতায় লাভ করেছিলেন বলেই উত্তর জীবনে তিনি কত অনায়াসে তাঁর অনুগতদের এই উপদেশটি দিতে পেরেছিলেন। সাধক জীবনে দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজগুলোকে, বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট-গুলোকে সাধন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা উৎকট ঝামেলা বলেই সাধারণত মনে হয়, এগুলোকে সাধনের প্রতিবন্ধক বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে অনেক সময় ধারণা জন্মে। আসলে বিষয়-কর্ম যে সাধন-কর্মের অনুপূরক—এ বোধটাই সাধনের একটা ফলশ্রুতি। এই সাম্যাবস্থাই সাধক জীবনের প্রথম দিককার লক্ষ্য এবং লভ্য। এইজন্যই দরবেশজী বলেছেন, 'প্রাণপণে সাংসারিক কর্ম করা এবং প্রাণপণে নিত্য সাধন করা এই দুইটি যে সমান ভাবে চালাইতে পারে, কোন অবস্থাই তাহার অলভ্য থাকে না।' পরবর্তী জীবনে যিনি অধিকাংশ গৃহী ও বিষয়ী মানুষের গুরু হয়ে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, সেই কিরণচন্দ্রের বরিশালের জীবনের এই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। পরোক্ষভাবে দেখতে গেলে কিরণচন্দ্রের বৈষয়িক জীবনের যথার্থ তাৎপর্য এইটাই।

বৈষয়িক কর্মে যেমন গ্লানি আছে—ভগবৎ-নির্দিষ্ট কর্তব্যবোধ হলে যেমন সে গ্লানি কেটে যায়; তেমনি অর্থেরও একরকমের গ্লানি আছে বিশেষত যদি উপার্জিত অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের চাইতে বেশি হয়। দরবেশজী তাই বলেছেন, 'মাঝে মাঝে অর্থাভাব হওয়া

ভগবানের কৃপা মনে করি। যাহার সর্বদাই অর্থের প্রাচুর্য থাকে, সে হতভাগ্য। একান্ত অভাব ও একান্ত সচ্ছলতা—এ দুইটাই পাপ।' কিরণচন্দ্র নিজে যখন এই প্রয়োজনাতিরিক্ত সচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তখন কি করতেন, এ জিজ্ঞাসা স্বভাবতই উঠতে পারে। এ সম্বন্ধে পরবর্তী জীবনে দরবেশজীরূপে তিনি যা লিখেছেন তা থেকেই তাঁর তখনকার আচরণের একটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। উপার্জনশীল গৃহস্থ কী ভাবে তাঁর আয়ের বিনিয়োগ করবেন সে বিষয়ে দরবেশ দর্শনের ৯।৭১ নম্বর পত্রাংশে লিখছেন, 'ঋষিদের মত এই যে, গৃহস্থ উপার্জনের অর্ধাংশ দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিবেন। অন্য অর্ধাংশকে চারিভাগ করিয়া একভাগ দ্বারা রাজকর অর্থাৎ ট্যাক্স ইত্যাদি দিবেন। আর এক অংশ নৈমিত্তিক খরচের জন্য রাখিবেন, যেমন বাড়তি জিনিষ, কাপড় ইত্যাদিতে খরচ করা, বিবাহ চূড়া ইত্যাদি। আর এক অংশ নিজের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সঞ্চয় করিবেন। বাকী এক অংশ দান করিবেন। ঋষিদের এই নিয়মটিকেই বর্তমান কালোপযোগী একটু অদল বদল করিয়া নিজের প্রয়োজন মত লাগাইতে হইবে। আশা করি কেবল দান সম্বন্ধেই খরতর দৃষ্টি না রাখিয়া সমস্ত বিষয়েতেই প্রখর দৃষ্টি রাখিবে। তবেই তুমি আদর্শ গৃহস্থ হইতে পারিবে। বর্তমান অবস্থা বুঝিয়া এই নিয়মটি প্রতিপালন করিতে হয়।' বরদা কুমার দেব তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে বরিশালে থাকার সময় কিরণচন্দ্র যেমন তাঁর উপার্জন দান ও অন্যান্য সদ্ব্যয়ে লাগাতেন তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মান-ও বেশ চড়াগ্রামে বাঁধা ছিল, সৌখীন সংসারী কিরণচন্দ্র সেই আমলের কুড়ি টাকা জোড়ার ধুতি পরতেন। কিরণচন্দ্রের সৎ-গৃহস্থ জীবনে সঞ্চয়-ও ছিল। হঠাৎ গোঁসাইজীর হুকুমে ব্যবসায়ে যতি টানতে হয়েছিল তাঁকে, তবু যখন তিনি পরিব্রাজকরূপে বেরিয়ে পড়েন তখন তাঁর হাতে হাজার পনর টাকা ছিল। এ কথা-ও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ঐ টাকা সরোজবালা দেবীর অন্তত কিছু-

দিনের মত প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করার পরই তাঁর কাছে উদ্বৃত্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে দরবেশজীর আর একটি উক্তি-ও স্মরণযোগ্য —'অর্থ উপার্জন করিয়া যদি কেহ শাস্ত্র ও ঋষিবাক্য অনুসারে সেই অর্থ খরচ করে, তবে উপার্জন করিতে যদি কিছু অপরাধ স্পর্শ করে, উহা ক্ষয় হইয়া যায়। তাই বলিয়া পরকে পীড়া দিয়া বা ঠকাইয়া অর্থ উপার্জন করিলে, সে পাপ কিছুতেই খণ্ডন হয় না।' ব্যবসায়ী জীবনে কিরণচন্দ্র সততার যে আদর্শ বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন তার অন্যতম কারণের আভাস এই উক্তিটিতে মেলে।

দরবেশ দর্শনের ৬।১২১ নম্বর পত্রাংশে দরবেশজী লিখেছেন, 'এই দুর্লভ সাধন নিত্য নিয়মিত করা ব্যতীত ধর্মজীবন লাভের অন্য কোন কৌশল আমার জানা নাই। যাহা আমি করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছি তাহাই তোমাদের দিয়াছি। যাহা আমাকে করিতে হয় নাই তাহা তোমাদের করিতে বলার প্রতারণা আমি করিতে পারিব না।' এই কথাটির তাৎপর্য বিচার করে দেখা নিতান্ত আবশ্যক। দরবেশজীর কাছে ধর্মার্থী হয়ে যাঁরা এসেছেন ধর্ম ও ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত সংস্কার অবশ্যই ছিল। দৈনন্দিন কর্মজীবন ও বৈষয়িক জীবন-ও যে ধর্মজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—এটা উপলব্ধির বস্তু, স্বাভাবিক সংস্কার নয়। প্রাথমিক অবস্থায় ধর্মজিজ্ঞাসু প্রায় সকলেই তাঁর কাছে সাংস্কারিক ধর্মের কথা এবং সেই ধর্ম লাভের প্রণালী জানতেই আসতেন। ক্রমশ তাঁরা দরবেশজীকে ভালবেসে ফেললেন, তাঁর উপরে আস্থা অর্জন করলেন, তখন নিজেদের পারিবারিক, বৈষয়িক এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত সমস্যার কথা তাঁকে জানিয়ে উপদেশ চাইতে শুরু করলেন। এই উপদেশ চাওয়ায় পেছনেও দুইটি উদ্দেশ্য কাজ করত। অন্ধ বিশ্বাসী কারোর কারোর মনে হত যে দরবেশজী ধর্মজীবনে যখন উন্নত তখন তিনি তাঁর যোগবলে এমন উপায় বাতলে দিতে পারেন যাতে তার বৈষয়িক মুস্কিলের আসান হয়ে যায়। আর-একটা উদ্দেশ্য ছিল দরবেশজী

স্নেহময়, নির্ভরযোগ্য পিতার মত; তাঁকে বললে একদিকে যেমন সমস্যা জনিত মানসিক ভার হাল্কা হবে অন্য দিকে পিতৃতুল্য মানুষটির কাছ থেকে পাকা মাথার সৎ পরামর্শ পাওয়া যাবে। দরবেশজী নিজেও এ ব্যাপারে প্রশ্রয় দিতেন; বলতেন, 'বৈষয়িক সব কথা আমাকে লিখিও। তোমাদের সব কথা শুনিতে আমি আরাম পাই। কোন সঙ্কোচ করিও না।' সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে, অনেক সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েও দরবেশজী পরামর্শ দিতেন। কিন্তু এই সব পরামর্শ সিদ্ধাই মিশিয়ে দিতেন না—নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে যা সমীচীন মনে করতেন, তাই উপদেশ দিতেন; অনেক সময় সাবধান করে দিতেন যেন উপদেশার্থী অলৌকিকের আশায় বসে না থেকে নিজের চেষ্টা ও বিচার দ্বারা সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারে। পূর্বে উদ্ধৃত দরবেশ দর্শনের ৬।১২১ নম্বর পত্রাংশের শেষের দিককার বক্তব্য এই জন্য বড় দামী। শুধু ধর্মের তত্ত্বকথা নয়, নিছক বৈষয়িক ব্যাপারে-ও দরবেশজী কাউকে এমন কিছু করতে বলতেন না যা তাঁর নিজেকে কখনো না কখনো করতে হয়নি বা ভুগতে হয় নি। ধর্মের উপদেশ দেবার অভিজ্ঞ সাধু-মহাত্মা এ দেশে বর্তমান বহিরঙ্গ যুগেও নেহাত কম নেই। কিন্তু ধর্ম থেকে আলাদা করে যে সংসার বা বিষয়কে নিয়ে মানুষকে বাস করতে হয়, ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় সেই অ-ধর্মের রাজ্যের-ও অভিজ্ঞ সাধু খুব কম পাওয়া যায়, আর পাওয়া গেলেও নিছক বৈষয়িক ব্যাপারে মুখ খুলতে উৎসুক সাধু নিতান্তই দুর্লভ। দরবেশজী এমনি একজন দুর্লভ ব্যতিক্রম ছিলেন। নিজের নিপুণ বৈষয়িক জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তব জ্ঞান তাঁর এমন সুস্পষ্ট ছিল বলেই তাঁর পরামর্শ সাধারণ লোকের পক্ষে গ্রহণীয় ও আচরণযোগ্য হত; বরং কখনো এ রকম মনে হত যে উপদেষ্টা একজন পাকা বিষয়ী মানুষ, প্রচলিত অর্থে যেন সাধুই নন। যেমন দরবেশ দর্শনের ১৮।২৮ নম্বর পত্রাংশে তিনি বলছেন, 'বৈষয়িক ব্যাপার সমস্তই মিথ্যা, সুতরাং এটাকে

সম্পূর্ণরূপে ধর্মের উপর স্থাপন করিতে গেলে জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য খানিকটা পলিসি প্রয়োজন হয়। অবশ্য সে পলিসি সৎ হওয়া চাই; কোনো প্রকার অসৎ না হয়।' সাধন-ভজন করে ধর্মের পথ ধরে যিনি ভগবানকে লাভ করতে চান, যিনি পরাশান্তি পেতে চান তাঁকে-ও এই ধর্ম-ছাড়া বিষয়ের রাজ্যে চলাফেরা করতে হয়, তাঁর নিজের প্রখর নীতিজ্ঞান প্রতিপদে যেন হোঁচট খেতে থাকে ব্যবহারিক জগতের সর্বজনীন ধূলি-ধূসরিত আসরে। অথচ তাঁর তো পালিয়ে যাবার যো নেই। আগের দিনের সাধকেরা নাজেহাল হয়ে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে আত্মগোপন করতেন, অনেকে আবার ব্যবহারিক জগতের সংঘর্ষের মুখোমুখি হওয়ায় ঝুঁকিই নিতেন না। কিন্তু আগের দিন আর নেই এখন। দরবেশজীর ভাষায় 'সন্ন্যাসী হইয়া শান্তি বর্তমান জাগতিক অবস্থায় সম্ভব নহে। এখন বনে ফলমূল দুর্লভ, যাহা আছে সব গভর্ণমেণ্টের বনবিভাগের ছাপ মারা; যে সে সে-ফল গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং এখন সন্ন্যাসী হইয়াও লোকালয়ে বাস করিতে হইবে, এবং ভাতের জন্য অন্য লোকের দ্বারস্থ হইতে হইবে, তবে আর সন্ন্যাসী কোথায় রহিল। সুতরাং নিজ উদরের জন্য ভিক্ষা না করিয়া নিজের উহা উপার্জন করিয়া লইতে হইবে। নতুবা মনুষ্যত্ব থাকিবে না।' সুতরাং নেহাত মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে হলেই বিষয়ের রাজ্যে রুজি রোজগারের গলিঘুঁজি পথে বিচরণ করতেই হবে সাধককে। একে এড়ানোর চেষ্টা করা বৃথা, এড়াতে চাইলে মনুষ্যত্বই বিসর্জন দিতে হয়, সাধকত্ব তো দূরের কথা। এই বিষয়ের ব্যাপারেই পলিসি নিয়ে চলতে বলেছেন দরবেশজী, বিষয় নিয়ে যতদিন সরাসরি কারবার করেছেন তিনি নিজেও নিঃসন্দেহে এই পলিসি অবলম্বন করেই চলেছেন। এই পলিসি বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে ক'টি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বেশি পরিষ্কার হবে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কা তখন

বাংলাদেশে ও কলকাতায় সবে লাগতে শুরু করেছে। অনেক জিনিষ বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য কলকাতা সহরে রেশনের আওতায় এসেছে, বহু সামগ্রীর চোরা বাজার চালু হয়ে গেছে। দরবেশজীর একজন শিষ্য-সঙ্গত করণেই নাম বলা যাবে না—অনেক কষ্টে ও তদবিরে তাঁর ছোট কারখানার জন্য ময়দা, চিনি এই সব দুষ্প্রাপ্য মালের কোটা যোগাড় করতে পারলেন। মজার ব্যাপার হল এই যে ঐ মাল কারখানার কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার না করে যদি তিনি কালো বাজারে পাওয়া মাত্র বেচে দেন তবে তাঁর লাভ অনেকগুণ বেশি দাঁড়ায় অথচ কারখানায় ঝামেলা অনেক কমে যায়। ধর্মপ্রাণ শিষ্যটি বিপন্ন বোধ করে দরবেশজীর পরামর্শ চাইলেন। দরবেশজী তাঁর কারখানা নামমাত্র চালু রেখে কালো বাজারে কোটার মাল বিক্রী করার প্রস্তাবেই সানন্দে সম্মতি দিলেন। আর একটি এই ধরণের উদাহরণ দিয়েছেন বরদা কুমার দেব। ১৩৪৮ সালের প্রয়াগে কুম্ভমেলায় দরবেশজী গিয়ে ছাউনি করেছেন, কাশীতে তাঁর মঠের সেবকগণ পালা করে গিয়ে মেলায় বাস করে আসবেন এমনি ব্যবস্থা ছিল। হঠাৎ এলাহাবাদ ও কাছাকাছি অনেকগুলো স্টেশনের টিকিট বিক্রয় করা সরকারী আদেশে বন্ধ হয়ে গেল। দরবেশজী তখন এই ব্যবস্থা করলেন যে তাঁর ছাউনির একজন সেবক কতগুলো রিটার্ণ টিকিট কেটে কাশী নিয়ে যাবে এবং ঐ টিকিটের ফেরত-যাত্রার অংশ নিয়ে ক্রমে ক্রমে মঠের সবাই এসে মেলা ঘুরে যাবে। তৃতীয় কাহিনীটি বলেছেন দরবেশজীর শিষ্য কলকাতার প্যারীমোহন পোদ্দার। সে-ও যুদ্ধের সময়কার কথা, কলকাতার বাজারে তখন ধুতি শাড়ি প্রায় পাওয়া যায় না এমনি অবস্থা। পুরীতে জটিয়াবাবার তিরোভাব সম্মেলনীর সমাপ্তির পর দরবেশজীর সহযাত্রী হয়ে প্যারী ও দরবেশজীর অন্য কজন শিষ্য ট্রেনে করে কলকাতা ফিরছেন। পুরীতে কাপড় চোপড় কলকাতায় চেয়ে অনেক সহজলভ্য ছিল কিন্তু উড়িষ্যার সীমানার বাইরে নিয়ে যেতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল। প্যারী ও তাঁর অন্য

গুরুভাইয়েরা বেশ কিছু কাপড় কিনে এনেছেন। বোধহয় খুরদা স্টেশনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে রেখে জোর খানাতল্লাসী শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক কামরায় ঢুকে পুলিশ কাপড় বের করতে লাগল। অবস্থা দেখে প্যারী ও তাঁর সঙ্গীরা বেশ ঘাবড়ে গেলেন। দরবেশজী একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ছিলেন, ওঁদের অস্বস্তি লক্ষ করে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা জানালেন। দরবেশজীর আদেশে প্যারী ও তাঁর অন্য গুরুভাইয়েরা তাঁদের পাচার করা কাপড় চোপড়.সমস্ত দরবেশজীর কম্বলের আসনের নীচে বিছিয়ে দিলেন, দরবেশজী বেশ জুত করে আসনে বসে রইলেন। তল্লাসীর দল একটু পরেই দরবেশজীর কামরায় এসে সাধুকে বসে থাকতে দেখে মুখে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলেন যে নতুন কাপড় আছে কিনা। দরবেশজী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'নো।' আর তল্লাসী হল না। এই তিনটি ঘটনা থেকে বৈষয়িক ব্যাপারে পলিসি নিয়ে চলা বলতে কী বলতে চেয়েছেন দরবেশজী—তা বুঝতে পারা যায়। নিখাদ, নিষ্কলঙ্ক নীতির মাপকাঠিতে এর কোন আচরণকেই সর্বাংশে সমর্থন হয়ত করা যায় না, কিন্তু যে বিষয়ের রাজ্যের রীতিনীতি, ধরণধারণ ধর্মার্থীর মনঃপুত নয় অথচ যে রাজ্যের নাগরিক হয়েই যাকে টিকে থাকতে হবে সেখানে পুরোপুরি ধর্মরাজ্যের নীতি নিয়ে চলতে গেলে জীবনযাত্রাই অচল হয়ে পড়ে— ফলে নীতি-ও থাকে না, চলা-ও হয়ে ওঠে না। তবে এই আপোষের নীতিহীন নীতি বা পলিসি-ও সৎ হতে পারে যদি ব্যক্তিবিশেষের প্রতারণার বা ক্লেশের কারণ না হয়। ধর্মের নীতিকে পারিপার্শ্বিক সমাজের নীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে মেজে ঘষে নিয়ে যে জিনিষ দাঁড়ায় তাকেই বোধহয় দরবেশজী পলিসি বলতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, নিজে হাতেকলমে ব্যবসায় করতে গিয়ে বিষয়ের রাজ্যে স্বচ্ছন্দে ও সার্থকভাবে চলতে পেরেছিলেন বলেই কিরণচন্দ্র কঠিন ও উলঙ্গ বাস্তবকে জানতেন। পরবর্তী জীবনে তাই তিনি প্র্যাকটিক্যাল উপদেশ দিতে কখনোই দ্বিধান্বিত হননি, পোশাকী ধর্ম-উপদেশের খাতিরে

বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করার প্রতারণা করতে চান নি।

ব্যবসায়ের জীবনে কিরণচন্দ্রের অন্য এক রকম অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস-ও গড়ে উঠেছিল—যা তাঁর পরবর্তী আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়তা করেছে। একজন পাকা ব্যবসায়ীর মত কিরণচন্দ্র অফিস ও কর্মচারী পরিচালনার কাজটা যেমন নিপুণভাবে রপ্ত করেছিলেন তেমনি টাকাপয়সার রীতিমাফিক হিসাব রাখা ও বৈষয়িক কাগজ-পত্র ও রেকর্ড সাজিয়ে গুছিয়ে একনজরে দেখতে পাওয়ার মত করে রাখা-ও তিনি আয়ত্ত্ব করতে পেরেছিলেন। দরবেশজী যে লিখেছেন 'অফিসের কাজ যদি অফিসের মত প্রণালী অনুযায়ী সম্পাদিত না হয়, তবে সে ব্যবসায় একটা প্রকাণ্ড পরিহাস হয়ে দাঁড়ায়।'—এটা নিঃসন্দেহে তাঁর নিজের ব্যবসায়ী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। নিতান্ত অর্থকারী যে কাজ মানুষকে বা সাধককে করতে হয় তাকে সাধন-ভজনের মত কর্তব্যবোধে সম্পাদন করতে দরবেশজী উপদেশ দিতেন, কিন্তু তার মানে এ নয় যে ব্যবসায়ী তাঁর দোকানে বা গদীতে বসে কিম্বা চাকুরে তার অফিসে বসে ভজন করবে বা ধর্মালাপ করবে। এ রকম আচরণ শুধু বিসদৃশ নয়, কর্তব্যভ্রষ্টতার দোষে উহা অধর্মের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বৈষয়িক কর্মের পরিবেশে যার ধর্মকথা বলবার বা শুনবার অভ্যাস হয়ে যায়, ধর্মালোচনার আসরেও তার বৈষয়িক আলাপের প্রবণতা এসে যায়। ফলে কোনটাই তার হয়ে ওঠে না। দরবেশজীর শিষ্যেরা জানেন যে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন রকমের কর্তব্যগুলো দরবেশজী সাধু হয়েও কেমন নিখুঁত বিষয়ীর মত সুশৃংখলভাবে নির্দিষ্ট সময় ধরে করে যেতেন। তাঁর চিঠি লেখার নির্দিষ্ট সময়ে বহু ধর্মার্থী পরিবৃত হয়ে থাকলেও তিনি নিমগ্ন হয়ে চিঠি-ই লিখতেন আবার সৎপ্রসঙ্গ করার যে সময়টি ঠিক করা ছিল তখন মসগুল হয়ে সৎপ্রসঙ্গই করতেন। কাশীর মঠে দৈনন্দিন হরেক রকমের কাজ তিনি উপস্থিত সেবকদের যোগ্যতা অনুসারে এমন ভাবে ভাগ করে দিতে পারতেন যে কারো উপরে

অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে-ও সমস্ত কর্মগুলো সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়ে যেত। বড় বড় উৎসবের সময়ে-ও তিনি শিষ্যদের মধ্য থেকে যোগ্যতা যাচাই করে এক একজনকে এক নির্দিষ্ট কাজের ভার দিয়ে একটা প্রায় অবিশ্বাস্য শৃংখলার মধ্যে একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ সমাপ্ত করতেন। তাঁর প্ল্যানিং করার ক্ষমতা, কাজের মানুষ চেনবার ক্ষমতা, কাজ করিয়ে নেবার ক্ষমতা বিস্ময়কর মনে হত। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাধুত্ব এ ব্যাপারে তাঁর সহায়ক ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর ব্যবসায়ী জীবনের প্রভাব যে বহুলাংশে তাঁকে সাহায্য করেছে, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। রীতিমাফিক অফিস চালাতে শিখেছিলেন বলেই দরবেশজী তাঁর মরজীবনের প্রায় শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁর অবর্তমানে মঠের টাকাপয়সা—যা ব্যাঙ্কে বা অন্যান্য সূত্রে বিনিয়োগ করা ছিল—সে সবের হস্তান্তরের প্রতিটি কাগজ নিখুঁত ভাবে তৈরী করিয়ে দরকার মাফিক সই সবুদ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যহ অনেক চিঠি তিনি পেতেন, সেগুলোকে পাওয়ার তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখতেন। রোজ মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চিঠির উত্তর লেখার কাজ করতেন কিন্তু নিতান্ত জরুরী কিছু না হলে পরে পাওয়া চিঠির আগে জবাব লিখতেন না। তাঁর ডায়েরীতে প্রত্যহ কাকে কাকে চিঠি দিচ্ছেন তাদের নাম লিখে রাখতেন। প্রত্যেকটি নামের আগে আবার একটা ধারাবাহিক ক্রমিক সংখ্যা রাখতেন এবং সেই সংখ্যা ধরে বছরে কটি চিঠি লিখলেন তার মোট হিসাব রাখার অভ্যাস ছিল তাঁর। দরবেশজীর দেহত্যাগের প্রায় পঁচিশ বছর পর কাশীর মঠে তাঁর শয়ন কক্ষে রাখা তালাবদ্ধ অনেকগুলো বাক্স খোলা হয়েছিল। তার মধ্যে একটা বাক্সে মঠের জমি ও মঠ সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারের দলিল রাখা আছে দেখতে পাওয়া যায়। বাক্সটা বেশ বড়, দলিল ও দলিল-জাতীয় কাগজ পত্রের সংখ্যা-ও অনেক ঠিক বাক্সটার ঢাকনা খুলতেই দেখা গেল দরবেশজীর হাতে লেখা একটি তালিকা—ঐ তালিকায় বাক্সে যত দলিল-দস্তাবেজ আছে এবং

যে ক্রমে সাজানো আছে তা-ই নম্বর দিয়ে লেখা, প্রত্যেকটি কাগজের পিঠে আবার নম্বরের হদিস-ও দেয়া রয়েছে। যে কেউ তালিকা ধরে বাক্স না ঘেঁটে প্রয়োজনীয় দলিলটি যাতে অনায়াসে বের করতে পারে তারই একটি নিপুণ আয়োজন।

হিসাব রাখা বিদ্যায়-ও যে দরবেশজী কেমন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা কাশীর মঠে যে প্রণালীতে হিসাব এখনো রাখা হয় তা খোঁজ করে দেখলেই জানা যাবে। হিসাব-রাখার বৈজ্ঞানিক প্রণালী দরবেশজী জানতেন কিন্তু ঐ প্রণালীর একটু রকম ফের করে তিনি এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে বৈজ্ঞানিক হিসাব রাখার তাত্ত্বিক দিকটা না জানা থাকলেও একজন আনাড়ি সাধারণ চেষ্টায় কাজ চালিয়ে যেতে পারে। প্রতি বাংলা বছরের শেষে মঠের হিসাব-পত্র চুকিয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক ধারায় লাভ-লোকসানের হিসাব ও ব্যালান্স সীট তৈরী করতেন দরবেশজী। এ ব্যাপারে তাঁর কী নিয়মানুবর্তিতা ও নিষ্ঠা ছিল তা তাঁর শিষ্য নন্তু সেনের বলা একটা ঘটনায় জানা যায়।

১৩৫৩ সালের বৈশাখের শেষ কি জ্যৈষ্ঠের প্রথম। কাশীতে দরবেশজী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর শিষ্যেরা চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন, অভয় মিত্র ষ্ট্রীটের তারকনাথ সাহার বাড়ীতে দরবেশজী আছেন। তাঁর অসুখ তখন বেশ ঘোরাল হয়ে উঠেছে, কলকাতার নামী ও দামী ডাক্তার ও কবরেজরা তাঁকে দেখে যাচ্ছেন, তাঁদের ব্যবস্থাপনার বিশেষ কোন উপশম হচ্ছে না। নন্তু প্রায় রোজ তাঁর অফিসের পরে দরবেসজীর আস্তানায় চলে আসেন। আরও অনেকে আসেন—সন্ধ্যার পর আবার যে যার চলে যান। দরবেশজীর অসুখ খুব জটিল—তা সবাই জানেন। অথচ বিকেলের দিকে যখন দর্শনার্থীরা আসেন তখন তিনি প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, কখনো বা লেখার কাজ করেন। এমনি একদিন বিকেলে নন্তু যখন এসে পৌছালেন তখন

দরবেশজীর ঘর ফাঁকা, অন্য দর্শনার্থী কেউ এসে পৌঁছাননি। নন্তুর বয়স কম, তাঁর সাধন হয়েছে এক বছর-ও হয়নি কাজেই তিনি রোজই ঘরের কোণে দরবেশজীর আসন থেকে বেশ ব্যবধানে এসে বসেন, যা কথাবার্তা হয় শোনেন আর কথাবার্তা না হলে বসেই থাকেন। নন্তু নিজে যেচে দরবেশজীকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেন এরকম ইচ্ছাও হয় না, হয়তো সাহসও হয়না। তাঁর সাহসের অভাব যে ঠিক ভয়ের জন্য তা নয়, দরবেশজীর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যে কথা বলার কোন অবকাশ তিনি নিজে না দিলে, বলা যেত না। তবে নন্তুর অল্প বয়সী মনে একটা দুঃখ ছিল, দীক্ষার পর কবারই তাঁর সঙ্গে দরবেশজীর দেখা হয়েছে, কথাবার্তাও হয়েছে কখনো কখনো, কিন্তু দরবেশজী কোনদিন তাঁকে নাম ধরে ডাকেন নি, হয়তো ডাকার দরকার হয়নি বলেই ডাকেন নি—কাছে বসে থাকা মানুষকে নাম ধরে ডাকার প্রশ্ন ওঠে না। যাই হোক, এদিন নন্তু এসে তাঁর অভ্যাসমত দরবেশজীর আসন থেকে অনেকটা দূরে ঘরের কোণে বসলেন। দরবেশজী আসনে উপবিষ্ট। একটু পরে দরবেশজী হঠাৎ ডাকলেন, 'নন্তু, এখানে এস।' অনেকটা চমকে উঠেই যেন নন্তু তাঁর আসনের কাছে এগোলেন। দরবেশজী আবার বললেন, 'ব্যালান্স সীট তৈরী করতে শিখেছ?' প্রশ্নটির তাৎপর্য এই যে এসময়ের প্রায় বছর খানেক আগে নন্তু সাধন পাবার কদিন পরে তাঁর আই· এ. পরীক্ষায় ফল বেরিয়েছিল এবং দরবেশজীর নির্দেশ চাইতে তিনি বি. এ. না পড়ে বি. কম. পড়তে বলেছিলেন। বি. কম. পড়তে গেলে অ্যাকউেন্টেন্সী শিখতে হয়। নন্তু উত্তর দিলেন যে ব্যালান্স সীট করা মোটামুটি শিখেছেন। দরবেশজী তখন বললেন, 'তা হলে মঠের বার্ষিক হিসাব মিলিয়ে প্রফিট অ্যাণ্ড লস্ অ্যাকাউণ্ট ও ব্যালান্স সীট করে দাও।' নন্তু তো অবাক, বললেন, 'জমা ও খরচের অঙ্কগুলো কোথায় পাব?' দরবেশজী বললেন, 'সে আমার কাছে আছে, তুমি লিখে নাও।' এই বলে তিনি নন্তুকে কাগজ কলম

দিলেন, বাক্স খুলে একটি লেখা কাগজ থেকে আয় ও ব্যয়ের দফায় দফায় মোট অঙ্কগুলো বলে গেলেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে দরবেশজী ১৭ বৈশাখ কলকাতা এসে পৌঁছেছিলেন এবং মঠের হিসাবের বছর বাংলা সন অনুযায়ী ৩১ চৈত্র শেষ হয়েছে। তিনি তখন রীতিমত অসুস্থ এবং ঐ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ কলকাতা থেকে কাশী গিয়ে পুরো একমাস-ও তিনি দেহে ছিলেন না। অথচ ৩১ চৈত্র হিসাব চুকিয়ে, দফাওয়ারী হিসাবের মোট অঙ্ক মিলিয়ে সেই অঙ্কগুলো আলাদা করে লিখে ১৬ বৈশাখ কলকাতা রওনা হবার আগে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। কলকাতা তিনি সে-যাত্রা বেড়াতে আসেন নি, অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন।

কিরচন্দ্রের বরিশালের এই ব্যবসায়ী জীবনে তাঁর বয়স এমন কিছু বেশি ছিলনা। ১৩১০ সালে যখন তিনি ব্যবসায়ে নামেন তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ বছর আর ১৩১৮ সালে যখন কারবারে ইস্তফা দিলেন তখন তিনি চৌত্রিশ বছরে সবে পৌঁছেছেন। এর আগে ব্যবসায়ে তাঁর কোন শিক্ষানবিশি বা অভিজ্ঞতা ছিল না। কাজে নেমেই তিনি নিজে নিজে কাজ শিখেছেন আবার অতি অল্পদিনে যথেষ্ট সাফল্য-ও লাভ করেছেন। যে কোন মানুষের পক্ষেই এই ধরণের দ্রুত বৈষয়িক সাফল্য প্রায় অভাবনীয় বলা যায়। এ জন্য গুরু কৃপা তাঁকে সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি তাঁর নিষ্ঠা উদ্যম ও সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে জীবন সংগ্রামের ঐ অধ্যায়ে অবিচল ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই কৃপা ঐভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই জন্যই দরবেশজী বলেছেন, 'প্রত্যেক কার্যে পুরুষকার অবলম্বন করিতে হইবে। অথচ সর্বদা মনে রাখিতে হইবে ভগবৎ কৃপা ব্যতীত উহা সম্ভব হইবে না। জীবনে দুইটিরই সামঞ্জস্য হওয়া চাই।' এই সামঞ্জস্য বরিশালের জীবনেই কিরণচন্দ্রের আয়ত্ত হয়েছিল। কারণ 'সাধন-ভজনের দিক থেকে তিনি এর বেশ কিছু আগেই যেমন নিরাপদ ভূমিতে আরূঢ় হয়েছিলেন তেমনি সমস্ত কর্মই – যে কাজ তাঁর হাতের কাছে

এসেছে সেই সব কাজই ভগবৎ নির্দিষ্ট বলে গ্রহণ করতেই তিনি ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। পুরুষকার তাঁর অবশ্যই ছিল—কিন্তু সে পুরুষকার নিরঙ্কুশ বা নিরালম্ব পুরুষকার নয়, কৃপাশ্রিত পুরুষকার।

রসময়ী-সুতং দেবং কুলচন্দ্রস্য তনয়ম্।
বিজয়-কিরণং বন্দে সরোজ-প্রাণবল্লভম্॥

দরবেশ দরবার

গ্রন্থ-পঞ্জী

[বই-এ যে সমস্ত গ্রন্থ বা লেখা থেকে উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে বা উদ্ধৃতি ছাড়াও সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা এখানে দেয়া গেল। 'নির্দেশিকা' অংশে উদ্ধৃতিগুলির সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়ার সময় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত নামের বর্ণানুক্রম অনুসারে এই তালিকা সংকলিত হল।]

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার বা প্রকাশক	নির্দেশিকায় ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত নাম
অজপা সাধন	জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত	অজপা
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের দেবোত্তর পত্র ও অর্পণ নামা	স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ	অর্পণ নামা
আচার্য প্রসঙ্গ	সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	আচার্য
ঈশ্বর সূত্র (প্রথম সংস্করণ)	স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী	ঈশ্বর
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়	অক্ষয় কুমার দত্ত	উপাসক
মদীয় আচার্যদেবের জীবন কথা	বরদা কুমার দেব	কথা
শ্রীশ্রীবিজয় কথামৃত (২ খণ্ড)	নবকুমার বাগচী (বিশ্বাস)	কথামৃত
গানের খাতা (২য় সংস্করণ)	স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ	খাতা

শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা	ব্যাস দেব	গীতা
শ্রীশ্রী গুরু-গীতা		গুরুগীতা
প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (তৃতীয় সংস্করণ)	জগদ্বন্ধু মৈত্র	গোস্বামী
শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চরিতামৃত
মনোরমা দেবীর জীবন চিত্র ('অধ্যয়ণ' সংস্করণ ১৯৭২ খৃঃ)	মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা	চিত্র
১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ডায়েরী	দরবেশজী (অপ্রকাশিত)	ডায়েরী
তারিখ-নামা	দরবেশজী (অপ্রকাশিত)	তারিখ
দরশবেশ দর্শন	শ্রীশ্রী দরবেশজী শতবার্ষিকী কমিটি	দ. দ.
শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু ও তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের সম্বন্ধে নানাকথা	শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম	নানাকথা
পণ্ডিত দুর্গামোহন জীবন চিত্র	নলিনী কান্ত দত্ত	পণ্ডিত
শ্রীশ্রীদরবেশজী মহারাজের পত্রাবলী (৩ খণ্ড)	শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম	পত্রাবলী
'মন্দির' মাসিক পত্রিকা (১ম বর্ষ থেকে ৩২ বর্ষ)	শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম	পত্রিকা
প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (চতুর্থ-সংস্করণ)	অমৃতলাল সেনগুপ্ত	প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীদরবেশজী প্রসঙ্গ	সদানন্দ মিত্র	প্রসঙ্গ
পাতঞ্জল-যোগদর্শনম্	ঠাকুর সত্যদেব (ব্যাখ্যাত)	পাতঞ্জল
বক্তৃতা ও উপদেশ (১৩৬১ সংস্করণ)	শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	বক্তৃতা
বিজলী সঙ্গীত	স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ	বিজলী
মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত	বঙ্কবিহারী কর	বৃত্তান্ত
শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত	বৃন্দাবন দাস	ভাগবত
শ্রীশ্রী বিজয় মঙ্গল (১৩ ০ সালের সংস্করণ)	বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	মঙ্গল
মন্দির (কাব্য) (তৃতীয় সংস্করণ)	স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ	মন্দির
যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ	বিপিনচন্দ্র পাল	মানুষ
শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর মৌনী অবস্থার উপদেশ	অসীমানন্দ সরস্বতী	মৌনী
রেবা (কাব্য)	স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ	রেবা
শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত	অমিয় কুমার সান্যাল	লীলামৃত
দেবী মাতা শান্তিসুধা	মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায়	শান্তি সুধা
শ্রীশ্রীসদ্গুরু সঙ্গ (৫ খণ্ড) (পঞ্চম সংস্করণ)	কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী	স স.
স্মরণ মনন	শিশির কুমার সেনগুপ্ত	স্মরণ
শ্রীশ্রী সদ্গুরু লীলানুস্মৃতি	দ্বারিকানাথ রায়	স্মৃতি
শ্রীশ্রীকুমুদবান্ধব জীবনকথা	বিরজাবান্ধব চট্টোপাধ্যায়	
গোঁসাই গণোদ্দেশ লিপিকা	দরবেশজী (অপ্রকাশিত)	
শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত	ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	

দরবেশ দরবার

সূত্র-নির্দেশিকা

[এক পৃষ্ঠায় একাধিক উদ্ধৃতি বা প্রসঙ্গ থাকলে তা ক্রমানুসারে নির্দেশিকায় উল্লিখিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত নামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় 'গ্রন্থ-পঞ্জী'তে পাওয়া যাবে।]

দরবেশ দরবারের পৃষ্ঠা সংখ্যা	উৎস-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম	উৎস-গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বা অন্য সংকেত
৫	গীতা	১১।৪০
	অহল্যা (কবিতার বই)	কবি দিনেশ দাস
	তারিখ	
৭	চরিতামৃত	মধ্য—৮ পরিচ্ছেদ
৯	মঙ্গল	১৮৭
১২	স. স.	তৃতীয় ১৫৯
১৩	দ. দ.	১২
	দ. দ.	২৭১
১৪	দ. দ.	১৫
১৫	মঙ্গল	৯৫
	মৌনী	দ্বিতীয় —১৮৯
১৬	মানুষ	৩৬ —৩৭
১৯	প্রসঙ্গ	৯৪
	তারিখ	
২২	তারিখ	
২৫	তারিখ	
৩২	স. স.	১ম ৪–৫
	পত্রিকা	বর্ষ ১১৪-১১৫
৩৩	পত্রিকা	বর্ষ, ১১৪-১১৫
	স. স.	তৃতীয় খণ্ড, ২৫৮

দরবেশ দরবারের পৃষ্ঠা সংখ্যা	উৎস-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম	উৎস-গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বা অন্ত সংকেত
৩৪	লীলামৃত	২৪৪
৪০	তারিখ	
৪২	অসীমানন্দজী রচিত গানের এক কলি	
৪৬	বিজলী	২৭ সংখ্যক গান
৪৭	লীলামৃত	।৫/
	স. স.	তৃতীয় খণ্ড ৭৯-৮০
৪৮	মঙ্গল	নূতন সংস্করণ ১৭৮
	চরিতামৃত	মধ্যলীলা, ৮ম,
৪৯	বিজলী	২৭ সংখ্যক গান
৫৩	মঙ্গল	১৭৮-১৭৯
	আচার্য	৩৩৪
৫৪	মঙ্গল	১৮৯
	"	১৭৯
	দ. দ.	২।২৩
	"	২।১১
	মঙ্গল	১৮৯
৫৬	স. স.	পঞ্চম, ১৭০
৬৩	পণ্ডিত	১৬৩
৬৭	মঙ্গল	৮২
৬৮	দ. দ.	৮।১, ৮।৩
	প্রভুপাদ	২৭৪
৬৯	পত্রিকা	২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৫৮
৭১	স. স.	দ্বিতীয়, ১২৪
৭২	পত্রিকা	১১ বর্ষ, ১০-১১ সংখ্যা, ৪৫৪
৭৪	মৌনী	দ্বিতীয়, ১৭৩
৭৫	স্মৃতি	৮২
	লীলামৃত	অন্ত্যলীলা, ৩য়
৭৮	পত্রিকা	১২ বর্ষ, ৪-৫ সংখ্যা, ১৫৭
৮১	স. স.	২৩১—২৪১

দরবেশ দরবারের পৃষ্ঠা সংখ্যা	উৎস-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম	উৎস-গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বা অন্য সংকেত
৮২	প্রসঙ্গ	১১৯—১২০
৮৮	কথা	
৯৫	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	চতুর্থ, ৭১
	স. স.	তৃতীয় খণ্ড ১৮১
৯৬	স স.	চতুর্থ খণ্ড ১৫৬
৯৭	কথামৃত	দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩১
৯৯	স স	পঞ্চম খণ্ড, ৯৮
১০০	বক্তৃতা	৩৭
	„	১০৩
	স. স.	চতুর্থ খণ্ড, ১৬
	„	পঞ্চম খণ্ড, ৯৯
১০১	প্রসঙ্গ	৭৩
১০২	স. স.	পঞ্চম খণ্ড ১৫৬
১০৪	চরিতামৃত	অন্ত্যলীলা, পঞ্চম
১০৫	মঙ্গল	১৫৮
	স. স.	তৃতীয় খণ্ড, ৪২
১০৬	মঙ্গল	৯৬
	„	১৫৭—১৫৮
১০৭	চরিতামৃত	মধ্য, অষ্টম
১০৮	মৌনী	দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৫
	চরিতামৃত	মধ্যলীলা, অষ্টম
১১২	পত্রিকা	৬ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
	কথা	৩২৪
	স. স.	পঞ্চম খণ্ড, ৫৭
১১৩	স. স.	পঞ্চম খণ্ড, ১১৭
	মঙ্গল	১৪৮
১১৪	মঙ্গল	১৪৬
	মঙ্গল	১৯৩

দরবেশ দরবারের পৃষ্ঠা সংখ্যা	উৎস-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম	উৎস-গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বা অঙ্ক সংকেত
১১৪	মঙ্গল	১৫২
	,,	১৫৮-১৫৯
১১৫	স. স.	প্রথম খণ্ড, ৯৬
	পত্রিকা	১১ বর্ষ, ২৭১
১১৫-১১৬	পত্রিকা	৮ বর্ষ, ১৫১
১১৭	মৌনী	দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৪
	,,	দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৬
১২৩	বিজলী	৩২ সংখ্যক গান
১২৪	লীলামৃত	আদিলীলা, উনবিংশ
১২৬-১২৭	পত্রিকা	দ্বিতীয় বর্ষ, ১ সংখ্যা
১৩৯	আচার্য	৩৩৪
	আচার্য	৭৩
	কথামৃত	দ্বিতীয় খণ্ড, ২০-২১
১৪০	প্রভুপাদ	৪৪১
১৪৬	পত্রিকা	৬ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১৩০
	স. স.	তৃতীয় খণ্ড, ২৪৩
	মঙ্গল	৯৪
১৪৭	স. স.	তৃতীয় খণ্ড, ৪৫
১৫০	মঙ্গল	১৫৯
১৫১	খাতা	৩-৪
১৫২	বিজলী	৩৩ সংখ্যক গান
১৫৫	পত্রিকা	১১ বর্ষ, ৪৭
১৫৫-১৫৬	পত্রিকা	১১ বর্ষ, ১৯৬
১৬৬	স. স.	চতুর্থ খণ্ড, ১২৯-১৩১
	আচার্য	৩৬
১৬৮	মঙ্গল	১৫৩
	মঙ্গল	১৫৫
১৬৯	পত্রিকা	৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ৩০
১৭২	দ. দ.	২/১৭ ২৯

দরবেশ দরবারের পৃষ্ঠা সংখ্যা	উৎস-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম	উৎস-গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বা অঙ্ক সংকেত
১৭৭	বিজলী	৭২ সংখ্যক গান
১৭৯	তারিখ	
১৮০	স. স.	তৃতীয় খণ্ড, ৩২
১৮১	স. স.	দ্বিতীয় খণ্ড, ৮২
১৮২	মঙ্গল	৯১
১৮৩	অজপা	৭৫
	স. স.	তৃতীয় খণ্ড, ৬১
১৮৫	স. স.	পঞ্চম খণ্ড, ১৯৭
১৮৬	পত্রিকা	৬ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১৩০
	পত্রিকা	৬ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ৯৩
	স. স.	তৃতীয় খণ্ড, ১৮০
১৮৭	প্রভুপাদ	৫০৩
	প্রভুপাদ	৫০২
১৮৯	গোস্বামী	৪৩৫
	পত্রিকা	২৭ বর্ষ, ১১৯
	স. স.	দ্বিতীয় খণ্ড, ৭২
১৯১	পত্রিকা	২ বর্ষ, ১২৪
১৯৩	মন্দির	৮৭
১৯৪	তারিখ	
১৯৭	মঙ্গল	১৮৫ ১৮৬
২০১	মৌনী	দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৫
২০৩	খাতা	৫
	মৌনী	প্রথমখণ্ড, ২
২০৬	তারিখ	
২০৭	প্রসঙ্গ	১৯
	তারিখ	
২০৯	প্রসঙ্গ	১৫০
২১০	স্মরণ	১৬-১৭
	তারিখ	

দূরদেশ দূরবারের পৃষ্ঠা সংখ্যা	উৎস-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম	উৎস-গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বা অন্য সংকেত
২১৪	আচার্য	১৫৮
২১৫	নানা কথা	১৯
২১৬	প্রসঙ্গ	১১৬
	পত্রিকা	৮বর্ষ, ১০৯
২২১-২২২	দ. দ.	১০৫
	নানা কথা	৩-৪
২২৪	দ. দ.	২২৬
২২৫	দ. দ.	২৮৫
২২৯	তারিখ	
২৩৩	তারিখ	
২৩৬	কথা	৩২৫
২৪১	চিত্র	১৬৪-১৬৫
২৪২	চিত্র	৯৮-৯৯
	মন্দির	১৪৪
২৪৩	চিত্র	১২৩
২৪৪	চিত্র	১৭৭
	মঙ্গল	১২৭
২৪৪-২৪৫	পত্রিকা	১বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ৪৬৩
২৫১	দ. দ.	১৭৬
	পত্রিকা	১২বর্ষ, ৮৪
২৫৫	পত্রিকা	৮বর্ষ, ১১২
২৫৭	দ. দ.	১২৭-১২৮
২৫৮	দ. দ.	৩১৪
২৫৯	দ. দ.	৪০২-৪০৩
২৬০	দ. দ.	৩৪৩
২৬১	দ. দ.	১৭৫-১৭৬
২৬৪	দ. দ.	৩৮৫-৩৮৬
২৬৮	দ. দ.	১২৩-১২৪